মাসুদ রানা

আরেক বারমুডা

দুইখণ্ড একত্রে

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

মাসুদ রানা

আরেক বারমুডা

[দুইখণ্ড একত্রে]

কাজী আনোয়ার হোসেন

রানা জেনে ফেলল, চোখা কানওয়ালা তিন-পেয়ে
ভিনগ্রহের সবুজ রঙের মানুষ নয়, জাহাজ ডুবি
এই গ্রহেরই দু-পেয়ে এক মানুষের কারসাজি।
কিন্তু ততক্ষণে শুরু হয়ে গেছে আক্রমণ।
বিন্দুমাত্র সময় দিচ্ছে না রানাকে।
হোটেলের দশতালায়
নিজের ঘরেও নিরাপদ নয় সে।
সেখানেও এসে হাজির হলো ওরা দলবেঁধে।
ধরে নিয়ে গেল কোরিনকে।
নিজের প্রাণের ওপর ঝুঁকি নিয়ে
শেষ চেষ্টা করে দেখবে বলে
মনস্থির করল রানা—আদেশ অমান্য করে
ঝাঁপ দিল আগু...থুড়ি...পানিতে।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মাসুদ রানা - ১১৫, ১১৬

আরেক বারমুডা ১,২

লেখকঃ কাজী আনোয়ার হোসেন

কৃতজ্ঞতায়ঃ শ্যামল শাইখ

স্ক্যান ও এডিটঃ ফয়সাল আলী খান

BanglaPDF.net (বাংলাপিডিএফ.নেট)

facebook.com/groups/Banglapdf.net

বাংলাপিডিএফ (BanglaPDF) এর যে কোন রিলিজ করা PDF বই
ইন্টারনেটে কোথাও শেয়ার করা যাবে না।
না কোন ওয়েব সাইটে ফোরামে, ব্লগে অথবা ফেসবুক গ্রুপে। না অন্য কোন মাধ্যমে।

শেয়ার করতে হলে বাংলাপিডিএফ এর ফোরাম লিঙ্ক শেয়ার করুন ।

পিডিএফ কখনোই মূল বইয়ের বিকল্প হতে পারে না।
যদি এই পিডিএফ বইটি আপনার ভাল লেগে থাকে
তাহলে যত দ্রুত সম্ভব মূল বইটি সংগ্রহ করার অনুরোধ রইল।
পিডিএফ করার উদ্দেশ্য বিরল যে কোন বই সংরক্ষন এবং সবার কাছে পৌঁছে দেয়া।
মূল বই কিনুন। লেখক এবং প্রকাশকদের উৎসাহিত করুন।

মাসুদ রানা

আরেক বারমুডা

(দুইখণ্ড একত্রে)

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

আটত্রিশ টাকা

ISBN 984 16 7115 8

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৩
পঞ্চম প্রকাশ ১৯৯৭

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা হাসান খুরশীদ রুমী

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন ৮৩ ৪১ ৮৪
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Masud Rana
ARE K BERMUDA
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

আরেক বারমুডা-১	৫—১০১
আরেক বারমুডা-২	১০২—২০৮

এক নজরে মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড় *ভারতনাট্যম *স্বর্ণমৃগ *দুঃসাহসিক *মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা দুর্গম দুর্গ *শত্রু ভয়ঙ্কর *সাগরসঙ্গম *রানা! সাবধান!! *বিস্মরণ *রত্নদ্বীপ নীল আতঙ্ক*কায়রো *মৃত্যুপ্রহর*গুপ্তচক্র *মূল্য এক কোটি টাকা মত্র *রাত্রি অন্ধকার *জাল *অটল সিংহাসন *মৃত্যুর ঠিকানা *ক্ষ্যাপা নর্তক শয়তানের দূত এখনও ষড়যন্ত্র *প্রমাণ কই? *বিপদজনক *রক্তের রঙ *অদৃশ্য শত্রু পিশাচ দ্বীপ *বিদেশী গুপ্তচর *ব্ল্যাক স্পাইডার *গুপ্তহত্যা *তিন শত্রু অকস্মাৎ সীমান্ত *সতর্ক শয়তান *নীলছবি *প্রবেশ নিষেধ *পাগল বৈজ্ঞানিক এসপিওনাজ *লাল পাহাড় *হৃৎকম্পন *প্রতিহিংসা *হংকং সম্রাট *কুউউ! বিদায় রানা *প্রতিদ্বন্দ্বী *আক্রমণ *গ্রাস *স্বর্ণতরী *পপি *জিপসী *আমিই রানা সেই উ সেন *হ্যালো, সোহানা *হাইজ্যাক *আই লাভ ইউ, ম্যান সাগর কন্যা *পালাবে কোথায় *টার্গেট নাইন *বিষ নিঃশ্বাস *প্রেতাত্মা বন্দী গগল *জিম্মি *তুষার যাত্রা *স্বর্ণ সংকট *সন্ন্যাসিনী *পাশের কামরা নিরাপদ কারাগার *স্বর্গরাজ্য *উদ্ধার *হামলা *প্রতিশোধ *মেজর রাহাত লেনিনগ্রাদ *অ্যামবুশ *আরেক বারমুডা *বেনামী বন্দর *নকল রানা রিপোর্টার *মরুযাত্রা *বন্ধু *সংকেত *স্পর্ধা *চ্যালেঞ্জ *শত্রুপক্ষ চারিদিকে.শত্রু *অগ্নিপুরুষ *অন্ধকারে চিতা *মরণ কামড় *মরণ খেলা অপহরণ *আবার সেই দুঃস্বপ্ন *বিপর্যয় শান্তিদূত *শ্বেত সন্ত্রাস ছদ্মবেশী কালপ্রিট *মৃত্যু আলিঙ্গন *সময়সীমা মধ্যরাত *আবার উ সেন *বুমেরাং কে কেন কিভাবে *মুক্ত বিহঙ্গ কুচক্র *চাই সাম্রাজ্য *অনুপ্রবেশ যাত্রা অশুভ *জুয়াড়ী *কালো টাকা কোকেন সম্রাট *বিষকন্যা *সত্যবাবা *যাত্রীরা হুঁশিয়ার *অপারেশন চিতা *আক্রমণ '৮৯ *অশান্ত সাগর শ্বাপদ সংকুল *দংশন *প্রলয়সঙ্কেত *ব্ল্যাক ম্যাজিক *তিক্ত অবকাশ ডাবল এজেন্ট *আমি *সোহানা *অগ্নিশপথ জাপানী ফ্যানাটিক *সাক্ষাৎ শয়তান *গুপ্তঘাতক *নরপিশাচ *শত্রু বিভীষণ *অন্ধ শিকারী দুই নম্বর *কৃষ্ণপক্ষ *কালো ছায়া *নকল বিজ্ঞানী *বড় ক্ষুধা স্বর্ণদ্বীপ রক্তপিপাসা *অপচ্ছায়া *ব্যর্থ মিশন*নীল *দংশন *সাউদিয়া ১০৩ কালপুরুষ *নীল বজ্র *মৃত্যুর প্রতিনিধি *কালকূট *অমানিশা *সবাই চলে গেছে অনন্ত যাত্রা *রক্তচোষা।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোন অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা নিষিদ্ধ

আরেক বারমুডা-১

প্রথম প্রকাশ: সেপ্টেম্বর, ১৯৮৩

এক

সব সাগরেই দুর্ঘটনায় জাহাজ ধ্বংস হয়, প্রাণ হারায় মানুষ। কিন্তু জাহাজসুদ্ধ মানুষ গিলে ফেলার ব্যাপারে প্রশান্ত মহাসাগরের জুড়ি নেই। রাক্ষুসে খিদে যেন এই বিশাল জলরাশির। আচমকা আসে এর অপ্রত্যাশিত আক্রমণ। বাউন্টি জাহাজের সেই বিখ্যাত নাবিক-বিদ্রোহ এই মহাসাগরেই ঘটেছিল, দখল করে পিটকেয়ার্ন দ্বীপে নিয়ে গিয়ে জাহাজটাকে পুড়িয়ে দেয় বিদ্রোহীরা। শোনা যায় প্রাচীনকালে তিমি শিকারীদের কাঠের জাহাজ ভেঙেচুরে ডুবিয়ে দিত তিমি, কিন্তু এ ধরনের ঘটনার নির্ভরযোগ্য রেকর্ড রয়েছে শুধু একটাই। জাহাজটির নাম এসেক্স, ডুবেছে এই প্রশান্ত মহাসাগরে। এই ঘটনার ওপর ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে হারম্যান মেলভিলের বিশ্ববিখ্যাত কাহিনী মবি ডিক। ডুবো-আগ্নেয়গিরির আচমকা অগ্ন্যুৎপাতে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে জাপানী জাহাজ হাই মারু, সে-ও এই মহাসাগরেই। এমনিতে শান্ত-গম্ভীর এই জলরাশি, যার জন্যে নামই হয়েছে এর প্রশান্ত মহাসাগর, অথচ হঠাৎ হঠাৎ খেপে গিয়ে এমনই চরম অশান্ত হয়ে ওঠে যে তার নিষ্ঠুরতা কল্পনাকেও হার মানায়।

কিন্তু এসব ভাবছেন না কমান্ডার পিটার ম্যাসন। সাবমেরিনের ব্রিজে উঠে এসেছেন তিনি—নিউক্লিয়ার পাওয়ারড সাবমেরিন স্করপিয়নের ক্যাপ্টেন। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে সাগরের বুকে। অফিসার অন ওঅচের দিকে তাকিয়ে সামান্য মাথা ঝাঁকালেন কমান্ডার, এগিয়ে গিয়ে ঝুঁকে দাঁড়ালেন রেইলে। বুক ভরে টেনে নিচ্ছেন দিবাবসানের চমৎকার আর্দ্র নোনা বাতাস। নিচের দিকে তাকালেন। ছোট ছোট ঢেউগুলোকে ইলেকট্রিক বালবের মত ভোঁতা নাক দিয়ে ঠেলে দুদিকে সরিয়ে দিয়ে এগোচ্ছে স্করপিয়ন। চারদিকে শান্তির পরিবেশ, সব স্বাভাবিক। এমনি সময় সাগরের নিষ্ঠুরতা বা দুর্যোগের কথা ভাবাও যায় না।

সাগরকে সমীহ করে বেশির ভাগ মানুষ, ভয়ের চোখে দেখে। কিন্তু এই বেশির ভাগের দলে পড়েন না কমান্ডার ম্যাসন। দুর্যোগ এলে আঁতকেও ওঠেন না, আবার সাগরের শান্ত রূপ দেখে একেবারে মুগ্ধও হয়ে যান না তিনি। বিশ বছর কাটিয়েছেনসাগরে সাগরে, তার মাঝে চোদ্দ বছরই সাবমেরিনে। এখন তিনি প্রতিষ্ঠা চান। আলোড়ন সৃষ্টিকারী, পৃথিবীর আধুনিকতম সাবমেরিনের ক্যাপ্টেন পদে বহাল হয়েও সন্তুষ্টি নেই। আরও, আরও অনেক বেশি চাহিদা তাঁর।

স্যান ফ্র্যান্সিসকোর কনস্ট্রাকশন ইয়ার্ডে সদ্য জন্ম নিয়েছে স্করপিয়ন। এর কাঠামো এবং খোলস থেকে শুরু করে ভেতর-বাইরের প্রতিটি খুঁটিনাটি সবকিছুর

প্ল্যান তৈরি করেছে এক আশ্চর্য ক্ষমতাশালী কম্পিউটার। ডুবোজাহাজ বংশের এই নতুন অতিথি বংশের ধারাই যেন পাল্টে দেয়ার পরিকল্পনা নিয়ে হাজির হয়েছে এসে। বিজ্ঞানীদের কল্পনার সেই ডুবো শহরের এ যেন প্রথম বাস্তব রূপ। পানির দু'হাজার ফুট নিচ দিয়েও অনায়াসে ঘণ্টায় একশো পঁচিশ নট গতিতে ছুটতে পারে। যোগ্যতা প্রমাণের জন্যে রেসের ঘোড়ার মত যেন মুখিয়ে আছে স্করপিয়ন। এই তার প্রথম মহড়া। নিজের সওয়ারী ছাড়া বাইরের কোন দর্শক নেই, এমন কি এস্কর্ট করে নেবার জন্যেও সঙ্গে নেই অন্য কোন জাহাজ। ডিপার্টমেন্ট অভ আন্ডারওয়াটার ওঅরফেয়ারের হুকুমে পালন করা হচ্ছে কঠোরতম গোপনীয়তা।

ডুবো জাহাজ পরিচালনায় অসাধারণ দক্ষ কমান্ডার ম্যাসন। খুঁটিনাটি কোন কিছুই তাঁর নজর এড়ায় না। আর এই বিশেষ গুণটির জন্যেই স্করপিয়নের প্রথম মহড়ায় ক্যাপ্টেনের সম্মান দেয়া হয়েছে তাঁকে। জ্ঞান-বুদ্ধি যথেষ্ট আছে ম্যাসনের, সাবমেরিনাররা জানে এটা, কিন্তু প্রোমোশনের জন্যে জ্ঞান-বুদ্ধি-দক্ষতা ছাড়াও আরও কিছুর প্রয়োজন। ব্যক্তিত্ব, উঁচু মহলে প্রভাব ও গণসংযোগ এই তিনটে গুণ অবশ্যই থাকতে হবে ইউ এস নেভির অ্যাডমিরাল হতে চাইলে। অথচ এর কোনটাই নেই ম্যাসনের।

বেল বেজে উঠল। এগিয়ে গিয়ে ব্রিজ-ফোনের রিসিভার তুলল অফিসার অন ওঅচ—লম্বা দেহ, ঘনকালো চুলের একজন লেফটেন্যান্ট। রিসিভার কানে ঠেকিয়ে শুনতে শুনতে নীরবে দুবার মাথা ঝাঁকাল। তারপর লাইন কেটে দিল।

'কন্ট্রোল রুম,' বলল লেফটেন্যান্ট। 'ইকো সাউন্ডার রিপোর্ট করছে, গত পাঁচ মাইলে পনেরোশো ফুট উঠে এসেছে সাগরের তলা।'

ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়ালেন কমান্ডার। মুখে চিন্তার ছায়া। 'কি জানি, ডুবো পাহাড়ের ছোটখাট সারি হতে পারে। তবে চিন্তা নেই, তলায় এখনও এক মাইল পানি রয়েছে।'

'ইয়েস, স্যার,' সায় দিল লেফটেন্যান্ট।

আবার সাগরের দিকে ফিরলেন কমান্ডার। গলায় ঝোলানো বিনকিউলারটা চোখে লাগিয়ে দিগন্তের পানে চাইলেন। এটা অভ্যাস, হাজার হাজার ঘণ্টা সাগরে কাটানোর ফল। বিনকিউলারে দিগন্ত দেখে নাবিকেরা, খোঁজে আরেকটা জাহাজকে, কিছু নয়, নিজের চারপাশের একাকীত্ব কাটানোর চেষ্টা। বিনকিউলার চোখে লাগানোর কোন অর্থ হয় না, জানেন কমান্ডার—সামনে কিছু থাকলে অনেক আগেই ধরা পড়ত রাডারে, খবর পৌঁছে যেত তাঁর কাছে। তবু অভ্যাসটাকে লালন করেন তিনি, সাগরের দিকে চাইলে নাকি আত্মার গ্লানি ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যায়।

কিছুই চোখে পড়ল না কমান্ডারের। চেপে রাখা শ্বাসটা জোরে ফেলে চোখ থেকে বিনকিউলার নামিয়ে নিলেন। বললেন, 'খেতে যাচ্ছি আমি। ন'টায় ডুব দেব আমরা। তৈরি থেকো।'

সেইলের ভেতরের তিনটে ধাপ পেরিয়ে নিচে কন্ট্রোলরুমে এসে নামলেন তিনি। প্লটিং টেবিলের ওপর ঝুঁকে আছে এগজিকিউটিভ অফিসার এবং নেভিগেটর, ডেপথ মারকিংস-এর একটা লাইন পরীক্ষা করছে। চোখ তুলে ম্যাসনের দিকে

তাকাল এগজিকিউটিভ অফিসার।

'অদ্ভুত এক রিডিং পাচ্ছি, স্যার।'

'কেমন যেন বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের গন্ধ, না?' হালকা গলায় বললেন কমান্ডার। 'তা ওরকম কোন কিছুর মাঝে গিয়ে পড়লে একেবারে মন্দ হত না।'

এগিয়ে এসে ওদের দু'জনের মাঝে দাঁড়ালেন কমান্ডার। ঘষা কাঁচের ওপর বসানো হয়েছে চমৎকার ছাপা চার্ট। নিচ থেকে চার্টে আলো ফেলার ব্যবস্থা। কালো কিছু ক্রস চিহ্ন দেয়া হয়েছে চার্টের বিশেষ কয়েক জায়গায়, ওগুলোর পাশে পেন্সিলে লেখা নোট আর অঙ্কের ফরমুলা।

'অদ্ভুত কি দেখলে?' জানতে চাইলেন কমান্ডার।

'দ্রুত উঠে আসছে সী-ফ্লোর,' জানাল নেভিগেটর। 'এই হারে উঠতে থাকলে আর কয়েক মাইল পরেই সাবমেরিনের তলায় ঘষা লাগবে। অজানা কোন দ্বীপের গায়ে গিয়েই নাক ঠেকাবে হয়তো স্করপিয়ন।'

'আমাদের পজিশন কি?'

'এই যে, এখানে রয়েছি,' চার্টের এক জায়গায় পেন্সিল ঠুকল নেভিগেটর। 'ওয়াহুর কাহুকু পয়েন্ট থেকে ছ'শো সত্তর মাইল দূরে, বেয়ারিং জিরো-জিরো-সেভেন ডিগ্রী।'

একটা কন্ট্রোল প্যানেলের দিকে ঘুরলেন কমান্ডার। মাইক্রোফোনের একটা সুইচ অন করলেন। 'রাডার, ক্যাপ্টেন বলছি। নতুন কিছু পেয়েছ?'

'না, স্যার,' স্পীকারে যান্ত্রিক গলা ভেসে এল। 'স্কোপ পরিষ্কার…না না… কারেকশন…ক্যাপ্টেন, নাক বরাবর সামনে, তেইশ মাইল দূরে আবছা একটা রিডিং পাচ্ছি।'

'কোন বস্তু?'

'না, স্যার। নিচে নেমে আসা মেঘের মত…ধোঁয়াও হতে পারে। ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'ঠিক আছে। কি জিনিস, বুঝতে পারলেই জানাবে,' মাইক্রোফোন রেখে দিয়ে টেবিলে বসা লোক দু'জনের দিকে ফিরলেন। 'কিছু বুঝতে পারলে?'

মাথা নাড়াল এগজিকিউটিভ অফিসার। 'ধোঁয়া থাকলে আগুন থাকবে। আর আগুন মানে কিছু পুড়ছে। তেল?'

'তেল আসবে কোত্থেকে?' অনিশ্চিত শোনাল ম্যাসনের গলা। 'নর্দার্ন শিপিং লেন থেকে অনেক দূরে রয়েছি আমরা। স্যান ফ্র্যান্সিসকো থেকে হনলুলু হয়ে প্রাচ্যে যাবার রুটও অন্তত চারশো মাইল দক্ষিণে। নিরিবিলি বলেই মহড়ার জন্যে জায়গাটাকে বেছে নিয়েছে নেভি। মাথা নাড়লেন কমান্ডার। 'নাহ্, তেলের ব্যাপারটা ঠিক মানতে পারছি না। সাগরের তলা থেকে নতুন কোন আগ্নেয়গিরি গজিয়ে উঠেছে হয়তো, তা-ও অবশ্য অনুমান।'

রাডার ফিক্স দেখে নিয়ে চার্টের এক জায়গায় ছোট্ট গোল একটা বৃত্ত আঁকল নেভিগেটর। 'মেঘ-ই মনে হচ্ছে,' ভাবনাটা মুখে প্রকাশ করল। 'কিন্তু তা-ও অসম্ভব। ওই জায়গাটার আবহাওয়ার সঙ্গে এ ধরনের মেঘ একেবারেই বেমানান।'

কথা বলে উঠল স্পীকার। 'ক্যাপ্টেন, রাডার থেকে বলছি।'

'ক্যাপ্টেন। বলো,' জবাব দিলেন কমান্ডার।

জিনিসটা কি বুঝতে পেরেছি, স্যার,' একটু দ্বিধা করল যান্ত্রিক কণ্ঠ। 'কুয়াশা, ঘন কুয়াশা। ডায়ামিটার তিন মাইল।'

'তুমি শিওর?'

'শিওর, স্যার।'

মাইক্রোফোনের অন্য একটা সুইচ টিপে ব্রিজের সাথে যোগাযোগ করলেন কমান্ডার। 'লেফটেন্যান্ট, রাডার দেখতে পেয়েছে একটা কিছু। তুমি কিছু দেখলেই জানাবে।' সুইচ অফ করে দিয়ে এগজিকিউটিভ অফিসারের দিকে তাকালেন। 'গভীরতা কত?'

'আটাশশো ফুট। দ্রুত কমছে আরও।'

হিপ পকেট থেকে রুমাল বের করে ঘাড়ে চেপে ধরল নেভিগেটর। 'আশ্চর্য! শুনেছি, এই কাণ্ড পেরু-চিলি ট্রেঞ্চে ঘটে। ওখানে ঢালের গোড়াটা পঁচিশ হাজার ফুট পানির নিচে। তারপর মাথার দিকে প্রতি এক মাইলে এক মাইল বেড়ে গেছে উচ্চতা। ওটাকেই পানির নিচে পৃথিবীর সবচেয়ে খাড়া ঢাল বলে জানি।'

'হ্যাঁ,' গলার ভেতর থেকে শব্দটা বেরোল এগজিকিউটিভ অফিসারের। 'আমাদের এই আবিষ্কার মনে হচ্ছে বিজ্ঞানী মহলে সাড়া জাগাবে।'

'কে জানে, মু-এর হারিয়ে যাওয়া মহাদেশই আবিষ্কার করে বসেছি কিনা আমরা!'

'ওসব বাজে কথা বাদ...' দাও বলতে গিয়েও বাধা পেয়ে থেমে গেলেন কমান্ডার।

'আঠারোশো পঞ্চাশ ফুট,' নিরাসক্ত গলায় ঘোষণা করল ইকো-সাউন্ডারে নজর রেখেছে যে।

'হায় খোদা!' কথা আটকে যাচ্ছে নেভিগেটরের। 'আ-আধ মাইলে হা-হাজার ফুটের বেশি! অসম্ভব!'

কন্ট্রোলরুমের পোর্ট সাইডে, মানে, বামদিকে বসানো ইকো সাউন্ডার। এগিয়ে গিয়ে ঝুঁকে দাঁড়ালেন কমান্ডার। গ্লাস এনকেসিঙের কয়েক ইঞ্চি দূরে পৌছল তাঁর নাক। সাগরের তলাটা দেখাচ্ছে ডিজিটাল ডিসপ্লে। লম্বা আঁকাবাঁকা কালো রেখার মাথাটা উঠে যাচ্ছে ওপরের দিকে। স্কেলের চূড়ায় লাল ডেঞ্জার মার্কের কাছে গিয়ে পৌছুতে বেশি দেরি নেই।

সোনার অপারেটরের কাঁধে হাত রাখলেন কমান্ডার। 'ক্যালিব্রেশনে কোন গোলমাল হয়নি তো?'

একটা সুইচ টিপে পাশের একটা ডায়ালের দিকে তাকাল অপারেটর। 'না, স্যার। ইনডিপেনডেন্ট ব্যাক-আপ সিস্টেমও একই রিডিং দিচ্ছে।'

ওপরে উঠতে থাকা ডেপথ লাইনটার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন কমান্ডার। তারপর আবার ফিরে এলেন প্লট টেবিলের কাছে। পেন্সিলে চিহ্নিত করা সাবমেরিনের পজিশনের সঙ্গে উঠতে থাকা সাগরের তলদেশের অবস্থা খতিয়ে

দেখলেন।

'ব্রিজ বলছি,' লেফটেন্যান্টের যান্ত্রিক গলা শোনা গেল স্পীকারে। 'দেখতে পাচ্ছি ওটাকে।' একটু দ্বিধা। 'কুয়াশা। নিউ ইংল্যান্ডে যে ধরনের ফগ ব্যাংক দেখা যায়, অনেকটা ওই রকম।'

মাইক্রোফোনের সুইচ টিপলেন কমান্ডার। 'বুঝেছি।' চার্টের দিকে মনোযোগ তাঁর। মুখ দেখে মনের অবস্থা বোঝা যাচ্ছে না, তবে চোখে চিন্তার ছায়া।

'পার্ল হারবারে সিগন্যাল পাঠাব, স্যার?' জানতে চাইল নেভিগেটর। 'তদন্ত করার জন্যে রেকন-প্লেন পাঠাক।'

সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিলেন না ম্যাসন। টেবিলের ধারে এক হাতের আঙুলের মাথা ধীরে ধীরে ঠুকছেন। অন্য হাত ঝুলে রয়েছে অলস ভঙ্গিতে। আচমকা কোন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলা স্বভাব নয় তাঁর।

এর আগেও জরুরী অভিযানে ক্যাপ্টেন ম্যাসনের সঙ্গে কাজ করেছে স্করপিয়নের অনেক নাবিক। তাঁকে অন্ধ ভক্তি করে না ওরা, ঠিক, কিন্তু তাঁর বিচার-বুদ্ধির ওপর আস্থা এবং শ্রদ্ধা দুই-ই রাখে। মারাত্মক কোন ভুল করে তাদের জীবন বিপন্ন করবেন না কমান্ডার, এ বিশ্বাস তাদের আছে। কিন্তু নাবিকদের এই ধারণাকে চমকে দিয়ে এবারে বোধহয় ভুলই করে বসলেন তিনি।

'ওটা কি, দেখতে হবে,' শান্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন কমান্ডার। 'চলো ওদিকে।'

দু'জন দু'জনের দিকে তাকাল এগজিকিউটিভ অফিসার এবং নেভিগেটর। চোখে অবিশ্বাস। মহড়া দেবার আদেশ আছে স্করপিয়নের ওপর। দিগন্তের কাছে কোন কুয়াশার স্তরকে তাড়া করে বেড়ানোর জন্যে আসেনি ওরা। কিন্তু তাদের ইচ্ছে-অনিচ্ছেয় কিছু যায় আসে না। কমান্ডারের আদেশ, পালন করতে হবে।

হঠাৎ স্বভাববিরুদ্ধ কাজ কেন করে বসলেন পিটার ম্যাসন, কেন আদেশ অমান্য করলেন, কেউ বলতে পারবে না। কে জানে, অজানাকে জানার কৌতূহলই হয়তো উদ্বুদ্ধ করেছে তাঁকে। কিংবা কল্পনায় হয়তো নিজেকে কোন আবিষ্কারক দলের নেতা হিসেবে দেখতে চেয়েছেন, আবিষ্কারের গৌরব অর্জন করতে চেয়েছেন—যে-সুযোগ এর আগে কোনদিনই পাননি তিনি।

কোর্স পাল্টাল স্করপিয়ন। দিগন্তে জমে ওঠা আজব কুয়াশা-স্তরের দিকে ধেয়ে চলল তীব্র গতিতে, রক্তের গন্ধ পেয়েছে যেন ব্লাডহাউন্ড। ভোঁতা নাকে বাড়ি খেয়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে, ছিটকে দু'পাশে সরে যাচ্ছে ছোট ছোট ঢেউ।

পার্ল হারবারের ডকে স্করপিয়নের ফিরে আসার কথা ছিল ওই সপ্তাহেরই সোমবারে। কিন্তু ফিরল না। তার উদ্দেশে পাঠানো সমস্ত রেডিও সিগন্যাল ব্যর্থ হলো, কোন জবাব এল না। বিস্তৃত এলাকা জুড়ে তল্লাশী চালানো হলো, সম্ভাব্য সব জায়গায় আকাশ-পানি তোলপাড় করে ফেলল নেভির জাহাজ-সাবমেরিন প্লেন। কিন্তু স্করপিয়নের ধ্বংসাবশেষের কোন চিহ্নই পাওয়া গেল না। একেবারে কিচ্ছু না। যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে ওটা।

হতাশ হয়ে ফিরে আসতে হলো তল্লাশী-অভিযানে অংশ নেয়া দলগুলোকে। একশো ষাট জন লোক আর আধুনিকতম সাবমেরিনের বেমালুম গায়েব হয়ে যাওয়াটা শেষ পর্যন্ত মেনে না নিয়ে উপায় রইল না ইউ এস নেভির। সরকারীভাবে ঘোষণা করা হলো স্করপিয়নের নিখোঁজ সংবাদ। স্তব্ধ হয়ে শুনল লোকে, উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরের বিস্তৃত শূন্যতার মাঝে একশো ষাটজন নাবিকসহ কোথায় জানি হারিয়ে গেছে সাবমেরিনটা।

অদ্ভুত এক রহস্য সৃষ্টি হলো। স্করপিয়ন আর তার নাবিকেরা কখন, কোথায়, কিভাবে, কেন হারাল, কেউ অনুমান করতে পারল না।

এ যেন আরেক বারমুডা ট্রায়াঙ্গল রহস্য!

দুই

বিশাল এক ছাতার তলায় চিৎ হয়ে মাদুরে শুয়ে আছে মাসুদ রানা। পরনে সাদা বেদিং ট্রাংকস। শ্বাস-প্রশ্বাসের তালে তালে খুব ধীরে ওঠানামা করছে চওড়া রোমশ বুক। ছাতার তলায় ছায়ায় শুয়েও একটু একটু ঘামছে রানা। না, সানট্যানের উদ্দেশ্যে কায়েনা পয়েন্টের এই নির্জন বালুকা বেলায় আসেনি সে। আসলে এখানকার এই নির্জনতা তার খুবই পছন্দ। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের আর সব সাগর-সৈকতগুলোর মত সাঁতারুদের ভিড় মোটেই নেই এখানে। পরিষ্কার বালি, ঝকঝকে রোদ, নীল সাগর, কালো পাথরের টিলা, সাদা অ্যালবেট্রস, কেমন যেন নেশা ধরায় রানার মনে। এখানে কেমন একটা আদিমতার গন্ধ রয়েছে, রক্তে নেশা-মত জাগে, অন্তরের অন্তস্তলে অনুভব করা যায় অনাদি অনন্তের দোল।

অনেকক্ষণ একইভাবে চুপচাপ পড়ে রয়েছে রানা। এবার একটু নড়েচড়ে উঠল। কাত হয়ে শুলো। তন্দ্রার আমেজটুকু জোর করে চোখ থেকে তাড়িয়ে এক কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে নিজেকে তুলল খানিকটা। কব্জিতে বাঁধা ওয়াটার-প্রুফ রিস্টওঅচের দিকে চাইল। ওরে বাবা, এখানে এসেছে দুই ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে! এখনও যখন আসেনি, মনে হয় আজ আর আসবে না গিলটি মিঞা। জরুরী কোন কাজে আটকা পড়ে গেছে হয়তো, নইলে এসে যেত এতক্ষণে। সোজা হয়ে বসে সামনে সাগরের দিকে তাকাল।

মুষ্টিযোদ্ধার লেফট জ্যাবের মত যেন কাউয়াই প্রণালীর ভেতরে ঢুকে গেছে কায়েনা পয়েন্টের সৈকত। প্রণালীর বাইরে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় সূর্যের কড়া রোদ প্রতিফলিত করছে, সাগর ঝকঝক করছে। শুধু গায়ে রোদ লাগাতে যারা আসে, তাদের কাছে সৈকত হলো খেলার জায়গা—সাঁতার কাটে, চামড়ায় রোদ লাগায়, ছাতার তলায় শুয়ে-বসে অন্যান্য অর্ধনগ্ন দেহগুলো দেখে, কিংবা বই-ম্যাগাজিন পড়ে, এই তাদের কাজ। কিন্তু সাগর-সৈকতকে অন্য চোখে দেখে রানা। তার

কাছে এটা জড় কিছু নয়, জ্যান্ত। নড়ছে চড়ছে, রূপ আর আকৃতি বদলাচ্ছে বাতাস আর ঢেউয়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে। কায়েনা পয়েন্টের সৈকত তো আরও বেশি জ্যান্ত।

প্রণালীর ভেতরের ঢেউগুলোর দিকে তাকিয়ে ভাবছে রানা, হাজার হাজার মাইল দূরে গভীর সাগরে কোথায় কখন যেন ঝড় বয়ে গেছে, জন্ম হয়েছে এই ঢেউয়ের। জন্মের পর পরই রওনা হয়ে গেছে, মাইলের পর মাইল পেরিয়ে এসে পৌঁছেছে এই হাওয়াই দ্বীপের তীরে। কাছে এসে অগভীর ঢালু তলায় ধাক্কা খেয়ে গতি এবং উচ্চতা বেড়ে গেছে। ছোট ঢেউগুলো বড়, আরও বড় হতে হতে আট ফুট উঁচু হয়ে গেছে একেকটা। প্রণালীর দু'পাশের পাথুরে দেয়ালে বাড়ি খাচ্ছে মস্ত সে ঢেউ—ভাঙছে, পানি ছিটাচ্ছে, ফেনা তৈরি করছে। ফেনার মুকুট মাথায় নিয়ে দুলতে দুলতে তীরে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে ঢেউয়ের শরীর, হড়হড়ে বালি ওঠাচ্ছে-নামাচ্ছে, নিজেদের বিলীন করে দিচ্ছে বালির বুকে। খানিকক্ষণ ঢেউয়ের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে ফেনাগুলোকে ধরে রাখছে বালি, তারপর শুষে নিচ্ছে ধীরে ধীরে। চলছে এমনিভাবেই। মুমূর্ষুরা মারা যাচ্ছে, নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়ে জায়গা করে দিচ্ছে পরের আগন্তুকদের।

হঠাৎই জিনিসটা চোখে পড়ল রানার। রঙের ঝলক। তীর থেকে তিনশো ফুট দূরে উত্তাল ঢেউয়ের ওপারে দেখা গেল ওটাকে, এক পলকের জন্যে। তারপরেই ঢেউয়ের আড়ালে হারিয়ে গেল জিনিসটা। কৌতূহলী চোখে খুঁজল রানা। কয়েক মুহূর্ত পর উঁচু ঢেউটা সরে যেতেই আবার দেখা গেল ওটাকে। এতদূর থেকে আন্দাজ করা যাচ্ছে না কি জিনিস, কিন্তু রঙটা বোঝা যাচ্ছে। রোদ পড়ে চকচক করছে উজ্জ্বল হলুদ রঙ।

চুপচাপ বসে থাকার সিদ্ধান্ত নিল রানা। ঢেউয়ের দোলায় আপনিই আস্তে আস্তে তীরের কাছে চলে আসবে, তখন তুলে এনে দেখা যাবে জিনিসটা কি। কিন্তু তার ইচ্ছে মত কাজ হলো না, এল না ওটা। পনেরো মিনিট অপেক্ষা করল রানা। কিন্তু না, আসার নামগন্ধও নেই। ঢেউয়ের ধাক্কায় ঝটকা খেয়ে নাচতে নাচতে কয়েক ফুট এগিয়ে আসে, তারপরেই বহির্মুখী স্রোতের ঠেলায় চলে যায় আগের জায়গায়। কয়েক ফুট ব্যাসের ভেতরেই থেকে যাচ্ছে সারাক্ষণ।

আরও কয়েক মিনিট অপেক্ষা করল রানা। যাবে কিনা ভাবছে। বিশাল ঢেউ তো দেখতেই পাচ্ছে, শুনেছে, মারাত্মক রিপ কারেন্টও নাকি রয়েছে এই প্রণালীতে। এই ভয়ানক স্রোতের জন্যেই এখানে সাঁতার কাটতে আসে না লোকে। প্রমাণও দেখছে। হলুদ জিনিসটাকে কাছে আসতে দিচ্ছে না স্রোত। তার মানে, নামলে স্রোত তাকে টেনে নিয়ে যাবে ঠিকই, কিন্তু ফেরার সময় বাধা দেবে। রিপ কারেন্ট সম্পর্কে খুব একটা ধারণা নেই রানার। তবে এটুকু জানে সে, খুবই তীব্র ওই স্রোত। কিন্তু তাই বলে হলুদ জিনিসটা কি অজানাই থেকে যাবে?

কৌতূহলেরই জয় হলো শেষ পর্যন্ত। উঠে দাঁড়াল রানা। ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল সৈকত রেখার কাছে। পানিতে নামল। হাঁটু পানিতে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। দুই পা ঘিরে নাচানাচি করছে নোনাপানি আর সাদা ফেনা, কেমন যেন চুমু খাওয়ার মত

সুড়সুড়ে অনুভূতি পায়ের চামড়ায়।

আরও খানিক নেমে এল রানা। চোখ তুলে আরেকবার তাকাল হলুদ জিনিসটার দিকে। ঢেউয়ের দিকে তাকিয়ে, স্রোতের কথা ভেবে মনে দ্বিধা। ঝুঁকিটা নেয়া কি উচিত হবে? সমাধান করে দিল এক বিশাল ঢেউ। গায়ের ওপর এসে হুড়মুড়িয়ে পড়ল। ঝাঁপ দিল রানা ঢেউয়ের বুকে।

পানির রঙ ঘোলাটে সবুজ। চমৎকার উষ্ণ। তাপমাত্রা পঁচাত্তর থেকে আটাত্তর ডিগ্রীর ভেতরে। ঢেউটা মাথার ওপর থেকে সরে গেল, নাক তুলে শ্বাস নিল রানা। পা দুটো দ্রুতবেগে চলছে, ব্রেস্ট-স্ট্রোক দিয়ে অঠাঁই পানিতে চলে এসেছে সে। স্রোতের টান অনুভব করছে। একটু পরেই বুঝল, এভাবে ভেসে থেকে সাঁতরানো সম্ভব নয়। স্রোত টানছে সামনের দিকে। ঢেউ ঠেলছে পেছনে। বড় বড় ঢেউয়ের জন্যে শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। ডুব দিল রানা। টের পেল, দ্রুত সামনের দিকে তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে স্রোত, তীব্র রিপ কারেন্ট।

দম ফুরিয়ে গেলেই পানির ওপর মাথা তুলছে রানা। ঢেউ ফুঁড়ে বেরিয়ে কোনমতে শ্বাস নিচ্ছে। সামনে কি আছে ঢেউয়ের জন্যে দেখা যাচ্ছে না। ঢেউয়ের মাথায় ঝাপটা মারছে জোর বাতাস, ফুঁসে উঠে ভেঙে যাচ্ছে চূড়াগুলো। বৃষ্টির মত পানি ছিটকে পড়ছে চারদিকে, চোখেমুখে সুচের মত এসে বিঁধছে। তাই শ্বাস নিয়েই আবার ডুব দিতে হচ্ছে রানাকে।

বার দশেক ডুবল-ভাসল রানা, তারপর মুখ তুলে দেখল বেশ ছোট হয়ে গেছে ঢেউ। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে না আর। ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকাল। রোদ মাথায় নিয়ে ঝাঁপাঝাঁপি করছে তুমুল ঢেউ। খোলা সাগরে বের করে নিয়ে এসেছে তাকে স্রোত।

মিনিট দুয়েক চুপচাপ চিৎ হয়ে ভেসে থেকে বিশ্রাম নিল রানা। তারপর মাথা তুলে তাকাল চারদিকে। হলুদ জিনিসটাকে খুঁজছে।

বাঁয়ে, বিশ গজ দূরে দেখা গেল ওটাকে। আগের জায়গায়ই রয়েছে। লুকোচুরি খেলছে ছোট ছোট ঢেউয়ের সঙ্গে। চিৎ হয়ে আস্তে আস্তে সেদিকে সাঁতরাতে লাগল রানা। পরিশ্রান্ত না হয়ে পড়ে, সেদিকে খেয়াল রাখল। বুঝতে পারছে, শক্তি হারিয়ে ফেললে কোনদিন আর ফিরে যেতে পারবে না তীরে।

কাছে এসে হাত বাড়িয়ে জিনিসটাকে ধরল রানা। হলুদ মোটা পলিথিনের মুখ বন্ধ একটা ব্যাগ, তার ভেতরে কঠিন একটা জিনিসের অস্তিত্ব অনুভব করল সে। সিলিন্ডার জাতীয় কিছু হবে। ব্যাগের গায়ে ইংরেজী ক্যাপিট্যাল লেটারে লেখা আছে 'ইউ এস নেভি'।

জিনিসটা হাতে পেয়েছে রানা, এবার ফিরে যেতে হবে। ঘুরে তীরের দিকে তাকাল। যতদূর চোখ যায়, সৈকতের কোথাও কেউ নেই। সে যে পানিতে নেমেছে, কেউ দেখেনি। না, দেখেছে, একটা অ্যালবেট্রস। মাথার ওপর চক্কর দিচ্ছে ওটা। রোদ চমকাচ্ছে সাদা ডানায়। ওপরের দিকে তাকিয়ে পাখিটাকে দেখল রানা কিছুক্ষণ, ভয়ানক একা মনে হলো নিজেকে।

আবার সৈকতের দিকে চোখ ফেরাল রানা। ঝকঝকে বালির পটভূমিতে কঠিন

পাথরের টিলাগুলোকে বড় বেশি রুক্ষ মনে হচ্ছে। নিতান্ত বোকার মতই ঝুঁকি নেয়া হয়ে গেছে, বুঝতে পারছে রানা পরিষ্কার। মাথা সমান ঢেউ আর প্রবল স্রোতকে ঠেলে এখন তীরে ফিরবে কি করে? ব্রজেন দাস কিংবা মোশাররফ হলে এক কথা ছিল, ওর পক্ষে অসম্ভব।

হঠাৎই মনে পড়ল কথাটা। কোথাও শুনেছে সে, রিপ কারেন্টের গতিবেগ সব জায়গায় সমান হয় না। স্রোতের প্রচণ্ডতার জন্যে কোথাও পানিতেই নামা যায় না, অথচ তার মাত্র একশো গজ দূরেই হয়তো স্রোতের টান নেই, নিরাপদে সাঁতার কাটে বাচ্চারা। তার মানে, তীর বরাবর সাঁতরে ডানে কিংবা বাঁয়ে শ'খানেক গজ সরে যেতে হবে তাকে। স্রোতের আওতার বাইরে সরে যেতে পারলে হয়তো সহজেই সাঁতরে তীরে ফিরে যেতে পারবে।

ধীরে ধীরে সাঁতার কাটতে শুরু করল রানা। স্রোতের কাছ থেকে যতই সরে যাচ্ছে, আরেকটা আশঙ্কা গ্রাস করছে মনকে। সাগরের আতঙ্ক, হাঙর! ভয়ঙ্কর ওই খুনে দানবগুলো টের পেলেই সেরেছে, ছুটে এসে নিমেষে ছিন্নভিন্ন করে ফেলবে তাকে। কোনরকম আগাম সঙ্কেত দেবে না। যখন টের পাওয়া যাবে, হয়তো একটা হাত কিংবা পা তখন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে শরীর থেকে। রক্তের গন্ধ পেলে আরও পাগল হয়ে যাবে হাঙরের দল। তারপর...ফীডিং ফ্রেঞ্জি...আঁৎকে চারপাশে তাকাল রানা। না, পানির ওপর কোন পাখা দেখা যাচ্ছে না। জোর করে মন থেকে আতঙ্ক তাড়াতে চাইছে সে, কিন্তু নিজের অজান্তেই বেড়ে যাচ্ছে গতি। ধাওয়ারত হাঙরের থেকে একগজ এগিয়ে থাকতে পারলেও লাভ।

দ্রুত সাঁতরাতে গিয়ে দ্রুত ক্ষয় করে ফেলছে শরীরের শক্তি। এরই মাঝে বার বার মাথা তুলে তাকাচ্ছে আশেপাশে, সামনে, পেছনে। হাঙরের ডরসাল ফিন দেখা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু পানির নিচে কি আছে কে জানে! হয়তো এই মুহূর্তে...অবশ হয়ে আসছে শরীর, কিন্তু এই কথাটা মনে এলেই কোত্থেকে যেন শক্তি এসে যায়, মেশিনের মত হাত-পা চলে কয়েক মিনিট। তারপর আবার লাগে ভয়। তীরের দিকেই সাঁতরাচ্ছে এখন। উফ্, আর কতক্ষণ! কতক্ষণ লাগবে তীরে পৌঁছুতে?

বিশ্রামের কথা ভাবছে রানা, এই সময় বালি ঠেকল পায়ে। কোনমতে আরও হাত দুই এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। হাঁ করে শ্বাস নিচ্ছে। আরও, আরও বেশি বাতাস চাইছে ফুসফুস। বুকের খাঁচা থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে যেন আকুলি বিকুলি করছে হৃৎপিণ্ডটা। মাতালের মত টলতে টলতে কোনমতে তীরের দিকে এগোল সে।

হাঁটু পানিতে বসে বসেই জিরিয়ে নিল রানা। তারপর মন দিল জিনিসটার দিকে। পলিথিনের ব্যাগের মুখ নাইলনের সুতো দিয়ে বাঁধা। খুলল ওটা সে। ভেতর থেকে টেনে বের করল সিলিন্ডারটা। অ্যালুমিনিয়মের তৈরি, ওজন পাউন্ড ছয়েক হবে। ঠিক এই জিনিস এর আগে কখনও দেখেনি রানা। এক মাথায় একটা স্ক্রু ক্যাপ, পেঁচিয়ে আটকানো। মুচড়ে ক্যাপটা খুলতে শুরু করল।

ক্যাপ খুলে সিলিন্ডার উপুড় করে ভেতরের জিনিস ঢালল সে হাতের তালুতে।

শক্ত করে বাঁধা কাগজের একটা ছোট রোল বেরোল ভেতর থেকে। আর কিছু নেই। ভেজা হাতেই রোল খুলল রানা। অবাক হলো। কোন জাহাজের লগবুকের ছেঁড়া কয়েকটা পাতা বলে মনে হচ্ছে।

কাগজের লেখা পড়তে শুরু করল রানা। ক্রমেই কুঁচকে যাচ্ছে ভুরু। রুদ্ধশ্বাসে পড়তে পড়তে একের পর এক দ্রুত উল্টে গেল সে-পাতা। পড়ায় এতই মনোযোগ, চিৎকারটা শুনে চমকে উঠল সাংঘাতিক ভাবে। ঝট করে ঘাড় ফেরাল একপাশে। না, তেমন কিছু না। বালিতে ঠোঁট ঢুকিয়ে স্যান্ড ওঅর্ম বের করে এনেছে একটা স্যান্ড পাইপার। আরেকটা পাখি তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কেড়ে নিতে চাইছে। পাখি দুটোর পেছনে অদ্ভুত ভঙ্গিতে একপাশে ডানা কাত করে বাতাসে ভাসছে একটা পেট্রেল। এই কায়দাটা জানে বলেই প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যেও উড়তে পারে এই পাখি। আশেপাশে ওপরে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়েই আবার কাগজের লেখার দিকে দৃষ্টি ফেরাল রানা।

শেষ পৃষ্ঠাটা পড়ার সময় রীতিমত হাত কাঁপছে ওর। চোখ তুলে সাগরের দিকে তাকাল। আবার চোখ ফিরিয়ে শেষ কয়েকটা লাইন পড়ে ফেলল এক নিঃশ্বাসে। আবার তাকাল সাগরের দিকে। বিড় বিড় করে উচ্চারণ করল নামটা। শেষ লাইনের শেষ কয়েকটা অক্ষর। নামটা: অ্যাডমিরাল জেমস ম্যাকডেভিড।

পুরো দশ মিনিট সাগরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবল রানা। তারপর কাগজগুলো আবার আগের মত রোল করে সিলিন্ডারে ঢোকাল। ক্যাপ লাগিয়ে হলুদ ব্যাগে ভরল সিলিন্ডারটা। মুখ বাঁধল সুতো দিয়ে।

ঢেউয়ের গর্জন ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। কেমন যেন অপার্থিব মনে হচ্ছে এখন দৃশ্যটা। এখনও একই ভাবে আছড়ে পড়ছে ঢেউ, একই ভাবে মারামারি করছে ওগুলোর সঙ্গে বাতাস, স্রোতও আছে তেমনি, কিন্তু সবই কেমন যেন অবাস্তব মনে হচ্ছে ওর কাছে।

উঠে পড়ল রানা। প্যাকেটটা বগলদাবা করে পানি থেকে উঠে দ্রুত পায়ে হেঁটে এসে দাঁড়াল ছাতার কাছে। তুলে বন্ধ করল ছাতাটা। হলুদ প্যাকেটটা পেঁচিয়ে নিল পাতলা ছোট মাদুর দিয়ে। তারপর ছুটল।

সৈকত ঘেঁষা রাস্তার ওপর চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছে উজ্জ্বল লাল এসি ফোর্ড কোবরা। দেখে মনে হয় বিশ্বস্ত কুকুর যেন দাঁড়িয়ে আছে প্রভুর ফেরার অপেক্ষায়। সময় নষ্ট করল না রানা। পেছনের সীটে ছাতাটা ছুঁড়ে ফেলে দরজা খুলে ড্রাইভিং সীটে উঠে বসল। মাদুরে মোড়ানো সিলিন্ডারটা রাখল পাশের সীটে। ইগনিশন-কী লাগিয়েই ঘোরাল। একটা অদ্ভুত অনুভূতি টের পাচ্ছে পাকস্থলীতে, এখনও মৃদুমৃদু কাঁপছে হাত। গত আধঘণ্টার সমস্ত ব্যাপার এখনও আচ্ছন্ন করে রেখেছে মগজ, পরিষ্কার চিন্তা করতে পারছে না।

'দুত্তোর ছাই!' নিজেকেই গাল দিল রানা। মাথা ঝাড়া দিয়ে গিয়ার দিল।

শাঁ করে হাইওয়ে নাইনটি নাইন ধরে ছুটল গাড়ি। দ্রুত পেরিয়ে এল ওয়াইয়ালুয়া। সামনে দূরে পথের পাশে আপাতত শুকনো নির্ঝর কাউকোমাহুয়া স্ট্রীম। চমৎকার এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য। রিয়ারভিউ মিররে স্কোফিল্ড ব্যারাক্স

মিলিটারি রিজারভেশন ছোট হয়ে হারিয়ে যেতে দেখল রানা। স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে শাঁই করে মোড় নিল। নিচে ওয়াহিয়াওয়া ছাড়িয়ে পার্ল সিটির দিকে ছুটল দ্রুত গতিতে। রাস্তায় আচমকা হাইওয়ে-পেট্রোলম্যানের সামনে পড়ে যাবার আশঙ্কা আছে। কিন্তু গতি কমাল না রানা।

বাঁয়ে উঠে গেছে কুলাও মাউনটেইন। চিরস্থায়ী কালো মেঘ ফুঁড়ে উঠে গেছে চূড়া। আগ্নেয়-পাহাড়ের ঢালের মাটি উর্বরা, লাল। তাতে পরিচ্ছন্ন সারিবাঁধা আনারস খেত। লালের পটভূমিকায় আনারস পাতার গাঢ় সবুজ রঙ দেখতে ছবির মত লাগছে। ছুটন্ত লাল কোবরার উইন্ডশীল্ডে যেন দ্রুত আলপনা কেটে সরে যাচ্ছে লালমাটি-সবুজ পাতা। অপূর্ব!

পাহাড়ী পথ ধরে উঠতে উঠতে হঠাৎই চিরস্থায়ী মেঘের দেশে পৌছে গেল রানা। আচমকা একঝলক বৃষ্টি আছড়ে পড়ল কোবরার ওপর। হাত বাড়িয়ে উইন্ডস্ক্রীন-ওয়াইপারের নব টিপে দিল সে।

যেমন ঢুকেছিল, তেমনি আচমকাই আবার মেঘের দেশ থেকে বেরিয়ে এল কোবরা। পার্ল হারবারের প্রধান তোরণ চোখে পড়ছে। গতি কমিয়ে দিল রানা।

কোবরাটাকে দেখেই গার্ডরুম থেকে বেরিয়ে এল ইউনিফর্মধারী গার্ড। গেটে ঢোকার মুখে এসে দাঁড়াল। হাত তুলে থামার নির্দেশ দেবার আগেই পাশে এসে ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষল রানা। গ্লাভ কম্পার্টমেন্ট থেকে ওয়ালেট বের করে কার্ড দেখাল গার্ডকে।

গার্ডের কাঁধে সার্জেন্টের ব্যাজ লাগানো। ছবির সঙ্গে রানার চেহারা মিলিয়ে দেখল। ভাল করে আরেকবার তাকাল ছবির ইউনিফর্মের কাঁধের দিকে। কার্ডটা রানার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে খটাস করে স্যালুট ঠুকল। তারপর হাত নেড়ে ঢোকার নির্দেশ দিল।

স্যালুট ফিরিয়ে দিল রানা। গিয়ার দিতে গিয়ে খেয়াল হলো, অ্যাডমিরাল ম্যাকডেভিডের অফিস চেনে না সে। ফিরে সার্জেন্টকে জিজ্ঞেস করল। পকেট থেকে নোটবই বের করে একটা পাতা ছিঁড়ে নিল সার্জেন্ট। কলম দিয়ে ম্যাপ এঁকে বুঝিয়ে দিল কোথায় অ্যাডমিরালের অফিস। কাগজটা জানালা গলিয়ে রানার হাতে দিয়ে আবার স্যালুট করল গার্ড।

ম্যাপ দেখে দেখে ডক এরিয়ার শেষ প্রান্তে চলে এল রানা। একটা কংক্রিটের বিল্ডিঙের সামনে এনে গাড়ি রাখল। ছোট বাড়িটা প্রায় পেরিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎই চোখ পড়ল সাইনবোর্ডটার ওপর। পরিষ্কার অক্ষরে লেখা রয়েছে: হেডকোয়ার্টার্স, ১০১ তম স্যালভেজ ফ্লীট। স্টার্ট বন্ধ করল রানা। হাত বাড়িয়ে পাশের সীট থেকে মাদুরে মোড়ানো সিলিন্ডারটা নিয়ে নেমে এল গাড়ি থেকে। গেটের দিকে এগোল। সঙ্গে শার্ট-প্যান্ট না আনার জন্যে সঙ্কোচ বোধ করছে।

প্রথম ঘরটায় ঢুকে দেখল রানা, ডেস্কে কাজ করছে একজন লোক। নেভির সামার হোয়াইট ইউনিফর্ম পরনে। যন্ত্রের মত টাইপরাইটারে চাবি টিপছে লোকটা। সামনের দিকে ডেস্কের ওপরে রাখা নেমপ্লেট: সী-ম্যান বব কলিনস।

ডেস্কের সামনে এসে দাঁড়াল রানা। 'এক্সকিউজ মি। অ্যাডমিরাল

ম্যাকডেভিডের সঙ্গে দেখা হবে?'

মুখ তুলে তাকাল সী-ম্যান। চোখ দুটো যেন বেরিয়ে আসবে কোটর ছেড়ে। 'মাই গড, পাগল নাকি! এখানে, এই অফিসে বেদিং স্যুট···আবার বগলে মাদুরও আছে! জলদি ভাগো, অ্যাডমিরাল দেখে ফেললে বারোটা বাজাবে তোমার!'

'মীটিঙে আসিনি আমি,' শান্ত কণ্ঠে বলল রানা। 'ব্যাপারটা অত্যন্ত জরুরী। এক্ষুণি অ্যাডমিরালের সঙ্গে দেখা হওয়া দরকার।'

উঠে দাঁড়াল সী-ম্যান। রক্ত জমেছে মুখে। 'ফাজলেমি করো না!' ধমকে উঠল বব। 'ঘরে গিয়ে জামা-কাপড় পাল্টে এসো, নইলে শোর পেট্রোল ডাকব আমি।'

'তাহলে তাই ডাকো!' আচমকা তীক্ষ্ণ হয়ে গেল রানার গলা।

'দেখো, দোস্ত,' জোর করে কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করছে বব। 'পাগলামি করো না। জাহাজে ফিরে যাও, ঠিকঠাক মত কাপড়চোপড় পরোগে। তারপর নিজের কমান্ডিং অফিসারের চিঠি নিয়ে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে এসো এখানে।'

'তার দরকার নেই, বব,' পাশ থেকে কথা শুনে ফিরে চাইল দু'জনেই। গম্ভীর, ভারিক্কি, করাতের মত কর্কশ কণ্ঠস্বর।

ডানদিকের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা লম্বা লোকটির চোখের দিকে তাকাল রানা। বুদ্ধির দীপ্তি সে-চোখে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত ধবধবে সাদা ইউনিফর্ম। কাঁধে সোনালী ব্যাজ। ছোট করে ছাঁটা সাদা চুল নিচের কর্মপরিশ্রান্ত মুখের সঙ্গে মানিয়ে গেছে। আগন্তুককে দেখেই বিখ্যাত ছবি স্টেজকোচের লম্পট জুয়াড়ীর অভিনয় করেছিল যে, সেই জন ক্যারাডাইনের কথা মনে পড়ে গেল রানার। একেবারে হুবহু প্রতিচ্ছবি, চোখ দুটো ছাড়া। ক্ষুরের ধার এই লোকের চোখের দৃষ্টিতে, রানাকে ফালা ফালা করে চিরছে যেন।

'আমি অ্যাডমিরাল ম্যাকডেভিড,' কথা বলল জন ক্যারাডাইন। 'ঠিক পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি তোমাকে, বাছা। এই পাঁচ মিনিট খামোকা নষ্ট করবে না।'

'নষ্ট হবে না, স্যার,' বলল রানা।

রানার কথা শেষ হওয়ার আগেই ঘুরে দাঁড়িয়েছেন অ্যাডমিরাল। লম্বা পা ফেলে ঢুকে যাচ্ছেন নিজের অফিসে। রানাও এসে ঢুকল পেছন পেছন। ঢুকেই থমকে দাঁড়াল। কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছে। একটা পুরানো চকচকে পালিশ করা কনফারেন্স টেবিল সামনে নিয়ে বসে আছে আরও তিনজন লোক। রানার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রয়েছে তিনজনেই। বগলে মাদুর, পরনে বেদিং স্যুট, অর্ধনগ্ন একটা লোক একজন অ্যাডমিরালের অফিসে···অবাক ব্যাপার বৈ কি।

পরিচয় করিয়ে দিলেন অ্যাডমিরাল, কিন্তু তাঁর মেকি ভদ্রতাটুকু ঠিকই ধরে ফেলল রানা। অতি ভদ্রতা, সেইসাথে জাঁক-জমক ও ঠাট দেখিয়ে ওর মনে ভয় ধরানোর চেষ্টা করছেন ম্যাকডেভিড। মনে মনে হাসল সে। রানাকে জানানো হলো, সোনালীচুলো জন কেনেডি চেহারা লোকটার নাম পল রিচার্ড, কাঁধের ব্যাজ জানাচ্ছে: লেফটেন্যান্ট কমান্ডার। ১০১ তম স্যালভেজ ফ্লীটের এগজিকিউটিভ অফিসার। তার পাশে বসা স্মার্ট চেহারার লোকটা ক্যাপ্টেন। নাম হেই

ম্যাকেঞ্জী। ম্যাকডেভিডের স্যালভেজ ফ্লীটের কমান্ডার সে। তৃতীয় লোকটির হাস্যকর চেহারা। বেঁটেখাট লোকটা চেয়ার থেকে প্রায় গড়িয়ে নেমে এসে ঝাঁকুনি দিল রানার হাত ধরে। লোকটা অ্যাডমিরালের সহকারী, কমান্ডার জন টার্নার। ঘরের চারজনের মধ্যে এই লোকটাকেই প্রথম দর্শনে অপছন্দ করল না রানা, আন্তরিকতা আছে এর চাল-চলনে। নিজের পরিচয় দিল সে।

'ও-কে, নেকেড বয়,' এবার কাজের কথায় আসছেন অ্যাডমিরাল। এক ঘুসিতে লোকটার সব ক'টা দাঁত খসিয়ে দেবার ইচ্ছেটা দমন করল রানা। এর মেয়েকে ঘনিষ্ঠভাবে না চিনলে হয়তো নিজেকে সামলাতে প্যরত না। 'একটা জরুরী মীটিঙে ব্যস্ত ছিলাম আমরা, বাধা দিয়ে কাজের ক্ষতি করছ।' ব্যঙ্গ প্রকাশ পেল তাঁর কণ্ঠে। 'এবার দয়া করে চটপট বলে ফেলো, কোন্ মহান উদ্দেশ্য নিয়ে ধন্য করতে এসেছ আমাদের।'

অনেক কষ্টে রাগ দমন করল রানা। সরাসরি অ্যাডমিরালের চোখের দিকে তাকাল। 'অ্যাডমিরাল, আপনি ধরেই নিয়েছেন র‍্যাঙ্কের বলে মানুষের সাথে দুর্ব্যবহারের অধিকার পেয়ে গেছেন। একজন উচ্চপদস্থ অফিসার, অফিসারের মত কথা বলুন। ভদ্র ব্যবহার করতে পয়সা ব্যয় হয় না।'

কারও অনুমতি না নিয়েই একটা খালি চেয়ার দখল করল রানা। খামোকা মুখ বাঁকিয়ে ডান চোখের নিচের চামড়া চুলকাল বুড়ো আঙুলের নখ দিয়ে। অ্যাডমিরালের ফেটে পড়ার অপেক্ষা করছে, কিন্তু ভাব দেখাচ্ছে যেন কেয়ার করে না।

বোম পড়েছে যেন কামরায়। টেবিলের ওপাশে অ্যাডমিরালের দিকে তাকাল একবার ম্যাকেঞ্জী, তারপরেই চোখ ফেরাল রানার দিকে। জ্বলছে চোখ। থমথমে গম্ভীর মুখ। 'গাধা নাকি! জানো তুমি কার সাথে ক-ক-ক...' কথা আটকে গেল তার।

'পাগল! বদ্ধ পাগল!' জোরে কথা বলতেও যেন সাহস পাচ্ছে না রিচার্ড। রানার দিকে সামান্য ঝুঁকে কথাটা বলল। ভয়ঙ্কর শীতল দেখাচ্ছে মুখচোখ।

'ইউ, স্টুপিড বাস্টার্ড!' ভয়ঙ্কর গলায় বললেন অ্যাডমিরাল। 'জানো, কার সঙ্গে কথা বলছ?'

'জানি, স্যার। ব্যাজটা না থাকলে পাঁড় মাতাল কোন সীম্যান ভাবতাম,' আশ্চর্য শান্ত রানার কণ্ঠ।

দড়াম করে টেবিলে আছড়ে পড়ল হেই ম্যাকেঞ্জীর ঘামে ভেজা হাতের মুঠি। 'শোর পেট্রোল! হতচ্ছাড়া ববটা কোথায়? শোর পেট্রোলকে ডাকতে হবে!'

'যাই বলো, ব্যাটার সাহস আছে,' বলতে বলতে বিশাল লম্বা এক চুরুট বের করলেন অ্যাডমিরাল। ধরালেন। ম্যাচের কাঠিটা ছুঁড়ে অ্যাশট্রেতে ফেলতে গিয়ে ফেললেন তার থেকে আধহাত দূরে। বরফ-ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে তাকালেন রানার দিকে। 'কোন উপায় আর রাখলে না, ছোকরা!'

পিঠ আর পায়ের সাহায্যে ঠেলে পেছনের দুই পায়ার ওপর চেয়ারটাকে কাত করল রানা। দুলতে দুলতে বলল, 'আমার নাম আমি জানিয়েছি, অ্যাডমিরাল—

মাসুদ রানা। বাছা, ছোকরা বা নেকেড বয় না। আপনাকে চিমসে চামার বলে ডাকলে আপনার কেমন লাগবে?'

টেবিলের ধার খামচে ধরলেন অ্যাডমিরাল। এতই জোরে, যে আঙুলের রক্ত সরে গেল। ফ্যাকাসে সাদা দেখাচ্ছে। কঠিন গলায় বললেন, 'নিজের কপাল নিজেই পোড়ালে, রানা।' রিচার্ডের দিকে তাকালেন। 'শোর পেট্রোলকে ডাকতে বলো ববকে।'

'আমি মানা করছি, অ্যাডমিরাল,' উঠে দাঁড়িয়েছে জন টার্নার। রানার চেয়ারের পেছনে এসে দাঁড়াল। 'বাড়াবাড়ি না করাই বোধহয় ভাল হবে। যাকে পাগল, গাধা, বাস্টার্ড বলে গাল দিচ্ছেন আপনারা, ও সাধারণ কেউ নয়। ও মেজর মাসুদ রানা। নুমার স্পেশাল প্রোজেক্ট ডাইরেক্টর। অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের বিশেষ স্নেহের পাত্র। শোর পেট্রোল দিয়ে হাজতে পাঠাবেন তো? কিন্তু আমেরিকার কোন জেলেই ওকে আটকে রাখতে পারবেন না। দরকার পড়লে ওকে ছাড়িয়ে নেবার জন্যে প্রেসিডেন্টের কাছে চলে যাবে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন।'

অস্পষ্ট গলায় গাল দিয়ে উঠল ম্যাকেঞ্জী, কিন্তু কাকে দিল বোঝা গেল না।

প্রথমে সামলে নিল রিচার্ড। 'ওকে চেনো তুমি?'

'চিনি,' ঘুরে রানার পাশে চলে এল টার্নার। রানার মুখের দিকে তাকাল। 'ওর সঙ্গে আগের পরিচয় নেই আমার। কিন্তু আমার মামাতো ভাই জর্জের মুখে অনেকবার মাসুদ রানা নামটা শুনেছি। ওর কীর্তিকলাপের কথা শুনে শুনে চেহারাটাও মুখস্থ হয়ে গেছে। আরও একটা পরিচয় আছে— ও হচ্ছে রানা এজেন্সীর চীফ, সারা দুনিয়ায় কয়েকশো ব্রাঞ্চ রয়েছে ওর এজেন্সীর। কি, ঠিক বলিনি?'

হাসল রানা। 'ঠিকই বলেছেন আপনি, কমান্ডার। এতক্ষণে আমিও চিনতে পারছি—মায়ের দিকের চোখ পেয়েছেন আপনি। কিন্তু অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের চেহারা কিংবা আর কিছুর সাথে কোন মিল নেই।'

'এক বাপের দুই ছেলের মাঝেই মিল থাকে না অনেক সময়...' হাসছে টার্নার।

'তা ঠিক,' সায় দিল রানা।

'আমরা...মানে আমাদের দুর্ব্যবহারের কথা...আশা করি ভুলে যাবেন আপনি, মেজর...' আমতা আমতা করে বলেই ফেলল রিচার্ড।

রিচার্ডের দিকে তাকাল রানা। এদিক ওদিক মাথা নাড়াল, 'না।'

দৃষ্টি বিনিময় করল ম্যাকডেভিড এবং ম্যাকেঞ্জী। কথা হয়ে গেল চোখের ভাষায়। ঠিকই পড়তে পারল রানা। অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের ক্ষমতার কথা জানা আছে ওদের সবারই। স্বয়ং প্রেসিডেন্টের বিশেষ বন্ধু তিনি। তাঁর বিরাগভাজন হতে অন্তত ইউ এস নেভির কেউ চায় না। বেশ একটু ঘাবড়েছেন অ্যাডমিরাল ম্যাকডেভিড।

'যা হবার হয়েছে, মিস্টার রানা,' বলে উঠলেন অ্যাডমিরাল। গলাটাকে স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করছেন। 'ভুলে গেলেই সুখী হব। যাই হোক, কিজন্যে এসেছেন, বলে ফেলুন এবার।'

'আমি একটা জিনিস বয়ে এনেছি, স্যার,' শান্তকণ্ঠে বলল রানা। 'বীচে সাঁতার কাটছিলাম। পেয়ে গেলাম জিনিসটা। ওটা আসলে আপনার।'

'তাই নাকি?' মোটেও আগ্রহী মনে হলো না অ্যাডমিরালকে। আসলে রানার মাথায় চেয়ার ভাঙতে পারছেন না বলে আফসোসের সীমা নেই তাঁর। 'শুনে খুশি হলাম। তা, কি জিনিস?'

অ্যাডমিরাল এবং চেয়ারে বসা অন্য দু'জন লোকের দিকে তাকাল একবার রানা। বড় বড় চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে রিচার্ড এবং হেই ম্যাকেঞ্জী। যেন ঘরে গ্রেনেড ফেলতে যাচ্ছে রানা। মনে মনে হেসে বগল থেকে মোড়ানো মাদুরটা টেবিলে রাখল রানা। আঙুল তুলে মাদুরটা দেখিয়ে অ্যাডমিরালকে বলল, 'এর ভেতরে কিছু কাগজ আছে। আপনার নামটা লেখা আছে ওই কাগজে।'

বিন্দুমাত্র কৌতূহল প্রকাশ পাচ্ছে না অ্যাডমিরালের চোখে। 'কোথায় পেয়েছেন আপনি কাগজগুলো?'

'কায়েনা পয়েন্টে।'

সামনে ঝুঁকল জন টার্নার। 'বীচে কুড়িয়ে পেয়েছেন?'

মাথা নাড়ল রানা। 'না। ব্রেকারের ওপাশে ভাসতে দেখে সাঁতরে গিয়ে নিয়ে এসেছি।'

ভুরু কুঁচকে গেছে টার্নারের। 'কায়েনা পয়েন্টে সাঁতার কেটে ব্রেকারের ওপারে গিয়েছেন আপনি! আবার ফিরেও এসেছেন! অসম্ভব!'

রানার দিকে তাকিয়ে আছেন অ্যাডমিরাল। চিন্তিত। এক সেকেন্ড, তারপরেই চিন্তিত ভাবটা কাটিয়ে উঠে বললেন, 'দেখি, কি আছে?'

হাত বাড়িয়ে আবার মাদুরটা তুলে নিল রানা। খুলল। ভেতর থেকে হলুদ পলিথিন-ব্যাগটা বের করল। টেবিলে বালি পড়ছে, গ্রাহ্য করল না। ব্যাগটা ঠেলে দিল অ্যাডমিরালের দিকে।

'এই হলুদ ব্যাগটার ওপর নজর পড়েছিল আমার,' বলল রানা।

হাত বাড়িয়ে ব্যাগটা তুলে নিলেন অ্যাডমিরাল। অন্য তিনজনকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'চিনতে পারছ এটা তোমরা?'

ঘাড় কাত করে নীরবে সায় দিল তিনজনে।

'আপনি নিশ্চয়ই চিনতে পারেননি, মিস্টার রানা,' আস্তে করে ব্যাগটা আবার টেবিলে নামিয়ে রাখতে রাখতে বললেন অ্যাডমিরাল। 'সাবমেরিনে কাজ করলে অবশ্য পারতেন। এটা আর কিছুই নয়—কমিউনিকেশন ক্যাপসুল, পানির নিচ থেকে ওপরে খবর পাঠাবার ব্যবস্থা।' একটু থেমে আবার ব্যাগটা হাতে তুলে নিলেন অ্যাডমিরাল। হলুদ মোড়ক ছাড়াতে লাগলেন। বললেন, 'ক্যাপসুলের সঙ্গে লাল ডাইমার্কার থাকে। নিউম্যাটিক টিউবের ভেতর দিয়ে সাবমেরিন থেকে বাইরে বের করে দেয়া হয় এই ক্যাপসুল। ওপরে ভেসে ওঠার পর ক্যাপসুলের আশেপাশের পানিতে কয়েক হাজার বর্গফুট পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে লাল রঙ। কাছেপিঠে জাহাজ বা উড়োজাহাজ থাকলে এই রঙ পরিষ্কার দেখতে পায়।'

হলুদ মোড়ক খোলা শেষ হয়েছে অ্যাডমিরালের। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সিলিন্ডারের

দুটো মাথা-ই দেখছেন।

'ওই যে, ক্যাপটা,' আঙুল তুলে দেখিয়ে বলল রানা। 'প্রচণ্ড চাপেও যেন ভেতরে পানি ঢুকতে না পারে, এমনভাবে তৈরি।'

ঝট করে চোখ তুলে রানার দিকে তাকালেন অ্যাডমিরাল। 'ভেতরে কি আছে, দেখেছেন নাকি?'

'আরি! এতক্ষণ কি বললাম তাহলে!' কৃত্রিম বিস্ময় প্রকাশ করল রানা। 'না দেখলে জানলাম কি করে ওটার ভেতরে কাগজ আছে, আপনার নাম লেখা আছে?'

চকিতে একটা ছায়া খেলে গেল অ্যাডমিরালের চোখে। অন্য চারজন রানার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকায় দেখতে পেল না। কিন্তু রানা ঠিক-ই দেখল, ছায়াটায় চরম বিতৃষ্ণার ছোঁয়া।

'কি লেখা আছে, দয়া করে বলবেন কি?' জিজ্ঞেস করলেন অ্যাডমিরাল। 'নিজেই পড়ে দেখুন' বা এমনি কোন একটা উত্তর আশা করেছিলেন, কিন্তু তাঁকে অবাক করল রানা।

অ্যাডমিরালের দিকে দীর্ঘ একমুহূর্ত তাকিয়ে রইল সে। বলবে কি বলবে না, ভাবছে। কিন্তু, বলাটাই স্থির করল। জেমস ম্যাকডেভিডকে দরকার আছে তার। যে বিশেষ অ্যাসাইনমেন্টে তাকে পাঠানো হয়েছে হাওয়াই দ্বীপে, তাতে সফল হতে হলে এই অ্যাডমিরালের সাহায্য তার দরকার পড়বে।

'ভেতরে একটা নোট পাবেন, স্যার,' বলল রানা। 'আপনাকে অ্যাড্রেস করা। আর পাবেন ছাব্বিশটা পাতা। আপনাদের নিউক্লিয়ার সাবমেরিন স্করপিয়নের লগবুক থেকে ছেঁড়া।'

মুচকে হাসল রানা। কোটর ছেড়ে ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে চারজোড়া চোখ। হাঁ হয়ে আছে মুখগুলো।

তিন

'আশ্চর্য কতগুলো ঘটনা ঘটছে গত পাঁচদিন ধরে, সত্যি যার কোন ব্যাখ্যা নেই।'

লগবুকের পাতায় লেখাগুলো পড়ছেন অ্যাডমিরাল ম্যাকডেভিড, আর ভাবছেন।

'সমস্ত কিছুর জন্যে আমি, ক্যাপ্টেন পিটার ম্যাসন দায়ী। জাহাজের কোর্স চেঞ্জ করা হয়েছে আমারই আদেশে। স্করপিয়ন এবং এর নাবিকদের এই করুণ পরিণতি ঘটল আমারই কারণে। বুঝতে পারছি, মানসিক স্থিরতা হারিয়েছি। তবু যতটা সম্ভব পরিষ্কার ভাবে জানাচ্ছি সব।'

অ্যাডমিরাল ভাবছেন: সত্যিই, মানসিক স্থিরতা হারিয়েছে কমান্ডার ম্যাসন। নইলে কম্পিউটার-মাইন্ড বলে যার সুখ্যাতি আছে, সেই লোক এমন অবিবেচকের মত কাজ করে বসত না।

‘২০৪০ আওয়ার, ১৪ জুন, ফগব্যাংকে প্রবেশ করলাম আমরা। এগিয়ে চলেছি। খানিক পরেই আমাদের নিচে পানির গভীরতা তিরিশ ফ্যাদমে এসে গেল। আচমকা জাহাজের সামনের দিকে বিস্ফোরণ ঘটল। প্রচণ্ড গর্জনে পানি ঢুকতে শুরু করল ফরোয়ার্ড টর্পেডো কম্পার্টমেন্টের ভেতরে। দেখতে দেখতে পানিতে ভরে গেল ঘরটা।’

ম্যাসন বোধহয় জানে না, সাবমেরিনের ভেতরে বিস্ফোরণ ঘটেছে, না কি বাইরে!—ভাবলেন অ্যাডমিরাল।

‘প্রথম কয়েক সেকেন্ডেই ছাব্বিশ জন নাবিক মারা গেল, এদেরকে সৌভাগ্যবানই বলতে হবে। আর ব্রিজের ওপরের তিনজন নিশ্চয় আরও আগেই মারা গেছে। এরা: লেফটেন্যান্ট রবিন, সীম্যান হ্যারিস এবং উইলো। স্করপিয়ন সাগরের তলায় শুয়ে পড়ার আগেই নিশ্চয় শেষ হয়ে গেছে ওরা।’

ম্যাসনের কথা অনুযায়ী বিস্ফোরণের সময় পানির ওপরে ভাসছিল স্করপিয়ন, অনুমান করলেন অ্যাডমিরাল। কিন্তু বিস্ফোরণ ঘটার পর সাবমেরিনের সেইল ডুবতে কম করে হলেও তিরিশ সেকেন্ড লেগেছে। এই সময়ে তিনজন অভিজ্ঞ নাবিক নিচে নেমে যেতে পারল না! নাকি হ্যাচ বন্ধ করে রেখেছিল ম্যাসন? ক্যাপ্টেন যা লিখেছে, তাতে মনে হয় বিস্ফোরণের পর সামান্যতম সময় পায়নি সে ব্রিজের তিনজনকে বাঁচানোর। কেমন যেন অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য! একটা সাবমেরিন পাথরের মত টুপ করে ডুবে গেল!

‘সমস্ত ভেন্ট এবং হ্যাচ বন্ধ করে দেয়া হলো, দ্রুত ব্যালাস্ট ট্যাংকগুলো খালি করার আদেশ দিলাম। আমার আদেশ মতই কাজ হলো, কিন্তু বড় দেরি হয়ে গেছে তখন। জাহাজের সামনের দিক থেকে ধাতু ছেঁড়ার প্রচণ্ড কর্কশ ভোঁতা গোঙানি শোনা গেল। নাক দিয়ে সাগরের তলার বালিতে লাঙল চালাচ্ছে তখন স্করপিয়ন।’

তাজ্জব ব্যাপার! সাবমেরিনের সমস্ত ব্যালাস্ট ট্যাংক খালি করে ফেলা হয়েছে, ভয়ঙ্কর গতিতে পানিতে ভেসে ওঠার কথা ওটার। সামনের দিক দিয়ে পানি ঢুকে ভারী হয়ে গেলে অবশ্য নাক নিচু হয়ে যাবে—বুঝলাম, ভাবলেন অ্যাডমিরাল। নাক দিয়ে সাগরের তলার মাটি চষেছে স্করপিয়ন, তা-ও বুঝলাম, কিন্তু ওটা তো তিনশো বিশ ফুট লম্বা। একশো আশি ফুট পানিতে নাক ডুবে গেলেও সেইল সহ সাবমেরিনের পেছনটা ভেসে থাকতে বাধ্য। তাহলে?

‘সাগরের তলায় শুয়ে আছে এখন সাবমেরিন। একপাশে সামান্য কাত হয়ে আছে। টর্পেডো রূমের দরজা বন্ধ করে অন্যান্য ঘরগুলো থেকে একেবারে আলাদা করে ফেলা হয়েছে। তাই অন্য কোন ঘরে একবিন্দু পানিও ঢুকতে পারেনি। নিজেদেরকে মৃত ধরে নিয়েছি আমরা। চেষ্টা করে কোন লাভ হবে না, সবাইকে বিরত করেছি, আমাদের খেল খতম। আমার নির্বুদ্ধিতার জন্যেই মরতে হলো এতগুলো লোককে।’

এ তো দারুণ রহস্য! আফটার এসকেপ হ্যাচ থেকে মাথার ওপর পানি মাত্র একশো পঁয়তিরিশ ফুট। পৃথিবীর আধুনিকতম সাবমেরিন। সেলফ-কনটেইনড ব্রীদিং অ্যাপারেটাস রয়েছে। ওই জিনিসের সাহায্যে মাত্র একশো পঁয়তিরিশ ফুট

পানি ভেদ করে ওপরে উঠতে পারল না নিউক্লিয়ার সাবমেরিনের ট্রেনিং পাওয়া দক্ষ নাবিকেরা! এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ে গেল অ্যাডমিরালের। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় দুর্ঘটনা ঘটে 'টাঙ' নামে একটা সাবমেরিনে। ডুবে যায় সাবমেরিনটা। ওখানে পানির গভীরতা ছিল একশো আশি ফুট। তখনকার দিনে আজকের মত এত আধুনিক যন্ত্রপাতি ছিল না। শুধু ফুসফুসের ওপর নির্ভর করেই সাবমেরিনের আটজন নাবিক পানির ওপরে ভেসে উঠতে পেরেছিল। বেঁচে গিয়েছিল আটজনই। ম্যাসন কি সত্যিই পাগল হয়ে গিয়েছিল? কোন কারণে সাংঘাতিক রকম আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল? যার জন্যে ঠিকমত চিন্তা করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিল সে?

'খাবার নেই। কয়েক ঘণ্টা শ্বাস নেবার মত বাতাস অবশিষ্ট আছে আর। খাবার পানি শেষ হয়ে গেছে তিন দিন পরেই।'

অসম্ভব, একেবারে অসম্ভব! নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকটার কাজ করছিল না, এমন কথা বলেনি ম্যাসন। প্রয়োজনের চাইতে অনেক বেশি পানি বিশুদ্ধিকরণের ব্যবস্থা রয়েছে স্করপিয়নে। আর বাতাস? ধরা যাক এয়ার পিউরিফাইং সিসটেম কাজ করছে না কোন রহস্যজনক কারণে। সেক্ষেত্রেও কিছু সাবধানতা অবলম্বন করলেই কার্বন ডাই অক্সাইড জমে যাওয়া কমানো যায়। তাছাড়া অক্সিজেন সরবরাহ করার আরও ব্যবস্থা রয়েছে সাবমেরিনে। হ্যাঁ, খাদ্য সমস্যা ঘটতে পারে। স্করপিয়ন যখন ডুবেছে, সঙ্গে নেয়া খাবারের এক তৃতীয়াংশ মাত্র অবশিষ্ট থাকার কথা। তাহলেও বেশির ভাগ নাবিকই মৃত। ওই খাবারে অবশিষ্ট কয়েকজন লোকের নব্বই দিনের বেশি চলার কথা। কিন্তু মাত্র পাঁচ দিনও চলল না খাবারে? আসলে এসব কোন সমস্যাই নয়। সমস্যা হলো রিঅ্যাকটর যদি বন্ধ হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে ওই সাবমেরিনে বাঁচতে পারবে না মানুষ। কিন্তু রিঅ্যাকটরের তো কোন উল্লেখই করেনি ম্যাসন!

'কি করা উচিত পরিষ্কার বুঝতে পারছি। আশ্চর্য এক প্রশান্তি অনুভব করছি এখন মনে। জাহাজের ডাক্তারকে ইঞ্জেকশন দেয়ার নির্দেশ দিয়ে দিয়েছি। এতে অহেতুক যন্ত্রণা থেকে চিরকালের জন্যে মুক্তি পাবে মানুষগুলো। সবার শেষে ইঞ্জেকশন নেব আমি, ভাবছি।'

মাই গড! চমকে উঠলেন অ্যাডমিরাল। নিজেকে সুস্থ স্বাভাবিক বলে দাবি করছে ম্যাসন, অথচ আবার বলছে পাইকারী মানুষ খুনের আদেশ দিয়েছে।

হাতের লেখা অস্পষ্ট হয়ে গেছে এরপর, অনেক বেশি কাটাকুটি। পড়তে অসুবিধে হয়।

'আবার ফিরে এসেছে ওরা। বাইরে খোলের গায়ে টোকা দিচ্ছে রবিন। মাদার অভ ক্রাইস্ট! ওরা তো মরেই গেছে, ভূতগুলো এসে জ্বালাচ্ছে কেন আমাদের!'

নাহ্, সুস্থ এবং স্বাভাবিক ছিল না ম্যাসন। বন্ধ সাবমেরিনে ভয়ঙ্কর অবস্থায় সময় কাটাতে কাটাতে বদ্ধ পাগল হয়ে গিয়েছিল শেষের দিকে। কিন্তু মাত্র পাঁচদিনেই?

'আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা ঠেকাতে পারব ওদের। ভাঙতে শুরু করেছে। আফটার এসকেপ কম্পার্টমেন্ট হ্যাচ ভেঙে ঢুকে পড়বে ভেতরে...। ওরা আসলে খুন করতে চাইছে আমাদের। কিন্তু পারবে না, তার আগেই আমরা হারিয়ে দেব ওদের। এত কষ্ট করে ভেতরে ঢুকে দেখবে সবাই মরে পড়ে আছি।'

'ওদের'! 'ওরা'!—কাদের কথা বলছে ম্যাসন? অন্য কোন দেশ?—রাশান স্পাই-ট্রলারের লোকেরা উদ্ধার করার চেষ্টা করেনি তো!

'বাইরে নিশ্চয় অন্ধকার হয়ে গেছে, কাজ বন্ধ হয়ে গেছে ওদের। কমিউনিকেশন ক্যাপসুলে করে এই মেসেজ পাঠাচ্ছি। লগবুকে এরপরে আর কিছু লিখিনি। আশা করছি, অন্ধকারে ক্যাপসুলটা দেখতে পাবে না ওরা। আমাদের বর্তমান পজিশন ৩২° ৪৩´ ১৫´´ নর্থ—১৬১° ১৮´ ২২´´ ওয়েস্ট।'

স্করপিয়ন শেষ যেখানে ছিল রিপোর্ট পাওয়া গেছে, ম্যাসনের মেসেজে লেখা জায়গাটা তার চাইতে পাঁচশো মাইল দূরে। যদি পুরো গতিতেও চলে সাবমেরিনটা, তাহলেও পাঁচশো মাইল যেতে চার ঘণ্টা লেগে যাবে। স্করপিয়নের রেডিও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময় আর ক্যাপ্টেন ম্যাসনের মেসেজে উল্লিখিত সময়ের ফারাক চার ঘণ্টার চেয়ে কম। ঠিক মিলছে না কোন কিছুই। পুরো ব্যাপারটাই কেমন যেন গভীর রহস্যপূর্ণ।

মেসেজ শেষ করে নোট লিখেছে ম্যাসন। নিশ্চয়ই পুরো অপ্রকৃতিস্থ ছিল তখন সে, ভাবলেন অ্যাডমিরাল।

'আমাদের খোঁজার চেষ্টা করবেন না, কোন লাভ হবে না। আমাদের খুঁজে পাওয়ার মত কোন চিহ্নই রাখবে না ওরা। কি অদ্ভুত প্রক্রিয়া! যদি আগে ঘুণাক্ষরেও ব্যাপারটা টের পেতাম, হয়তো বেঁচে যেতে পারতাম। যে-ই পাবেন এই মেসেজ, দয়া করে পার্ল হারবারে অ্যাডমিরাল জেমস ম্যাকডেভিডের হাতে পৌঁছে দেবেন।'

কিন্তু আমি কেন!—বুঝতে পারছেন না অ্যাডমিরাল। যদ্দূর মনে পড়ে, কমান্ডার পিটার ম্যাসনের সঙ্গে কখনও দেখাই হয়নি আমার। এত লোক থাকতে স্করপিয়নের শেষ পরিণতি জানানোর জন্যে আমাকেই বেছে নিল কেন ম্যাসন?

চার

রয়্যাল হাওয়াইয়ান হোটেল। বারের ওপর কনুই রেখে ঝুঁকে দাঁড়িয়েছে রানা। ভরা গ্লাসের দিকে তাকিয়ে রয়েছে, কিন্তু রঙিন পানীয়ের প্রতি মন নেই। ভাবছে সে। দুপুরে সাগর সৈকতে সিলিন্ডারটা খুঁজে পাওয়া থেকে পরের প্রতিটি ঘটনা ছবির মত খেলে যাচ্ছে ওর মনের পর্দায়।

অ্যাডমিরাল ম্যাকডেভিডের চেহারাটা কল্পনার চোখে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রানা। ক্যাপসুলের ভেতরে পাওয়া স্করপিয়নের লগবুকের ছেঁড়া পাতায় লেখাগুলো পড়ছেন। মনে যত যা-ই ভাবুন, তার সামান্যতম বহিঃপ্রকাশ নেই হাবেভাবে,

চেহারায়।

আসলে কি ঘটেছে ডুবোজাহাজ স্করপিয়নের ভাগ্যে? ক্যাপ্টেন পিটার ম্যাসন আর নাবিকদের ভাগ্যে? কোন অপার্থিব যোগাযোগ হয়েছে ওটার একই এলাকায় হারিয়ে যাওয়া অন্যান্য জাহাজের সঙ্গে? সত্যিই কি প্রশান্ত মহাসাগরের ওই অঞ্চলটা 'আরেক বারমুডা ট্রায়াঙ্গল'?

পড়া শেষ হলে ধীরে ধীরে মুখ তুলে রানার দিকে তাকিয়েছেন অ্যাডমিরাল ম্যাকডেভিড। অর্থপূর্ণভাবে মাথা ঝাঁকিয়েছেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে নীরবে মাথা ঝাঁকিয়েছে রানাও। উঠে পড়েছে। টেবিল ঘুরে গিয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে অ্যাডমিরালের দিকে। পুরু চামড়ায় ঢাকা হাড্ডিসার একটা হাত বাড়িয়ে রানার হাত চেপে ধরেছেন ম্যাকডেভিড, জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন। একে একে ঘরের অন্য তিনজনও উঠে এসে হাত মিলিয়েছে রানার সঙ্গে। কেউ কোন কথা বলেনি, রানাও না। যেন সম্মোহিতের মত এরপর অ্যাডমিরালের অফিস থেকে বেরিয়ে এসেছে রানা। বিকেলে যানবাহনের ভিড় থাকে নিমিজ হাইওয়েতে। ওই ভিড়ের ভেতর দিয়ে কিভাবে হোটেলে এসে পৌঁছেছে সে, ঠিক মনে করতে পারছে না। মনে নেই, কখন কি করে নিজের ঘরে এসে ঢুকেছে, গোসল সেরেছে, কাপড় পরেছে, আবার বেরিয়ে পড়েছে। প্রতিপক্ষ কে, জানে না সে। প্রতিপক্ষ যদি সত্যিই প্রকৃতি হয়, তাহলে কিছুই করার নেই তার। প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলবে না।

আঙুল দিয়ে গেলাসটা চেপে ধরে ধীরে ধীরে নাড়াচাড়া করছে রানা। পেছনে, আশেপাশে আরও লোকজন রয়েছে, কথাবার্তা বলছে ওরা, কিছুই কানে ঢুকছে না তার। অদ্ভুত কিছু একটা রয়েছে স্করপিয়নের লগবুকের লেখাগুলোতে, সেটা কি, ভেবে বের করার চেষ্টা চালাচ্ছে। মস্তিষ্কের গভীর কোষে কি একটা যেন লুকোচুরি খেলছে, ধরা দিয়েও দিচ্ছে না। আসছে, কিন্তু ধরতে গেলেই সরে যাচ্ছে আবার।

চোখের কোণে এই সময়ই ধরা পড়ল মানুষটা। রানার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। চোখ তুলে চাইল রানা। নিমেষে চিন্তার জগৎ থেকে বাস্তবে চলে এল। ক্যাপ্টেন হেই ম্যাকেঞ্জী। হাতে গেলাস।

রানার মতই স্ল্যাকস এবং রঙচঙে অ্যালোয়া শার্ট পরেছে ম্যাকেঞ্জী। এই দ্বীপে এই সময়ে এ ধরনের পোশাক অনেকেই পরে।

রানার পাশে এসে একই ভঙ্গিতে বারে হেলান দিয়ে দাঁড়াল ম্যাকেঞ্জী। বাঁ হাতে গেলাস, ডান হাতে রুমাল। দরদর করে ঘামছে আর বার বার রুমাল দিয়ে ঘাড়-মুখ মুছছে।

মুখে কিছুই বলল না, ম্যাকেঞ্জীর দিকে তাকিয়ে ভুরু জোড়া একটু তুলল-নামাল রানা। 'ব্যাপার কি?' বলতে চাইল যেন চোখের ভাষায়।

'এমনি, চলে এলাম,' হাসল ম্যাকেঞ্জী।

'ও,' বলে নিজের গেলাসটা তুলে নিল রানা। অ্যাডমিরালের অফিসে তাড়াহুড়ো আর উত্তেজনায় অনেক কিছুই মিস করেছে সে। এখন ভাল করে দেখল ম্যাকেঞ্জীকে। অবাক হলো। তার চেয়ে ওজন একটু বেশি হবে ম্যাকেঞ্জীর, পনেরো পাউন্ডের মত। বয়েসও বেশি। চামড়ার রঙ আরেকটু পরিষ্কার। এছাড়া

তার সঙ্গে ক্যাপ্টেনের অনেক মিল রয়েছে। বড় ভাই বলে অনায়াসে চালিয়ে দেয়া যায়। উচ্চতা, চুলের রঙ, শরীরের গঠন একই রকম।

নার্ভাস ভঙ্গিতে রানার চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিল ম্যাকেঞ্জী, নিজের গেলাসের দিকে তাকাল। আস্তে করে নাড়া দিল গেলাসটা। রামে ভাসমান বরফের টুকরোগুলো কাঁচের সঙ্গে বাড়ি লেগে মিহি টুংটাং শব্দ উঠল। সেদিকে তাকিয়ে থেকেই বলল ক্যাপ্টেন, 'দুপুরের ব্যবহারের জন্যে মাপ চাইছি আমি, মেজর।'

'আরে দূর!' তাড়াতাড়ি বলে উঠল রানা, 'এতে মাপ চাইবার কি হলো? আমিই কি যথেষ্ট ভদ্র ব্যবহার করেছি নাকি?'

'একটা বিচ্ছিরি কাণ্ড···ওই স্করপিয়নের কথা বলছি,' গেলাসে চুমুক দিল ম্যাকেঞ্জী। 'রহস্যজনক নিখোঁজ!'

'একই রকম রহস্যজনক ভাবে নিখোঁজ হয়েছে আরও অনেক জাহাজ, সাবমেরিন। থ্রেশার, ব্লু-ফিন—এগুলোকেও খুঁজে পাওয়া যায়নি এখনও।'

'কিন্তু স্করপিয়নের ব্যাপারটা আলাদা,' চিন্তিত দেখাচ্ছে ম্যাকেঞ্জীকে। 'এটাকে খুঁজবে হয়তো নেভি, কিন্তু কোন লাভ হবে না।'

'আমি বিশ্বাস করি না।'

'অন্য যে-দুটো সাবমেরিনের কথা বললেন আপনি, মেজর, ওগুলো আটলান্টিকে হারিয়েছে। কিন্তু স্করপিয়নের কপাল অনেক বেশি খারাপ, কারণ এটা হারিয়েছে প্যাসিফিকে।' ঘাড়ের ঘাম মুছল আবার ম্যাকেঞ্জী। 'একটা কিংবদন্তী রয়েছে নাবিকদের মাঝে। আটলান্টিকে যারা হারিয়ে যায়, তাদের কথা গল্প-গাথায় লেখা হয়। কিন্তু প্যাসিফিকে যারা হারিয়ে যায়, সবাই ভুলে যায় তাদের। সুন্দর একটা কবিতা আছে:

> 'দৌজ হু লাই ডীপ ইন দ্য আটলান্টিক সী আর রিকলড্
> বাই শ্রাইনস, রীথস্ অ্যান্ড পোয়েট্রি, বাট দৌজ হু লাই ইন
> দ্য প্যাসিফিক সী, লাই ফরগটেন ফর অল ইটারনিটি।'

চমৎকার গলা ম্যাকেঞ্জীর। সামনে দাঁড়ানো ঘামতে থাকা লোকটাকে পাদ্রীর পোশাকে কল্পনা করে ফেলল রানা। মঞ্চে দাঁড়িয়ে নিউ ইংল্যান্ডের জেলেদের উদ্দেশে যেন স্তোত্র পড়ছে পাদ্রী। আসছে জোয়ারেই সাগরে নাও ভাসাবে জেলেরা, আশীর্বাদ নিচ্ছে গুরুর।

'কিন্তু মেসেজে পজিশন জানিয়েছে ক্যাপ্টেন ম্যাসন,' বলল রানা। 'ওই এলাকায় তল্লাশী চালালে, আমার তো মনে হয় এক সপ্তাহের মধ্যেই স্করপিয়নকে খুঁজে পাবে নেভির সোনার ইকুইপমেন্ট।'

'সহজে নিজের গোপন কথা ফাঁস করে না সমুদ্র, মেজর,' খালি গেলাসটা বারের ওপর নামিয়ে রাখল ম্যাকেঞ্জী। 'তা, আমাকে এখন যেতে হচ্ছে। একজনের আসার কথা ছিল, কিন্তু ফাঁকিই দিল বোধহয়।'

ম্যাকেঞ্জীর বাড়িয়ে দেয়া হাতটা ধরল রানা। হাসল, 'আমিও ভুক্তভোগী। কেউ কথা দিয়ে না এলে বড় খারাপ লাগে।'

'গুড বাই, অ্যান্ড গুড লাক।'

'সেইম টু ইউ, ক্যাপ্টেন।'

ঘুরে দাঁড়াল ম্যাকেঞ্জী। লোকজনের পাশ কাটিয়ে লবির দরজার দিকে এগিয়ে গেল। হারিয়ে গেল ভিড়ে।

গেলাসে এখনও চুমুক দেয়নি রানা। ম্যাকেঞ্জী চলে যাবার পর এত লোকজনের ভিড়েও কেমন যেন একা একা লাগল নিজেকে। হঠাৎই প্রচুর মদ খেয়ে মাতাল হওয়ার ইচ্ছেয় পেয়ে বসল তাকে। ভুলে যেতে চায় স্করপিয়ন, এমনকি এস. এস. তুরাগের নামও। অদ্ভুত এক উত্তেজনা অনুভব করছে নিজের মাঝে। গেলাসটা তুলে নিয়ে গলায় ঢালল, ঢক ঢক করে খেয়ে শেষ করে ফেলে গেলাসটা টেবিলে রেখে বারম্যানের দিকে ঠেলে দিল। অর্ডার দিল আরেক গেলাসের।

চোখে সবে রঙ ধরতে শুরু করেছে, এমনি সময় পিঠে নরম বুকের ছোঁয়া লাগল। কোমর জড়িয়ে ধরেছে ফর্সা দুটো হাত। আস্তে করে ঘাড় ঘোরাল রানা। চোখ পড়ল কোরিন ম্যাকডেভিডের দুষ্টু চোখে। মিটিমিটি হাসছে মেয়েটা।

'হেল্লো, রানা,' হাসি হাসি গলায় বলল কোরিন। 'সঙ্গিনী চাই?'

'আরে, কোরিন যে…চাই, তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু আগে বুঝে দেখতে হবে, কতটুকু আদায় করতে পারব।'

রানার কোমরে হাতের চাপ বাড়ল। 'তোমাকে আমার বাড়িতে নিয়ে যাব। অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করব দু'জনে। চলবে তাতে?'

'বেশি রাত করতে পারব না। দেরি করে বাড়ি ফিরলে মা বকবে।'

'পুরানো বান্ধবীর সঙ্গ প্রত্যাখ্যান কোরো না, ডার্লিং। তার সঙ্গে এমন ব্যবহার কোরো না।'

'কেমন ব্যবহার করব?' কৃত্রিম গাম্ভীর্য রানার গলায়। ধীরে ধীরে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে কোরিনের একটা হাত। ধরে ঝটকা মেরে হাতটা সরিয়ে দিল রানা। 'এ কী! খুব বেহায়া হয়ে উঠেছ দেখছি! পয়সা দিলেই রাজি হয়ে যাবে মনে হচ্ছে?'

'মন্দ বলোনি কিন্তু,' হাসিটা মুহূর্তের জন্যেও মিলাচ্ছে না কোরিনের মুখ থেকে। 'টাকা-পয়সা অনেক কাজে লাগে। তা কত দিতে পারবে, শুনি?'

'তা পারব। পুরানো এক জোড়া মোজা কেনার পয়সা নিশ্চয়ই হবে আমার পকেটে।'

রানার পিঠে বুকের চাপ বাড়াল কোরিন। ঠোঁট ফোলাল। 'কোথায় ছিলে এতদিন, লাভার?'

শরীরের ওপর অতিরিক্ত অত্যাচার করে কোরিন, তবু এখনও বেশ সুন্দর রয়েছে ও, ভাবল রানা। তবে আগের বার যখন কোরিনের সান্নিধ্যে এসেছিল সে, আরও অনেক বেশি সুন্দরী ছিল মেয়েটা। মনে পড়ছে, বিছানায় কেমন ছটফট করেছিল কোরিন।

'এই মধুর আলাপে অন্য প্রসঙ্গ তুলতে ভাল লাগছে না,' বলল রানা। 'কিন্তু তবু বলছি, আজই প্রথম তোমার বাপের সঙ্গে পরিচিত হলাম।'

মনে করেছিল অবাক হবে, কিন্তু কোরিনের চোখে সামান্যতম পরিবর্তন দেখল

না রানা।

'তাই, না?' সহজ স্বাভাবিক গলা কোরিনের। 'তা বুড়ো খোকা কি বলল?'

'তেমন কিছু না। তবে হাবেভাবে বুঝিয়েছেন, আমার পোশাকআশাক পছন্দ হয়নি তাঁর।'

'আমার পোশাকও তার পছন্দ হয় না।'

ছোট্ট এক চুমুক স্কচ খেলো রানা। গেলাসটা ঠোঁটের কাছে রেখেই বলল, 'তোমার পোশাক পছন্দ করেন না বলে অবশ্য তাঁকে দোষ দেয়া যায় না। নেংটি পরে ঘুরে বেড়াক মেয়ে, কোন্ বাপই চায় সেটা?'

রানার মন্তব্যে কানই দিল না কোরিন। প্রেমিকদের একজনের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে আজ তার বাপ, তাতেও তার কিছু যায় আসে না। রানার কোমর ছেড়ে দিয়ে বারের গা ঘেঁষে রাখা একটা টুলে উঠে বসল। জ্বলন্ত কামনা মদির চোখে তাকাল রানার দিকে। সারা কাঁধে ছড়িয়ে পড়া কালো চুলের রাশি আরও আকর্ষণীয়া করে তুলেছে তাকে। ককটেল লাউঞ্জের ম্লান আলোয় পালিশ করা ব্রোঞ্জের মত দেখাচ্ছে চামড়ার রঙ। স্বর নামিয়ে বলল, 'তারপর? বকর বকরই করবে শুধু?'

বারম্যানের দিকে তাকাল রানা। 'এই যে···এই মহিলার জন্যে ব্র্যান্ডি···'

ভুরু কোঁচকাল কোরিন। হাসল, 'বড্ড সেকেলে ভাষায় কথা বলছ, হে। মহিলা, অ্যাঁ?'

'মহিলা, তার আবার নতুন-পুরানো কি? বাবা আদমের সময় মা হাওয়ার দৈহিক গঠন যা ছিল, আজও তোমাদের তা-ই আছে।'

'ঠিকই বলেছ। তবে ব্যবহারের ধরন-ধারণ পাল্টেছে, এই যা।'

'যাকগে ওসব কথা,' প্রসঙ্গ পাল্টাল রানা। 'তোমার বাবার কথা বলো।' কোরিনের পাশেই একটা টুলে উঠে বসল।

'বাবার কথা আর কি বলব। সারা জীবন মাকে জ্বালিয়ে মেরেছে। আমার আর মায়ের কাছে বাবা ডুমুরের ফুল। মায়ের সঙ্গে বিয়ের পর বাড়িতে ক'ঘণ্টা কাটিয়েছে হাতে গোণা যায়। সারাক্ষণই এক চিন্তা, কোথায় পুরানো কোন্ হতচ্ছাড়া বার্জ রয়েছে পানির তলায়, কিংবা কোথায় ভেঙে পড়ে আছে কোন্ দাদার আমলের জাহাজ। পরিবারের চাইতে সাগরকে অনেক বেশি ভালবাসে বাবা। যে রাতে আমি জন্মেছিলাম, প্যাসিফিকের মাঝখানে ডুবন্ত এক অয়েল ট্যাংকারের ক্রুদের উদ্ধার করতে ব্যস্ত তখন সে। আমি যখন গ্র্যাজুয়েশন করলাম, বাবা তখন সাগরে হারিয়ে যাওয়া একটা প্লেনের তল্লাশী চালাচ্ছে। এমন কি মা যখন মারা গেল, তখনও বাড়িতে ছিল না লোকটা। ঈটন স্কুল অভ ওশেনোগ্রাফির এক লম্বাচুলো বিজ্ঞানীর সঙ্গে গ্রীনল্যান্ডে আইসবার্গের চার্ট তৈরি করতে গিয়েছে তখন তোমাদের মহামান্য অ্যাডমিরাল।' রানার দিকে চোখ ফেরাল কোরিন৲ বোঝানোর চেষ্টা করল, তার জখমের ওপর ঘা দিয়েছে রানা। 'ওর সঙ্গে সত্যিকারের বাপ-মেয়ের সম্পর্ক নেই আমার। কোনমতে একে অপরকে সহ্য করি আর কি। নিছক সামাজিকতা।'

কোরিনের দিকে তাকিয়ে বলল রানা, 'বড় হয়েছ, সহ্য না হলে এখন বাড়ি থেকে চলে গেলেই তো পারো।'

ড্রিংক নিয়ে এসেছে বারম্যান। তুলে নিয়ে গেলাসে চুমুক দিল কোরিন। 'কিছু আকর্ষণকে অবহেলা করতে পারি না। সারাক্ষণই এখন আমার চারপাশে হ্যান্ডসাম ইউনিফর্মদের আনাগোনা। ভেবে দেখো, হাজার হাজার পুরুষ, অথচ আমার সঙ্গে কোন মেয়ের কম্পিটিশন নেই। কেন বাড়ি ছাড়ব? ডাস্টবিনের উচ্ছিষ্ট কুড়োনোর জন্যে? বুড়ো অ্যাডমিরাল চাইছে, তার বাড়িতে রক্তের সম্পর্কের কেউ থাকুক। আর আমি চাইছি, একজন অ্যাডমিরালের কন্যা হওয়ার সমস্ত সুযোগ-সুবিধা।' আচমকা চোখ তুলে রানার দিকে তাকাল কোরিন। বেহায়া মেয়েটার চোখ মুখও লাল হয়ে উঠেছে। 'তাহলে আমার ফ্ল্যাটেই? কি বলো?'

'আজ রাতে আর হচ্ছে না, মিস ম্যাকডেভিড,' পেছন থেকে বলে উঠল কেউ। 'ক্যাপ্টেন আজ আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

একই সঙ্গে ফিরে চাইল রানা এবং কোরিন। অপূর্ব সুন্দরী এক মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ধূসর বিশাল দুই চোখ। ঘাড় পর্যন্ত লম্বা লাল কোঁকড়ানো ঘন চুল। নিখুঁত ছাঁটের সবুজ হাওয়াই পোশাক। খাপে খাপে বসে গেছে শরীরের সঙ্গে। একটু জোরে শ্বাস নিলেই যেন ফেটে বেরিয়ে আসবে উদ্দাম যৌবন।

দ্রুত স্মৃতির অ্যালবাম খুঁজল রানা। কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না মেয়েটাকে। এর আগে কোনদিন দেখেনি, বুঝতে পারছে। নিজের অজান্তেই টুল ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। হার্টবিট বেড়ে গেছে। কামনা নয়, কেমন এক অদ্ভুত কোমল অনুভূতি ছাপ ফেলল রানার মনের ভেতর।

থমথমে নীরবতায় ছুরি চালাল কোরিন। 'গায়ে-পড়ে লাগতে এসেছ, সুন্দরী। ওকে আমি আগে দেখেছি।' চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে, মেয়েটাকে খেলাতে বেশ মজা পাচ্ছে সে। খেলা খেলা ভাব, কিন্তু দরকার পড়লে সিরিয়াস হয়ে উঠবে কোরিন। ঘুরে নিজের গেলাসে মন দিল সে।

বিশাল দুই চোখে ধূসর আগুন। 'আপনার নামে অনেক কুকথা কানে এসেছে, মিস ম্যাকডেভিড। মনে হচ্ছে ঠিকই শুনেছি।'

রাগারাগির ধার দিয়েও গেল না কোরিন। চুপচাপ বসে আছে মেয়েটার দিকে পিছন ফিরে। বারের ও পাশের আয়নায় দেখছে মেয়েটার প্রতিবিম্ব। 'মাত্র পঞ্চাশ ডলার?' জোরে চেঁচিয়ে বলল কোরিন। আশেপাশের তিরিশ ফুটের ভেতরে বসা সবাই শুনতে পেল তার কথা। 'কিন্তু যা ফিগার, আরও তো বেশি পেতে পারতে।'

বারের কাছেপিঠে বসে ছিল যারা, চোখ তুলে তাকাল সবাই। মুখ বাঁকাল মেয়েরা। পুরুষেরা হাসছে। দুই প্রেমিকার মাঝে মুখ-কাঁচুমাচু লোকটার অবস্থা দেখে মজা পাচ্ছে ওরা। এমন পরিস্থিতিতে জীবনে পড়েনি রানা। কি করবে, বুঝে উঠতে পারছে না।

'আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে, মিস ম্যাকডেভিড,' বলল ধূসর সুন্দরী। 'গোপনে বলতে চাই।'

'অবশ্যই,' মাথা ঝাঁকিয়ে বলল কোরিন। ঘুরে বসে নিঃশব্দে নেমে এল টুল থেকে।

পেছনের খোলা দরজা দিয়ে হোটেলের প্রাইভেট বীচে বেরিয়ে গেল মেয়েটা। তাকে অনুসরণ করল কোরিন। ভুরু কুঁচকে খোলা দরজাটার দিকে তাকিয়ে রইল রানা। শ্রাগ করল। অনিশ্চয়তার ভঙ্গিতে ঠোঁট উল্টিয়ে আগের টুলে উঠে বসল। বারের দিকে পেছন করে বসে নিজের ডান থেকে বাঁয়ে আধ পাক ঘুরিয়ে আনল দৃষ্টি। ঘরের প্রতিটি লোকের চোখ তার ওপর। হাসছে ওরা। বাউ করার ভঙ্গিতে দু'হাত দু'পাশে ছড়িয়ে দর্শকদের দিকে মাথা নোয়াল রানা, তারপর হেসে পিছন ফিরল।

একদিনের তুলনায় অনেক বেশি চমক! কোথায় এর শেষ?—ভাবছে রানা। শেষ দেখবে, জোর করে রাজি করাল মনকে। ঘুরে বারম্যানের দিকে চেয়ে আবার হুইস্কির অর্ডার দিল, ডাবল।

মিনিট দশেক পর ফিরে এসে রানার পেছনে দাঁড়াল ধূসর সুন্দরী। এতই নিঃশব্দে যে প্রথমে টেরই পায়নি রানা। গেলাসে চুমুক দিতে গিয়ে ওপাশের আয়নায় দেখতে পেল মেয়েটাকে।

আয়নার ভেতরেই রানার চোখে চোখ রাখল মেয়েটা। ঠোঁটে মৃদু হাসি। 'জয় করেছি। আমার দখল নিতে পারি এবার?' দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বলল মেয়েটা।

ডান চোখের নিচে ছড়ে গেছে গাল—নীল হয়ে উঠছে জায়গাটা। নিচের কাটা ঠোঁট থেকে দু'ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে পড়েছে বুকের ঠিক মাঝখানে। রানা ভাবল, বিশ্ব-সুন্দরী নয় মেয়েটা, কিন্তু আশ্চর্য এক বন্য আকর্ষণ রয়েছে এর মধ্যে। নেশা ধরে যেতে চায় রক্তে।

'পরাজিতা বাঘিনী গেল কোথায়?' একই ভাবে বসে আয়নার দিকে চেয়ে জানতে চাইল রানা।

'বাড়ি। কয়েকদিন মুখে পুরু মেকাপ ব্যবহার করতে হবে ওর। তবে সেরে উঠবে শিগগিরি, সৌন্দর্যহানি হবে না।'

পকেট থেকে রুমাল বের করল রানা। গেলাস থেকে বরফের দুটো টুকরো তুলে নিয়ে রুমালে পেঁচাল। তারপর ঘুরে হাত বাড়িয়ে মেয়েটার কাটা ঠোঁটের ওপর চেপে ধরল সেটা। 'ধরো। চেপে ধরে রাখো। ব্যথা, ফোলা দুই-ই কমবে।'

রুমালটা নিল মেয়েটা, হাসল। মাথা ঝোঁকাল। বরফের টুকরো ঠোঁট থেকে না সরিয়েই বলল, 'ধন্যবাদ।'

দর্শকদের মাঝে হালকা শোর উঠেছে আবার। আর থাকা যায় না। তাড়াতাড়ি মদের পয়সা মিটিয়ে দিল রানা। টুল থেকে নেমে হাত চেপে ধরে প্রায় টেনে হিঁচড়েই বের করে নিয়ে এল মেয়েটাকে। সিঁড়ি দিয়ে নামলেই হোটেলের প্রাইভেট বীচ। সৈকতে যতদূর চোখ যায়, কোরিনকে খুঁজল রানা। কিন্তু কোন চিহ্ন নেই ওর।

'সত্যিই বাড়ি চলে গেছে দেখছি।' মন্তব্য করল রানা। 'কি হয়েছিল?'

ঠোঁটের ওপর থেকে বরফ সরিয়ে আনল মেয়েটা। 'জানতেই হবে?' ঠোঁটের

দুই কোণ থেকে দুই গালে সংক্রামিত হলো হাসিটা, কিন্তু চোখ স্পর্শ করল না। 'কোন কথাই শুনতে রাজি হলো না মিস ম্যাকডেভিড। ব্যাপারটা হাতাহাতি পর্যন্ত গড়াল শেষপর্যন্ত।'

অবাক চোখে মেয়েটির দিকে তাকাল রানা। অদ্ভুত এক অনিশ্চয়তায় ভুগছে। চিন্তার ঝড় চলেছে মাথার মধ্যে: কে মেয়েটা? ব্যাপারটা কি? আমাকে বেছে নিল কেন? হঠাৎ প্রেমে পড়ে গিয়ে এই কাণ্ড বাধিয়েছে—হতেই পারে না। এরকম হুট করে মেয়েরা অন্তত প্রেমে পড়ে না। তাহলে? কেন মারপিট করল? কি চায় ও আসলে? রহস্যটা কোথায়?

'চলো, হাঁটি,' প্রস্তাব দিল রানা।

'চলো,' মিষ্টি করে হাসল মেয়েটা। চুরি করে দেখল, তার বুকের দিকে রানার দৃষ্টি। আরেকটু বিস্তৃত হলো হাসিটা। পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখল রানা ওকে।

দেখে মনে হয় মেয়েটার ধমনীতে রেড ইন্ডিয়ান রক্ত বইছে, তেমনি হাই চিক-বোন, কিন্তু তাহলে আবার আগুনরঙা চুল কেন? ভাবনা-চিন্তায় বাধা পড়ল মেয়েটির কথায়।

'এভাবে তাকিয়ে থাকলে তোমার বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির মামলা করব আমি,' হাসছে ও।

হাসল রানাও। 'আর্ট গ্যালারির ছবি মনে করে দেখছি। তাতে দোষের কিছু আছে?'

রানার একটা বাহু জড়িয়ে ধরল মেয়েটা। 'নেই, যদি কেনার ইচ্ছে থাকে।'

'কেনার অভ্যেস খুব একটা নেই আমার। যাকে বলে সত্যিকার সৌন্দর্য পুজারি।'

'নীতিবান আদর্শ লোক!'

'দু'একটা নীতি বা আদর্শ সত্যিই আছে, তবে মেয়েদের বেলায় সে-সব প্রযোজ্য নয়।'

গা ঘেঁষে হাঁটছে মেয়েটা, অদ্ভুত এক সুগন্ধ আসছে রানার নাকে। কেমন যেন পরিচিত মনে হচ্ছে গন্ধটা, কিন্তু কিসের, ঠিক ধরতে পারছে না।

কিছুটা এগিয়ে আচমকা থেমে পড়ল মেয়েটা। রানার গায়ে ঠেস দিয়ে শরীরের ভর রেখে নিচু হয়ে জুতো খুলল। ছুঁড়ে ফেলল একপাশে। ওয়াইকিকি বীচের ঠাণ্ডা বালির ছোঁয়া নগ্ন পায়ে লাগতেই শিউরে উঠল। রানাকে ধরে ধরে হাঁটতে শুরু করল আবার।

আরও কয়েক মিনিট বালিতে হাঁটল ওরা। ফুরফুরে হাওয়া আসছে সাগরের দিক থেকে। শরীর জুড়িয়ে দিচ্ছে। রানার শরীরে নিজের ভর রেখে হাঁটছে মেয়েটা। চলতে চলতেই মুখ তুলে তাকাল। ম্লান আলোয় চিকমিক করছে ধূসর চোখের মণি। আস্তে করে বলল, 'আমি ডায়না। বন্ধুরা ডিনা বলে ডাকে।'

কিছু বলল না রানা। দাঁড়াল। দু'কাঁধ ধরে নিজের দিকে ফেরাল ওকে। মুখ নামিয়ে আস্তে করে চুমু খেলো কাটা ফুলে ওঠা ঠোঁটে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিপদ সঙ্কেত জানাল ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়, কোথায় যেন টিং করে বেজে উঠেছে একটা অ্যালার্ম

বেল। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। প্রচণ্ড ব্যথা ছড়িয়ে পড়েছে তার দুই পায়ের ফাঁকে, নিচের দিক থেকে লাফ মেরে মগজে চলে এসেছে ব্যথাটা। হাঁটু দিয়ে প্রচণ্ড জোরে মেরেছে ডায়না। বাঁ হাতে সুঁচ ফুটছে, টেরই পেল না রানা। সাংঘাতিক ব্যথায় সাময়িকভাবে চিন্তার ক্ষমতা হারিয়েছে সে, কিন্তু নিজের অজান্তেই প্রতিক্রিয়া ঘটল তার মাংসপেশীতে। বিদ্যুৎগতিতে নড়ে উঠল ওর হাতটা, প্রচণ্ড জোরে এসে ডায়নার ডান চোয়ালে আঘাত করল তার ডান হাতের মুঠো। পানি ভরা কাঁচের গেলাসের ভেতর দিয়ে দূরের জিনিস দেখার মত দৃশ্যটা দেখল রানা। একমুহূর্ত মাতালের মত টলল ডায়না, তারপর স্লো-মোশন ছায়াছবির মত খুব ধীরে পা ভাঁজ হয়ে নিঃশব্দে পড়ে গেল বালিতে।

প্রচণ্ড দৈহিক সহনশীলতাই কিছুক্ষণ পায়ের ওপর খাড়া রাখল রানাকে। তলপেটের কাছে চাকা বেঁধে গেছে দুনিয়ার সব ব্যথা। শব্দ করে বাতাস টানছে দাঁতের ফাঁক দিয়ে। পানি গড়াচ্ছে চোখ দিয়ে, দাঁতে দাঁত চেপে ঠেকিয়ে রেখেছে গোঙানি। ঝিম ঝিম করছে মাথার ভেতর। দু'হাতে আহত জায়গা ধরে আস্তে করে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল সে বালিতে ডায়নার পাশে। সমস্ত ইচ্ছাশক্তি একত্রিত করে ব্যথা তাড়ানোর চেষ্টা করছে, দুলছে এপাশ-ওপাশ।

চোয়াল ব্যথা হয়ে গেছে রানার। জোর করে মাথা তুলল। তাকাল আশেপাশে। বালিতে চিত হয়ে পড়ে আছে এক সুন্দরী মেয়ে, তার পাশেই দু'পায়ের ফাঁকে হাত গুঁজে হাঁটু গেড়ে বসে আছে একটা পুরুষ, এই মুহূর্তে দৃশ্যটা কেউ দেখে ফেললে বিপদে পড়বে রানা। কাছাকাছি কেউ অবশ্য নেই। একদিকে প্রায় সত্তর গজ দূরে আগুনের পাশে গোল হয়ে বসে আছে কয়েকজন ট্যুরিস্ট, আর কয়েকটা বীচ-বয়। বেসুরো গলায় 'পার্লি শেল্‌স্‌ বাই দ্য সী শোর' গাইছে ওরা।

চারটে দীর্ঘ মিনিট পেরিয়ে গেল। তীক্ষ্ণ ব্যথাটা এখন আর নেই, তার জায়গায় ভোঁতা এক ধরনের দপদপানি। ব্যথা কমে যেতেই স্বাভাবিক চিন্তার ক্ষমতা ফিরে পেল আবার রানা, চোখের দৃষ্টি একটু আগের মত ঘোলাটে নয় এখন। এই সময়ই জিনিসটা দেখতে পেল সে। ডায়নার হাতে ছোট কি একটা জিনিস, কাঁচের মত চকচকে। আহত জায়গা থেকে হাত সরিয়ে আনল রানা। হামাগুড়ি দিয়ে মেয়েটার হাতের কাছে চলে এল। হাত বাড়িয়ে ডায়নার আধখোলা মুঠি থেকে ছাড়িয়ে নিল জিনিসটা। কাঁচেরই তৈরি। একটা হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ।

ম্লান আলোয় বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকা ডায়নাকে আরও মিষ্টি লাগছে। বয়েস বড়জোর পঁচিশ হবে। চেহারাটা কেমন যেন শিশুর মত নিষ্পাপ। এই মেয়ে এমন একটা কাজ করতে পারে, বিশ্বাসই হতে চায় না। কোথায় যেন একটা গোলমাল রয়েছে, অনুমান করল রানা। হাতের সিরিঞ্জটা তুলে দেখল। ভেতরে টলটলে তরল পদার্থ। জিনিসটা কি? ওষুধ? না বিষ? অজ্ঞান করতে চেয়েছিল, না খুন? তরল পদার্থটুকু শরীরে ঢোকাবার মত সময় দেয়নি সে মেয়েটিকে, এতই দ্রুত মেরেছে। সিরিঞ্জের মুখ ওপরের দিকে রেখে সাবধানে সুঁচটা খুলে ফেলে দিল রানা। তারপর সিরিঞ্জটা খাড়াভাবে ভরে রাখল বুক পকেটে যেন তরল পদার্থটুকু পড়ে না যায়। পরীক্ষা করিয়ে দেখতে হবে ওটা।

হাঁটু গেড়ে বসেই ডায়নাকে দু'হাতে পাঁজাকোলা করে তুলে কাঁধের ওপর ফেলল রানা। অন্য সময় হলে এই বোঝা নিয়ে খাড়া হতে কোনই বেগ পেতে হত না তাকে, কিন্তু এখন মনে হলো মেয়েটার ওজন পাঁচ মন। টলতে টলতে কোনমতে খাড়া হলো রানা। কোথায় কোন্ অন্ধকার ছায়ায় ঘাপটি মেরে রয়েছে আরও শত্রু, কে জানে। দ্রুত সরে পড়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছে রানা। কিন্তু কাঁধে বোঝা নিয়ে ছুটতে পারল না। দু'পা সামান্য ফাঁক করে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে হচ্ছে।

হোটেলের সামনে-পেছনের আঙিনায় ট্যুরিস্টের ভিড়। তাদের চোখ এড়িয়ে ভেতরে ঢোকাটা কঠিনই। রানার একমাত্র ভরসা বাগানের ভেতর দিয়ে যাওয়া পথটা। পথের দু'পাশে ঘন ঝোপ রয়েছে, তারই আড়ালে থেকে এগোতে হবে। রাস্তার আলো পৌঁছে না এখানে। ট্যুরিস্টদের চাইতেও বড় বিপদ পুলিস। কিংবা হোটেলের গার্ড। ওদের চোখকে ফাঁকি দিতে না পারলে মহা ঝামেলায় পড়তে হবে।

ইঁট বিছানো পথ ধরে এগিয়ে গেলে পাঁচ মিনিটেই পৌঁছে যেতে পারত রানা, কিন্তু পেছনের ঝোপঝাড় পেরিয়ে যেতে বিশ মিনিট লেগে গেল। এই নিয়ে চার-চারবার গাছের আড়ালে ছায়ায় থামতে বাধ্য হলো সে। ওপাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে কয়েকজন লোক। কেউ কেউ টলছে, নেশা ধরে গেছে সাঁঝ হতে না হতেই। এই নিয়ে সাত-আট বার ডায়নার গায়ের গন্ধ শুঁকল সে। গন্ধটা চিনতে পারল হঠাৎই। প্লুমেরিয়া। হাওয়াই দ্বীপে এই গন্ধ বিরল কিছু নয়, কিন্তু এই প্রথম একটা মেয়ের গায়ে প্লুমেরিয়ার গন্ধ পেল রানা।

কাছাকাছি পৌঁছে গেছে রানা, রাস্তার ওপাশেই হোটেল। লবির দরজা পথে ভেতরের আলো এসে ছড়িয়ে পড়েছে রাস্তায়। এদিক ওদিক তাকাল রানা। কেউ নেই। একছুটে রাস্তা পেরিয়ে এল সে। কাঁধে বোঝা, তলপেটে ব্যথা—জায়গাটুকু পেরোতে হাঁপ ধরে গেল তার, বাতাসের জন্যে হাঁসফাঁস করছে নিপীড়িত ফুসফুস। আবছা অন্ধকারে পার্ক করে রাখা গাড়িগুলোর পাশে দাঁড়িয়ে কয়েক মুহূর্ত জিরিয়ে নিল সে, লবির দিকে চোখ রয়েছে সারাক্ষণ। তারপর হোটেলে ঢোকার দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

দরজার কাছে গিয়েই থমকে দাঁড়াল রানা। ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের সাহায্যে কার্পেটের ধুলো পরিষ্কার করছে মহিলা সুইপার। বিশাল থলথলে শরীর, কালো চামড়ার হাওয়াইয়ান। মেয়েলোকটাকে দেখেই অনুমান করল রানা, তাকে এই অবস্থায় দেখতে পেলেই 'পুলিস! পুলিস!' বলে চেঁচিয়ে উঠবে সে। নিঃশব্দে পিছিয়ে এল রানা আবার। ঘুরে এগিয়ে গেল হোটেলের কোণের দিকে, আন্ডারগ্রাউন্ড গ্যারেজটা কোথায় চেনে ও।

গ্যারেজের দেয়াল-ছাত কংক্রিটের তৈরি। ম্লান আলো জ্বলছে ভেতরে। কয়েকটা গাড়ি রাখা আছে। কোন লোকজন নেই। আবর্জনা, ময়লা ইত্যাদি ফেলার জন্যে ব্যবহৃত লিফটের দরজা খোলা, নিচেই আছে লিফটটা। তার মানে কেউ নিচে নেমেছে, গ্যারেজের বাইরে গেছে, যে-কোন সময় ফিরে আসতে

পারে। ডায়নাকে কাঁধে নিয়ে দ্রুত এগিয়ে গেল রানা। আরেকবার এদিক ওদিক চেয়েই চট করে লিফটে ঢুকে পড়ল। টিপে দিল বোতাম। লিফটের দেয়ালে সেগুন কাঠের রেলিঙ লাগানো রয়েছে। একহাতে একটা রেলিঙ চেপে ধরে একপাশের দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াল রানা। হাঁপাচ্ছে।

দর দর করে ঘামছে রানা। ব্যথা, পরিশ্রম আর ভাপসা গরম ক্লান্তির চূড়ান্ত পর্যায়ে ঠেলে দিয়েছে তাকে। গায়ে জোর পাচ্ছে না, শুধু প্রচণ্ড মনোবলই তার দেহকে চালিয়ে নিয়ে এসেছে এ পর্যন্ত।

কাঁধে বোঝা রয়েছে, কিন্তু লিফটের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে বিশ্রাম নিতে পারছে রানা। মাথার ওপরে তীব্র গতিতে ঘুরছে লিফটের খুদে বৈদ্যুতিক পাখা। পাখার বাতাস কাটার মৃদু শোঁ-শোঁ আওয়াজের সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে লিফটের গুঞ্জন।

লিফটের কপালে বসানো নাম্বার প্লেটের দিকে তাকাল রানা। নয় নম্বরের লাল আলোটা জ্বলে উঠেই নিভে গেল। সোজা হয়ে দাঁড়াল সে। দশ নম্বরটা জ্বলে নিভল না। মৃদু ঘ্যাচ-ঘড়ড়ড় আওয়াজ করে খুলে যাচ্ছে দরজা। পুরো খুলে যাবার আগেই ফাঁক দিয়ে চট করে বারান্দায় বেরিয়ে এল রানা। কপালটা ভালই বলতে হবে। শূন্য খাঁ খাঁ করছে বারান্দা। মোড় নিয়ে নিজের ঘরের উদ্দেশে হাঁটতে শুরু করল সে। চলতে চলতেই প্যান্টের ডান পকেটে হাত ঢোকাল। চাবিটা বের করে নিয়ে, ১০১৭ নাম্বার প্লেট বসানো দরজাটার সামনে এসে দাঁড়াল। রোজউডে তৈরি চকচকে কাঠের দরজায় বসানো তালার ফোকরে ঢুকিয়ে দিল চাবিটা।

দামী হোটেল। সাজানো গোছানো ড্রইংরূম পেরিয়ে এসে বেডরূমে ঢুকল রানা। কাঁধ থেকে নামিয়ে পুরু গদি মোড়া বিছানায় প্রায় ছুঁড়ে ফেলল ডায়নাকে। চিত হয়ে পড়ল মেয়েটা হাত-পা ছড়িয়ে। এত প্রচণ্ড ব্যথা দিয়েছে তাকে মেয়েটা, হয়তো খুনই করতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু ওর বিরুদ্ধে কোন ক্ষোভ নেই রানার। আশ্চর্য! কোথায় যেন একটা গোলমাল রয়েছে, আবার অনুভব করল সে।

বাথরূমে এসে ঢুকল রানা। দ্রুত হাতে খুলে ফেলল পরনের কাপড়। শাওয়ারটা পুরো ছেড়ে দিয়ে তলায় গিয়ে দাঁড়াল। তীব্র বেগে মাথায়-কাঁধে বিঁধছে বৃষ্টির ফোঁটার মত পানির ছাট, ঘামের লবণ ধুয়ে গা বেয়ে গড়িয়ে নেমে যাচ্ছে নিচের দিকে। চিন্তার সময় পেল রানা। সেই দুপুরে সৈকতে বসে সিলিন্ডারটা দেখার পর থেকেই ঘটতে শুরু করেছে ঘটনা। অপরিচিত একটা মেয়ে হঠাৎ খুন করতে চাইবে কেন তাকে? নাকি শুধু অজ্ঞান করতে চেয়েছিল? কিন্তু তাই বা চাইবে কেন? এতে কার কি লাভ? কতটা গুরুত্ব দেবে সে এই ঘটনার? সেটা নির্ভর করে সিরিঞ্জে কি আছে তার উপর। সিরিঞ্জের তরল পদার্থটুকু কেমিস্ট দিয়ে পরীক্ষা করানোর আগে বোঝা যাচ্ছে না। ওর বর্তমান অ্যাসাইনমেন্টের সাথে এসব ঘটনার কতটা কি সম্পর্ক বুঝে দেখতে হবে।

ভেবে কোন কূল কিনারা পেল না রানা। শেষে, 'দুত্তোর ছাই!' বলে শাওয়ার বন্ধ করে দিল। হাত বাড়িয়ে র‍্যাক থেকে তোয়ালে নিয়ে গা-মাথা মুছল। এই সময় নজরে পড়ল ওর সুচের দাগটা। তাহলে দিয়েছিল আরেকটু হলেই! হালকা কাপড়

পরে এসে ঢুকল আবার বেডরূমে, বিছানার কাছে এসে দাঁড়াল। তেমনি পড়ে আছে ডায়না। ডান চোয়ালটা ফোলা ফোলা। অনেকখানি জায়গা জুড়ে চামড়ার রঙ কালচে-নীল হয়ে গেছে, তাতে লালের খুদে ফুটকি। সকাল নাগাদ বিচ্ছিরি রকম ফুলে যাবে পুরো চোয়ালটাই।

উবু হয়ে ডায়নার দুই কাঁধ চেপে ধরে জোরে ঝাঁকাল রানা। ধীরে, অতি ধীরে—যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাধ্য হলো মেয়েটা বাস্তব জগতে ফিরে আসতে। ঠোঁট সামান্য ফাঁক করে বিড়বিড় করে কিছু বলল, তারপর আস্তে করে মেলল ধূসর দুই চোখ। রানা ভেবেছিল, অপরিচিত জায়গায় চোখ মেলেই চমকে উঠবে। কিন্তু না, চমকালো না ডায়না। কঠিন মেয়ে। জ্ঞান ফিরে পেয়েই উঠে বসল। পুরো ঘরটায় চোখ বুলিয়ে নিল দ্রুত। প্রথমে রানা, তারপর বেডরূমের খোলা দরজা দিয়ে ছোট্ট ব্যালকনি, সব শেষে ঘরের ভেতরটায় এক পলক চোখ বুলিয়েই আবার দৃষ্টি ফেরাল রানার দিকে। আস্তে করে হাত তুলে তর্জনী দিয়ে চোয়াল স্পর্শ করল। মুখ বিকৃত করল ব্যথা পেয়ে।

'আমাকে মেরেছ তুমি?' ঠিক প্রশ্নের মত শোনাল না কথাটা। যেন স্টেটমেন্ট।

'হ্যাঁ,' শয়তানী হাসি হাসল রানা। 'এবং বেহুঁশ করে ঘরে নিয়ে এসেছি ধর্ষণ করার জন্যে।'

চোখ বড় বড় হয়ে গেল ডায়নার, 'অসম্ভব! পারবে না!'

'কেন পারব না? অজ্ঞান ছিলে, ইতিমধ্যেই কাজ সেরে ফেলিনি, কি করে বুঝলে?'

নিজের অজান্তেই তলপেটের কাছে চলে গেল ডায়নার একটা হাত। রানার হাসি হাসি মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎই থেমে গেল হাতটা। 'তুমি অত নীচ না।'

'কে বলল তোমাকে?'

অদ্ভুত দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকাল ডায়না। 'বলেছে…' আচমকা থেমে গেল। রানার চোখ থেকে সরিয়ে নিল চোখ।

'আরও সাবধান হতে হবে তোমাকে সুন্দরী,' বলল রানা। 'পুরুষ মানুষকে পটিয়ে পাটিয়ে বীচে নিয়ে গিয়ে ইঞ্জেকশনের সুচ ফুটানো…সতর্ক না হলে মস্ত বিপদে পড়বে একদিন।'

কয়েক সেকেন্ড নীরবে রানার দিকে তাকিয়ে রইল ডায়না। কথা বলার জন্যে ঠোঁট ফাঁক করেও থেমে গেল। অনিশ্চিত দৃষ্টি ফুটেছে দুই চোখে। 'কি বলছ, বুঝতে পারছি না।'

'বোঝানোর দরকারও মনে করছি না,' ঘুরে কয়েক পা এগিয়ে টেলিফোনের সামনে দাঁড়াল রানা। 'পুলিসকে জানাচ্ছি সব। যে-কোন নিরীহ নাগরিকের এটাই কর্তব্য।'

'পুলিস ডাকলে ভুল করবে,' ঠাণ্ডা কঠিন শোনাল ডায়নার গলা। 'আমাকে অজ্ঞান করে ঘরে নিয়ে এসে রেপ করতে চেয়েছ, ওদের বলে দেব। আমার চোয়ালে-ঠোঁটে-গালে ঘুসি-খামচির দাগগুলোই তার প্রমাণ। পুলিস কার কথা

বিশ্বাস করবে বলে মনে হয় তোমার?'

হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুলে নিয়ে ডায়াল প্লেটে আঙুল রাখল রানা। নাম্বার ঘোরাল আস্তে আস্তে। 'বোকা হলে প্রথমে নিশ্চয়ই তোমার কথা বিশ্বাস করবে। কিন্তু কোরিনকে যদি সাক্ষী মানি, তখন? ওর মুখেও কিছু দাগ আছে।' ডায়াল ঘোরানো শেষ করল রানা। রিসিভার কানে ঠেকিয়ে রেখেছে। ওপাশ থেকে সাড়া এল, কিন্তু কোন জবাব দিল না। পঞ্চমবার 'হ্যালো' বলে কানেকশন কেটে দিল ওপাশের লোকটা। ডায়াল টোন ফিরে আসতেই বলল রানা, 'হ্যালো, পুলিস? একজন অপরাধী ধরে…'

রানা বাক্যটা শেষ করার আগেই লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নামল ডায়না। দুই লাফে কাছে চলে এল। ছোঁ মেরে রানার হাত থেকে রিসিভারটা ছিনিয়ে নিয়ে খটাস করে রেখে দিল ক্রাডলে। 'প্লীজ! তুমি বুঝতে পারছ না!' নিচু গলায় কথা বলল ডায়না। মরিয়া হয়ে উঠেছে।

'খুব বুঝতে পারছি,' গলায় রাগ আনার চেষ্টা করল রানা। 'জানি, দুটো বুলি মুখস্থ করা আছে সব মেয়ের। বেকায়দায় পড়লেই ব্যস, "থামো, ব্যথা দিচ্ছ, উফ্ফ্" কিংবা "প্লীজ, তুমি বুঝতে পারছ না"!' খপ করে ডায়নার দুই কাঁধ চেপে ধরল রানা। ইচ্ছে করেই ব্যথা দিল। 'লাথি মেরে বিচি ফাটিয়ে দেবে লোকের, সিরিঞ্জ দিয়ে বিষ ঢোকাতে চাইবে গায়ে; তারপর লোকটা কোনমতে বেঁচে গিয়ে বেকায়দা অবস্থায় ফেলে দিলেই চোখ মুখ শুকিয়ে ফেলবে, ভাজা মাছটিও উল্টে খেতে জানবে না আর। যথেষ্ট হয়েছে। ওসব ন্যাকামী রেখে ঝেড়ে কাশো দেখি।'

জোর করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে গিয়েও পারবে না বুঝে থেমে গেল ডায়না। 'ইউ গ্যাংস্টার!' রাগে জ্বলছে ডায়নার চোখ, তীব্র, ধারাল, ফিসফিসে গলা।

গ্যাংস্টার!

অপ্রচলিত একটা শব্দ ব্যবহার করেছে ডায়না। অবাক চোখে তার দিকে তাকাল রানা। আস্তে করে ছেড়ে দিল কাঁধ। পিছিয়ে এল। 'চমৎকার বলেছ! আমি আল কাপোনের চেলা, এইমাত্র নামলাম শিকাগোর জাহাজ থেকে।'

'ইস্স্, তোমাকে…' বাক্যটা শেষ করল না ডায়না। সামান্য একটু পিছিয়ে খাটের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। দুই হাত বুকের ওপর আড়াআড়ি করে দুই কাঁধ ডলতে ডলতে বলল, 'তুমি, তুমি একটা আস্ত ইতর, ছোটলোক!'

কিছু বলল না রানা। ডায়নার আধখোলা দুই কাঁধের দিকে তাকিয়ে আছে। তার আঙুলের চাপে রক্ত জমে গেছে দুই কাঁধে। খারাপই লাগল ওর।

দীর্ঘ কয়েক মুহূর্ত নীরবে কাঁধ ডলল ডায়না। তারপর বলল, 'যা জানতে চাও, বলব।' গলার কঠিন স্বর একটু মোলায়েম হয়েছে, কিন্তু চোখের জ্বলন্ত দৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। 'কিন্তু, কিন্তু আগে আমাকে একটু বাথরুমে নিয়ে চলো। আমি… শরীরটা কেমন যেন…বমি বমি লাগছে!'

নতুন কোন মতলব!—ভাবল রানা। বমি করে ফেলার মত মেয়ে বলে তো মনে হয় না। মুখে বলল, 'বেশ তো, চলো, নিয়ে যাই।'

হাত বাড়িয়ে ডায়নার একহাতের কব্জি চেপে ধরল রানা। টের পেল, সঙ্গে সঙ্গে কঠিন হয়ে গেছে মেয়েটার মাংসপেশি। কিন্তু সতর্ক হবার আগেই নড়ে উঠল ডায়না। খাটের রেইলে এক পা বাধিয়ে ধাক্কা মেরে সামনের দিকে ডাইভ দিল। কাঁধ দিয়ে প্রচণ্ড জোরে গুঁতো মারল রানার পেটে। উঁক করে একটা শব্দ বেরোল রানার মুখ থেকে। চিৎ হয়ে পড়ে গেল একটা চেয়ারের ওপর। চেয়ার এবং পেছনের বেডস্ট্যান্ড ল্যাম্পটা নিয়ে উল্টে পড়ল মেঝেতে। সে কার্পেট ছোঁয়ার আগেই এক ছুটে ব্যালকনির দিকের দরজা দিয়ে বাইরে অদৃশ্য হয়ে গেল ডায়না।

নিজেকে তোলার কোন চেষ্টা করল না রানা। মাথা ঘুরছে। সৈকতে ডায়নার হাঁটুর গুঁতো খাবার পর থেকেই কি যেন হয়েছে তার। ঠিক তাল পাচ্ছে না শরীরের। সিরিঞ্জের এক আধ বিন্দু ওষুধ ঢুকে যায়নি তো শরীরে? যদি রক্তে মিশে যায়? ঝাড়া দিয়ে মাথাটা পরিষ্কারের চেষ্টা করল রানা, দরজার দিকে তাকাল।

ঠিক দশ সেকেন্ডের মাথায় ফিরে এসে দরজায় দাঁড়াল ডায়না।

হেসে উঠল রানা। 'এরপর কখনও দশ তলা থেকে লাফ দেবার ইচ্ছে হলে সঙ্গে প্যারাস্যুট নিয়ে এসো।'

ধীরে ধীরে ঘরে এসে ঢুকল ডায়না। রাগে লাল হয়ে গেছে মুখ। 'জঘন্য লোক তুমি! এরচেয়ে খারাপ কথা আর কি বলব?'

'জানা না থাকলে ডজন খানেক গাল শিখিয়ে দিতে পারি আমি,' মিটি মিটি হাসছে রানা। মাথার ভেতরের জড়তা কেটে গেছে। দুই হাতে ভর দিয়ে উঠে বসল।

রানার কাছ থেকে দূরে, ঘরের অন্য প্রান্তে গিয়ে একটা চেয়ারে বসে পড়ল ডায়না। যতটা সম্ভব দূরত্ব বজায় রেখেছে। রানার চোখের দিকে তাকিয়ে কি যেন খুঁজল। বলল, 'যদি তোমার প্রশ্নের জবাব দিই, তারপর কি করবে?'

'কিছুই না,' শান্ত কণ্ঠে বলল রানা। 'বিশ্বাসযোগ্য গল্প শোনাতে পারলে ছেড়ে দেব, যেখানে খুশি চলে যেও।'

'তোমাকে বিশ্বাস করতে পারছি না।'

'খুকী, আমি বোস্টন স্ট্র্যাঙলার কিংবা জ্যাক দ্য রিপার নই। তাছাড়া ওয়াইকিকি বীচ থেকে ধরে এনে কোন কুমারী মেয়ে সতীত্ব নাশের মতলব আমার আগেও ছিল না, এখনও নেই।'

'তুমি কি করে জানলে?' নার্ভাস ভঙ্গিতে প্রশ্ন করল ডায়না।

'কি জানলাম?'

'যে আমি সত্যিই কুমারী সেকথা।'

'জানতাম না, এখন জানলাম।'

ডায়নার কথা বিশ্বাস করল রানা। কিন্তু বুঝতে পারল না, হঠাৎ এই কথাটা তাকে জানাতে চাইল কেন মেয়েটা। ওর সম্পর্কে ধারণার রদবদল হয়ে গেল তার মনে।

'প্লীজ,' আস্তে করে বলল ডায়না। 'যা ভাবছ, আমি আসলে তা নই।' মৃদু কাঁপছে মেয়েটা, কিন্তু চোখের দৃষ্টি স্থির। 'তোমার ক্ষতি করার কোন ইচ্ছেই

আমার নেই। আসলে, তুমি যেমন তোমার সরকারের আদেশ পালন করো, আমিও তাই করছি। তোমার কাছে কিছু ইনফর্মেশন রয়েছে, যেগুলো তোমার মুখ থেকে বের করে নেবার আদেশ ছিল আমার ওপর। আর সিরিঞ্জেও মারাত্মক কিছু ছিল না। সাধারণ সল্যুশন, স্কোপোলামিন।'

'ট্রুথ সিরাম?'

'হ্যাঁ। মেয়েদের সঙ্গে বেশি ঘোরাঘুরি করো তুমি, এজন্যেই তোমার ওপর নজর পড়েছে।'

'বুঝলাম না।'

'কোরিনের অনেক প্রেমিক আছে, জানোই তো। অ্যাডমিরাল ম্যাকডেভিডের ফ্লীট অপারেশন সম্পর্কে নাকি ইন্টারেস্টেড হয়ে পড়েছে ওর প্রেমিকদের কেউ একজন। মেয়ের কাছ থেকে বাপের খবরাখবর জোগাড় করতে চাইছে আর কি। এটা আমেরিকান নেভি, মানে, ন্যাভাল ইন্টেলিজেন্সের বিশ্বাস। আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে, তোমার সঙ্গে কোরিনের সম্পর্ক কতটা গভীর জানতে হবে। এই, আর কিছু না।'

শুধু এটুকু জানার জন্যে আসেনি সে। আরও অনেক কিছু রয়েছে এর ভেতর। মিথ্যে কথা বলছে মেয়েটা, কোন সন্দেহ নেই। নেভির কোন্ খবরই জানে না কোরিন। একটাই শুধু খবর রাখে, কখন নতুন কোন্ সুদর্শন অফিসার এল কিংবা গেল। ব্যস।

মেঝে থেকে উঠে পড়ল রানা। এগিয়ে গেল ডায়নার দিকে।

আচমকা কঠিন হয়ে উঠেছে রানার চোখ, নজর এড়াল না ডায়নার। শঙ্কা ফুটল চোখে। লজেন্স চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছে যেন বাচ্চা মেয়ে, এমনি দৃষ্টিতে তাকাল রানার দিকে।

রেগে গেছে রানা ঠিকই, কিন্তু কি একটা যেন বাধা দিচ্ছে তাকে। মেয়েটার প্রতি কঠোর হতে পারছে না। আগুন লাল চুলের দিকে আরেকবার তাকাল সে। ধীরে ধীরে নিচের দিকে নেমে গেল দৃষ্টি। কোলের ওপর সহজ ভাবে হাত দুটো ফেলে রেখেছে ডায়না। কেমন একটা অদ্ভুত আকর্ষণ রয়েছে মেয়েটার সব কিছুতেই। ভাললাগা এড়াতে পারছে না রানা। জীবনসঙ্গিনী হিসেবে চাওয়ার মত একটি মেয়ে।

'তোমার কথা বিশ্বাস করলাম না আমি, ডায়না,' বলল রানা। 'আমাকে কঠোর হতে বাধ্য করছ। ন্যাভাল ইন্টেলিজেন্সের সঙ্গে জড়িত নও তুমি। এমনকি মেইনল্যান্ডের বাসিন্দাও নও। কেমন করে বুঝলাম? সেই উনিশশো তিরিশের পর থেকে, গ্যাংস্টার বলে গালাগালি দেয়াটা ভুলেই গেছে আমেরিকানরা। সিক্রেট এজেন্টের অভিনয়ও খুব কাঁচা হয়েছে তোমার। পুলিসকে ফোন করতে গিয়ে যে চালাকিটা করেছিলাম, স্পাইয়ের ট্রেনিং থাকলে সহজেই ধরে ফেলতে পারতে। তুমি এসেছ, অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। ন্যাভাল ইন্টেলিজেন্সের কেউ হলে, এতক্ষণে নিশ্চয়ই তোমার খোঁজ নিত ওরা। কোন ব্যাগট্যাগ নেই তোমার সঙ্গে। তারমানে ট্রান্সমিটারও নেই। কোন অঘটন ঘটলে খবর পাঠাতে পারবে না। এধরনের বাড়তি

সতর্কতা গ্রহণ করেনি একজন মেয়ে স্পাই এটা একেবারেই বেমানান।' শক ট্রিটমেন্টে চমৎকার কাজ হচ্ছে, ডায়নার মুখ দেখেই বুঝতে পারছে রানা। মুখ থেকে রক্ত সরে গেছে, সত্যি অসুস্থ দেখাচ্ছে মেয়েটাকে।

বলে চলল রানা, 'তোমার মত আমাকেও যদি কুমার ভেবে থাকো, তাহলে ভুল করবে। বেহুঁশ ছিলে যখন, তোমার শরীর তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেছি আমি। খুদে একটা হোলস্টার রয়েছে তোমার বাম উরুর ভেতরের দিকে, টেপ দিয়ে আটকানো। সিরিঞ্জের মাপের হোলস্টার।'

ঠেলে বেরিয়ে আসবে যেন ডায়নার চোখ। বাথরুমের দিকে চাইল একবার। দেখে মনে হচ্ছে, চেয়ারে বসেই জ্ঞান হারাবে। দ্বিধা করল এক মুহূর্ত। আস্তে করে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল। ধীর পায়ে হেঁটে গিয়ে ঢুকল বাথরুমে। শব্দ করে বন্ধ করল দরজা।

কমোডে পানি ফ্লাশিঙের শব্দ শুনল রানা। তারপর বেসিনের কলের মুখ থেকে পানি বেরোনোর আওয়াজ। ব্যালকনিতে বেরোনোর দরজার চৌকাঠে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। দূরে হনলুলু শহরের আলো চোখে পড়ছে। কানে আসছে সৈকতে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের একটানা বিলাপ। আরও শোনা যাচ্ছে, লস অ্যাঞ্জেলস সড়কে হঠাৎ হঠাৎ গাড়ির হর্ন আর ইঞ্জিনের শব্দ। ভাবনার জগতে হারিয়ে গেছে রানা।

হঠাৎই ব্যাপারটা ধাক্কা দিয়ে বাস্তবে ফিরিয়ে আনল রানাকে। বেসিনের কলে পানির শব্দ। সেই একইভাবে গড়িয়ে পড়ছে, আওয়াজের কোন পরিবর্তন নেই। তিন লাফে বাথরুমের দরজার কাছে চলে এল সে। একবার পরীক্ষা করেই বুঝল, ভেতর থেকে আটকানো। ডায়না ভেতরে আছে কি নেই, ডেকে জিজ্ঞেস করারও প্রয়োজন বোধ করল না। গায়ের জোরে লাথি চালাল। এক লাথিতেই ছিটকে পুরো খুলে গেল দরজা। খালি বাথরুম।

ডায়না নেই। বাথরুমের তোয়ালে ছিঁড়ে গিঁট দিয়ে দিয়ে দড়ি বানিয়েছে। শাওয়ার পাইপের সঙ্গে দড়ির এক প্রান্ত বেঁধে অন্য প্রান্তটা বের করে দিয়েছে গরাদশূন্য জানালার বাইরে। জানালা দিয়ে নিচে তাকাল রানা, চোখেমুখে আশঙ্কা। পড়ে গিয়ে হাড় গুঁড়ো করে ফেলেনি তো! না, বৃথা আশঙ্কা। তার নিচের ঘরের ব্যালকনির রেলিঙের ঠিক চার ফুট ওপরে গিয়ে শেষ হয়েছে দড়ির অন্য প্রান্ত। অনেক নিচে আলো নিয়ে ছোটাছুটি করছে না কেউ, কোন ধরনের উত্তেজিত চিৎকার শোনা যাচ্ছে না। নিরাপদেই পালিয়েছে ডায়না। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রানা।

পরক্ষণেই গালাগাল দিয়ে উঠল নিজেকে। আজ হলো কি তার! আনাড়ি একটা মেয়ে কলা দেখিয়ে দিব্যি চলে গেল! আর তাকে যেতে দিল সে! টের পেল, মাথার ভেতরে ঝিমঝিমানিটা আবার ফিরে আসছে।

পাঁচ

হালকা এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে রাতে। মাটি থেকে ভাপ বেরোচ্ছে। প্রচণ্ড আর্দ্রতা থাকার কথা বাতাসে, কিন্তু নেই। ভাপসা পচা গরমকে ঝেঁটিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে মৌসুমী বাতাস, পানির ধারে মাথা তোলা ছোট্ট পাহাড়ের সারি ডিঙিয়ে নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে খোলা নীল সাগরে। ডায়মন্ড হেড থেকে রীফ হোটেলের দিকে বাঁকা হয়ে এগিয়ে এসেছে বালিঢাকা এক টুকরো সৈকত, এই ভোরবেলা একেবারে নির্জন। কাঁচ এবং কংক্রীটের বিশাল হোটেলগুলো থেকে ইতিমধ্যেই পিল পিল করে রাস্তায় পড়তে শুরু করেছে ট্যুরিস্টের দল। কেউ কেনাকাটা করবে, কেউ বা ঘুরবে—দ্বীপের চমৎকার দৃশ্য উপভোগ করবে।

ঘামে ভিজে গেছে বিছানার চাদর। তার ওপরই উপুড় হয়ে পড়ে আছে রানা। একেবারে উলঙ্গ, একটা সুতোও নেই গায়ে। খোলা জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে বাইরে। নিচে, পাম গাছের ডালে বসে মারপিট বাধিয়েছে দুটো ময়না। আরেক ডালে বসে পুরুষ দুটোর দিকে নিরাসক্ত চোখে তাকাচ্ছে একটা মেয়ে পাখি। তার দখল নেবার জন্যেই এই ভোরে মারামারি বাধিয়েছে দুই জোয়ান। গা থেকে খসে ছোট ছোট কালো পালকগুলো বাতাসে উড়ছে, খেয়ালই নেই ওদের। চেঁচিয়ে কান ঝালাপালা করে দিচ্ছে। সিকি মাইল জুড়ে সবাই শুনতে পাচ্ছে তাদের কর্কশ চিৎকার।

ময়না দুটোর চেঁচানি আর মারামারির শেষ রাউন্ড চলছে, এই সময় দরজার বেল বাজল। ফিরে তাকাল রানা। উঠতে ইচ্ছে করছে না। আবার বাজল বেল। উঠতেই হলো। ধীরেসুস্থে পায়জামাটা পরে নিল। এগিয়ে গিয়ে খুলে দিল দরজা।

দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন দুর্ধর্ষ কাউবয় চেহারার এক বৃদ্ধ। হাসিখুশি মুখ, ক্লিনশেভড। 'গুড মর্নিং, রানা। রোমান্টিক কোন মুহূর্তে বাধা দিইনি নিশ্চয়?'

'আরে, আপনি!' হেসে হাত বাড়িয়ে দিল রানা। 'আসুন আসুন, ভেতরে আসুন। ভয় নেই, আমি একা। তা হঠাৎ কি মনে করে?'

ধীরেসুস্থে দরজার চৌকাঠ পেরোলেন বৃদ্ধ। চোখ বুলিয়ে নিলেন একবার পুরো ঘরটায়। তারপর ব্যালকনিতে বেরিয়ে এলেন। পরনে ইউনিফর্ম নেই, চমৎকার ছাঁটের সাদা স্যুট আর গাঢ় লাল টাই। ভুরু কুঁচকে ময়না দুটোর দিকে তাকালেন একবার অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। রানার দিকে ফিরে বললেন, 'উফ্, কি চিৎকার রে, বাবা! ঘুমোচ্ছিলে কি করে?'

'সুরুজ আলী ওঠার পর এসেছে ব্যাটারা,' বলল রানা। একটা সোফা দেখাল। 'বসুন, অ্যাডমিরাল। আমি কফি নিয়ে আসছি।'

'কফি হলে হবে না। মাত্র ন'ঘণ্টা আগে ওয়াশিংটনে ছিলাম। প্লেনে বসে থেকে থেকে হাতে-পায়ে খিল ধরে গেছে। কড়া কিছু দরকার।'

'ঠিক আছে, কড়া-ই দিচ্ছি।'

ক্যাবিনেট থেকে স্কচ হুইস্কির বোতল বের করে গেলাসে ঢালল রানা। বোতলের ছিপি লাগাতে লাগাতে তাকাল অ্যাডমিরালের দিকে। ক্ষুরধার বুদ্ধিদীপ্ত চোখ দুটো তাকেই দেখছে।

এই ভোরে আচমকা তার কাছে ছুটে এসেছেন কেন হ্যামিলটন?—ভাবছে রানা। খামোকা রসালাপের জন্যে ছয় হাজার মাইল দূর থেকে উড়ে আসেননি তিনি! নিশ্চয়ই জরুরী কোন কারণ আছে!

এগিয়ে এসে গেলাসটা অ্যাডমিরালের হাতে দিল রানা। 'তা ব্যাপার কি, অ্যাডমিরাল? গভীর সাগরের স্রোত-গবেষণার নীল-নকশা ছেড়ে হঠাৎ হাওয়াইয়ে?'

'তুমি আসতে বাধ্য করেছ,' শান্ত কণ্ঠ অ্যাডমিরালের। 'নিজেই নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছ হে, এবারে। আমার আর কষ্ট করতে হলো না। ধন্যবাদ।'

ভুরু কুঁচকে অ্যাডমিরালের দিকে তাকাল রানা।

'বুঝলে না?' মিটিমিটি হাসছেন হ্যামিলটন। 'বোলতার বাসায় খোঁচা মেরেছ তুমি, রানা। পেন্টাগনে ভূমিকম্প তুলেছ। জানি, ইচ্ছে করে করোনি।...গত সন্ধ্যায় ডেকেছেন আমাকে জয়েন্ট চীফ অভ স্টাফ। এখানে আসার হুকুম দিয়েছেন।'

'ক্যাপ্টেন ম্যাসনের মেসেজ ক্যাপসুলটার কথা বলছেন?'

'অবশ্যই,' হাসলেন হ্যামিলটন। 'দেখেছ, খুলে এনেছ, খুলে পড়েছ... নিজের অজান্তেই দায়িত্ব তুলে নিয়েছ কাঁধে।'

'কি বলছেন? কিসের দায়িত্ব?'

'তেমন কিছু না। এই অ্যাডমিরাল ম্যাকডেভিডকে একটু সাহায্য করবে আর কি। স্করপিয়নকে খুঁজে বের করার কাজে সাহায্য করবে তাকে। খুঁজে পাবেই, এমন কোন কথা নেই, তবে চেষ্টায় ত্রুটি থাকা চলবে না।'

'আমার নামে নিশ্চয়ই বাড়িয়ে বলা হয়েছে জয়েন্ট চীফ অভ স্টাফের কাছে, বুঝতে পারছি। কে অ্যাডমিরাল, আপনি না ম্যাকডেভিড?'

'ম্যাকডেভিড। নিজে অনুরোধ করতে পারছিল না তোমাকে, তাই আমার আসতে হয়েছে। গতকাল দুপুরে নাকি বিচ্ছিরি কাণ্ড বাধিয়েছ তুমি তার অফিসে?'

'একটু কথা কাটাকাটি হয়েছে, আর কিছু না,' বলল রানা। গম্ভীর হয়ে উঠেছে। 'আপনারা ধরেই নিয়েছেন, আমি ইউ এস নেভির হয়ে কাজ করব। অতটা শিওর হলেন কি করে? আমি না-ও তো রাজি হতে পারি।'

সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিলেন না হ্যামিলটন। দুই ঢোক হুইস্কি খেলেন। কেশে গলা পরিষ্কার করলেন। 'হাওয়াইয়ে কেন এসেছ তুমি, রানা?'

'কেন এসেছি মানে?'

'মানে, শুধু শুধু হাওয়া খেতে নিশ্চয়ই আসোনি তুমি এখানে। কিছু খোঁজখবর করছ, বিশেষ করে জাহাজডুবির ব্যাপারে তোমার ইন্টারেস্ট। গত কয়দিন রোজ নিয়মিত যাতায়াত করছ কায়েনা পয়েন্টে...' কথাটা শেষ না করেই থামলেন হ্যামিলটন। চোখ তুলে রানার দিকে তাকালেন।

'থামলেন কেন? বলে ফেলুন।'

'এস এস তুরাগ নিখোঁজ হয়েছে, খবরটা আমি জানি।'

'তো কি হয়েছে? ওটাকে খুঁজতে এসেছি, বলতে চান তো?'

'যদি বলি, ভুল হবে কি?' প্রশ্নের জবাবের অপেক্ষা করলেন না হ্যামিলটন। 'রানা, একটা কথা বলছি, কিছু মনে কোরো না। রানা এজেন্সী…মানে, সি আই এ আর তেমন সুনজরে দেখছে না প্রতিষ্ঠানটাকে। তোমার লেনিনগ্রাদ অপারেশনের পর আরও খেপেছে ওরা। আমি জানি রানা, লেনিনগ্রাদে রাশানদের হয়ে আমেরিকার বিরুদ্ধে গিয়েছ, কিন্তু অ্যাসাইনমেন্ট শেষ হবার পর পরই ব্রিটেনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তাড়া লাগিয়েছ রাশান স্পাইকে; আমাদের হয়েও অনেকবার রাশানদের অনেক কু-পরিকল্পনা বানচাল করে দিয়েছ। আমি জানি, এসবই করেছ তুমি নিছক মানবিক কারণে। কিন্তু আমেরিকার, বিশেষ করে সি আই-এর সবাই তো আর তোমার অন্তরের কথা জানে না।'

'তাই একে একে ক্যানসেল হচ্ছে রানা এজেন্সীর লাইসেন্স, তুলে দেয়া হচ্ছে আমার অফিস বিভিন্ন স্টেট থেকে।'

কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ রানার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন অ্যাডমিরাল। 'তোমার ওপর ওরা ভয়ানক অসন্তুষ্ট। প্লীজ রানা, আমাকে ভুল বুঝো না। ওদের আমি বোঝানোর চেষ্টা করছি। প্রেসিডেন্টের সঙ্গেও কথা বলেছি…'

'থামলেন কেন?'

রানার থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন অ্যাডমিরাল, 'কিন্তু তোমার অমতটা কিসে, রানা? শুধু ওরাই তোমার সাহায্য পাচ্ছে না, তুমিও নিজের কাজে সাহায্য পাচ্ছ আমেরিকান নেভির। যদিও পরোক্ষভাবে। স্করপিয়নের ব্যাপারটা না ঘটলে এই সুবিধে কি পেতে? তোমার তো বরং খুশি হওয়ার কথা। নিজের দেশের জাহাজের খোঁজখবর করতে পারছ, ইউ এস নেভিকে সাহায্য করে এতদিনের জমে ওঠা সমস্ত ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটাবার সুযোগ পাচ্ছ—লাভ নয়?'

গেলাসে চুমুক দিলেন হ্যামিলটন। দ্বিধা করলেন। শেষে বলেই ফেললেন, 'তাছাড়া, নুমায় চাকরি করছ তুমি। হোক না সেটা অ্যাডভেঞ্চারের আকর্ষণে নেয়া অবৈতনিক অনারারী পোস্ট, কিন্তু চাকরি তো? চাকরির আওতায় পড়ে, এমন কোন কাজের নির্দেশ দিতে পারি না আমি তোমাকে?'

'পারেন, অ্যাডমিরাল,' চিন্তিত দেখাচ্ছে রানাকে। 'কিন্তু সরাসরি ইউ এস নেভির হয়ে কোন কাজ করতে হলে আমার সরকারের অনুমতি দরকার। সেটা না পাওয়া পর্যন্ত কোন কথা দিতে পারছি না আমি। তাছাড়া ছ'মাস আগের হারানো একটা সাবমেরিনকে খুঁজে বের করা ছেলেখেলা নয়, আপনি জানেন সেটা।'

'জানি। তুমি চেষ্টা করলেই আমি খুশি,' বললেন হ্যামিলটন। 'তোমাকে দলে পাওয়ার জন্যে খুব জোর তদবির চালিয়েছে অ্যাডমিরাল ম্যাকডেভিড। তোমার খোলামেলা ব্যবহার বোধহয় মনে ধরে গেছে ব্যাটার। তোমাকে চাই-ই। সফল কতটা হবে, যথেষ্ট সন্দেহ আছে আমার। শুধু চীফ অভ স্টাফের হুকুম তামিল করতেই আসতে হয়েছে আমাকে। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের উত্তরে, প্রশান্ত মহাসাগরে

একটা সার্কেল চিহ্নিত করা হয়েছে ইদানীং। বদনাম হয়ে গেছে এই সার্কেলের। শুধু স্করপিয়ন কিংবা তুরাগই নয়, গত তিরিশ বছরে মোট আটত্রিশটা জাহাজ নিখোঁজ হয়েছে ওখান থেকে। কেন যেন ওই সার্কেলের ভেতরে ঢুকলেই হারিয়ে যাচ্ছে জাহাজগুলো।'

'আটলান্টিক কিংবা ভারত মহাসাগরেও জাহাজ হারাচ্ছে। এটা নতুন কিছুই নয়।'

'তা হারাচ্ছে। ডুবে গেলে, কিংবা ধ্বংস হয়ে গেলে, জাহাজের কিছু না কিছু চিহ্ন পাওয়া যায়ই। যাত্রীদের ব্যবহার করা কোন জিনিস, জাহাজের ভাঙা টুকরো-টাকরা, তেলের চিহ্ন, কোন কোন ক্ষেত্রে মানুষের লাশও ভাসতে দেখা যায়। কিন্তু এই সার্কেলের অবস্থা হয়েছে বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের মত, একেবারে নিখোঁজ। কোন চিহ্নই পাওয়া যায় না আর। নাবিকেরা সার্কেলটার নাম দিয়েছে হাওয়াইয়ান ভোরটেক্স।'

'হাওয়াইয়ান ভোরটেক্স?'

'হ্যা। এখন অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে, ওই ভোরটেক্সের ভেতর দিয়ে জাহাজ যাবে শুনলে চাকরি ছাড়তেও দ্বিধা করে না নাবিকেরা।'

'আচ্ছা, চিহ্ন পাওয়া যায় না, বুঝলাম। কিন্তু রেডিও কন্ট্যাক্ট? একটা জাহাজ ডুবতে সময় লাগে। অন্য কোন মেসেজ না হোক, এস.ও.এস. সিগন্যাল তো পাঠাতে পারে জাহাজগুলো?'

'কেউ কেউ পাঠিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেছে রেসকিউ টীম, ফিরে এসেছে শূন্যহাতে। কোন হদিসই আনতে পারেনি কেউ।'

'স্করপিয়নের বেলায়ই তাহলে ব্যতিক্রম ঘটল। মেসেজে পরিষ্কারভাবে পজিশন জানিয়েছেন ক্যাপ্টেন ম্যাসন। নেভির স্যালভেজ শিপ সহজেই খুঁজে বার করতে পারবে...' আচমকা কর্কশ চিৎকারে থেমে গেল রানা। একেবারে তার ব্যালকনি রেলিঙে এসে বসেছে দুটো ময়না, বিজয়ী পুরুষ এবং মাদী।

'কতগুলো অসুবিধে আছে...।' পাখি দুটোর দিকে তাকিয়ে বললেন হ্যামিলটন। আস্তে আস্তে নাড়াচ্ছেন হাতের গেলাস।

'কি অসুবিধে? এই ওয়াহুতেই, পার্ল হারবারে ঢোকার মুখে, সাবমেরিন এফ-৪-কে ষাট ফ্যাদম পানির তলা থেকে তোলেনি নেভি? তুলেছে সে-ই ১৯১৫ সালে, এখনকার মত এত উন্নত যন্ত্রপাতিও ছিল না তখন।'

'আসল কারণটা কি জানো? স্করপিয়নের লগবুকে পাওয়া মেসেজ ঠিক বিশ্বাস করা যাচ্ছে না। কম্পিউটারই সন্দেহ প্রকাশ করছে। অবশ্য ক্যাপ্টেন ম্যাসনের হাতের লেখা সনাক্ত করা গেলে কি হবে বলা যায় না।...তাছাড়া ক্যাপসুলটা খুঁজে পেয়েছে এক বিদেশী।'

'হ্যা,' মুখ বাঁকাল রানা। 'তাকে কতটা বিশ্বাস করা যেতে পারে, এ নিয়েও ভাবছে অনেকেই, তাই না?'

'অনেকটা তাই।'

'সুতরাং, যেহেতু আপনি চেনেন আমাকে, এবং যেহেতু আমি আপনার

ডিপার্টমেন্টে চাকরি করি, আপনাকেই দায়িত্বটা গছাল ওরা। ভুল হলে আপনার হোক। তাই না?'

'আসলে মেসেজটা পড়াই উচিত হয়নি তোমার, রানা। তাদের একটা টপ সিক্রেট ব্যাপার জেনে ফেলেছ। নেভির কাছে এখন আর শুধু নীরব দর্শক নও তুমি, দায়িত্ব এসে গেছে। ইন্সট্রুমেন্টস আর অন্যান্য জিনিস দিয়েও ম্যাকডেভিডের ফ্লীটকে সাহায্য করতে হবে এখন নুমার। আমাদের এফ এক্স এইচ লং-রেঞ্জ হেলিকপ্টার ধার দিতে হবে। ও জিনিস চালাতে জানে না ম্যাকডেভিডের কোন লোক, কাজেই পাইলটও আমাদের। ব্যাপার আরও আছে। আন্তর্জাতিক পানিতে ডুবেছে স্করপিয়ন। আগে এলে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে যে-কেউ এসে স্যালভেজ অপারেশন চালাতে পারে। শত্রু বা মিত্র—যে কেউ। বুঝতে পারছ?'

'শুনে খুশি হলাম,' তিক্ত কণ্ঠে বলল রানা। 'তা শত্রুর কোন আভাস পাওয়া গেছে?'

'না। কিন্তু এসব ব্যাপারে কিছুই বলা যায় না আগে থেকে। তাই একশো এক স্যালভেজ ফ্লীট চেয়ে বসেছে তোমাকে। আসলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছে আমার ভাই, কমান্ডার জন টার্নার। অ্যাডমিরালের কাছে বড় বেশি বাড়িয়ে বলেছে তোমার কথা। ব্যস, পেয়ে বসেছে এখন ম্যাকডেভিড।'

'তার ওপর আরও কিছুটা ঘি ঢেলেছেন আপনি, না?'

রানার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলেন হ্যামিলটন। সিগার বের করে ধরালেন। রানার প্রশ্নটা এড়িয়ে যাবার জন্যে বললেন, 'খুব ভাল একটা ফ্লীটের সাহায্য পাচ্ছ তুমি, রানা। সারা দুনিয়ায় এখন মাত্র কয়েকটা আধুনিক আন্ডারকভার স্যালভেজ ফ্লীট অপারেশন চালাচ্ছে। সেরা দলের একটা হলো ম্যাকডেভিডের হান্ড্রেড অ্যান্ড ফার্স্ট। আর ম্যাকডেভিডের কথা যদি জিজ্ঞেস করো—তুলনাহীন এক সৎ ও সাহসী লোক, এমন একজন মানুষের সাথে কাজ করতে পারাটা যে-কোন লোকের সৌভাগ্য।'

'আন্ডারকভার?'

'হ্যাঁ,' একটু থেমে বললেন, 'গোপনীয়তা একটা মস্ত বড় ফ্যাক্টর। এই তো, কয়েকদিন আগে কিউবার উপকূলের মাইল দশেক দূরে অভিযান চালাল হান্ড্রেড অ্যান্ড ফার্স্ট। নাকের নিচে থেকে তুলে নিয়ে এল একটা ব্রিটিশ বম্বার, অথচ টেরও পেল না ক্যাস্ট্রো। লিবিয়ান পানি থেকে তুলে নিয়ে এল নিউ সেঞ্চুরি জাহাজটাকে, টেরটি পেল না লিবিয়ান নেভি। কৃষ্ণসাগর থেকে তুলল সাউথ উইন্ডকে। আর চীনের তো একেবারে কোলের ওপর থেকে ছিনিয়ে আনল টাকি মারুকে। সত্যিই, এমন ফ্লীটের জুড়ি খুব কমই আছে।'

'তাহলে স্করপিয়নের ব্যাপারে আমার সাহায্য প্রয়োজন পড়ছে কেন অ্যাডমিরাল ম্যাকডেভিডের?'

'হান্ড্রেড অ্যান্ড ফার্স্টের কাছে গোটা ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে। এমন এক পজিশন জানিয়েছে ক্যাপ্টেন ম্যাসন, যা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। ভেবে দেখো তো কি মনে হয়, উড়ে গিয়ে পৌঁছেছে ওখানে স্করপিয়ন? দশ হাজার টন ইস্পাতের শরীর

নিয়ে?'

স্থির চোখে অ্যাডমিরালের দিকে তাকাল রানা। 'কি করে গেল না গেল, সেটা পরের কথা। খুঁজে তো দেখবে আগে। আন্ডার ওয়াটার ডিটেকশন সিসটেমের অনেক উন্নতি হয়েছে। ভালমত খুঁজলে স্করপিয়নের কোন চিহ্ন পাওয়া যাবে না, সেটা কেমন কথা?'

হাতের খালি গেলাসের দিকে তাকালেন হ্যামিলটন। 'রহস্যজনকভাবে অনেক জাহাজ আর মানুষ হারিয়েছে সাগরে, এখনও হারাচ্ছে। অনেক রহস্যেরই কোন মীমাংসা হয়নি আজও। শেষপর্যন্ত হয়তো সেই অমীমাংসিতদের দলেই পড়বে স্করপিয়ন। মানুষ সাগরে নৌকা ভাসানোর পর থেকেই ঘটছে এসব শোচনীয় দুর্ঘটনা, ঘটে চলেছে হাজার হাজার বছর ধরে, ঠেকানো যাচ্ছে না। আসলে কি জানো, প্রকৃতির বিরুদ্ধে কিছু করার নেই মানুষের।'

ঘরে অস্বস্তিকর নীরবতা। অ্যাডমিরালের শূন্যদৃষ্টির দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল রানা, 'ড্রিংক?'

'না ধন্যবাদ,' উঠে দাঁড়ালেন হ্যামিল্টন। 'ওয়াশিংটনে ফিরে যেতে হবে। হিকাম ফিল্ডে আমার জন্যে প্লেন অপেক্ষা করছে। তা যা বললাম, বুঝেছ তো?' রানার জবাবের অপেক্ষা না করেই বললেন, 'ঠিক ন'টায় ম্যাকডেভিডের অফিসে একটু দেখা কোরো, অবশ্য যদি তোমার সরকারের অনুমতি পাও, তবেই। আমার ধারণা, পাবে।' গ্লাসটা রানার দিকে ছুঁড়ে দিলেন অ্যাডমিরাল, লুফে নিল রানা। 'আর হ্যাঁ, সাথে কাউকে লাগবে? তোমার পরিচিত কাউকে পাঠাব নুমা থেকে?'

'না। ঢাকা থেকেই সঙ্গে এনেছি একজনকে।'

'ও, ঠিক আছে,' নাকের ডগা চুলকালেন অ্যাডমিরাল। 'হ্যাঁ, এখানে নেভির সঙ্গে আবার কোন গোলমাল পাকিও না।'

'ম্যাকডেভিড মানুষকে খোঁচাতে পছন্দ করেন, অ্যাডমিরাল।'

'আর তুমি গুঁতোতে পছন্দ করো!' হাসলেন হ্যামিলটন, তারপর বললেন, 'আর খোঁচাবে না।' হাতঘড়ির দিকে চাইলেন হ্যামিলটন। 'আর দেরি করতে পারছি না।' হাসি মিলিয়ে গেছে চেহারা থেকে, তার জায়গায় ঠাঁই নিয়েছে কর্তব্যবোধ। 'কিভাবে এই হতচ্ছাড়া ঘটনার মীমাংসা হবে, বুঝতে পারছি না।...উইশ ইউ বেস্ট অভ লাক, রানা।' হাত বাড়িয়ে দিলেন অ্যাডমিরাল।

অ্যাডমিরালের হাত চেপে ধরল রানা, 'ধন্যবাদ।'

'তোমার পিতাজীর খবর কি?' হঠাৎ প্রশ্ন করলেন অ্যাডমিরাল।

'পিতাজী মানে?'

'মানে মেজর জেনারেল রাহাত খান।'

'ভালই তো দেখে এসেছি ক'দিন আগে। কেন?'

'কাল কথা হলো ফোনে। বেশ উদ্বিগ্ন মনে হলো।' দরজার কাছে চলে এসেছেন অ্যাডমিরাল।

'কি ব্যাপারে উদ্বেগ...কিছু বলেছেন?'

'তোমার ব্যাপারে!' হাসলেন হ্যামিলটন। 'তাঁর ধারণা, এসবের পেছনে

মানুষের হাত আছে। খুব সাবধানে থাকতে বলেছেন তোমাকে।' চোখ টিপলেন, 'বয়স হয়ে গেছে জেনারেলের। চলি।' দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আবার হাত বাড়ালেন অ্যাডমিরাল। রানা ধরতেই বললেন, 'গুডবাই।'

হ্যামিলটন হাঁটতে শুরু করতেই দরজা বন্ধ করে দিল রানা। ওখানেই দাঁড়িয়ে ভাবল কয়েক মুহূর্ত। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলছে সবাই, কিন্তু এতগুলো জাহাজের রহস্যজনক নিখোঁজের ব্যাপারে মানুষের হাত থাকতে পারে, কেউ ভাবছে না—এমন কি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি হ্যামিলটনও না, শুধু একজন ছাড়া।

ছয়

শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে 'হট' লেখা নবটা ঘুরিয়ে দিল রানা। মুষলধারে বৃষ্টির মত ঝরতে লাগল গরম পানি। শরীরের সমস্ত গ্লানি ধুয়ে গা বেয়ে এঁকেবেঁকে নিচে নেমে যাচ্ছে ফোঁটাগুলো কুলকুল করে। গরমের পর ঠাণ্ডা পানির জোরাল ধারায় শরীর ভিজিয়ে স্নান শেষ করল রানা। শাওয়ার বন্ধ করে দিয়ে সরে এল আয়নার সামনে। তোয়ালে টেনে নিয়ে শরীর মুছল। তারপর শেভ করার জন্যে ধীরেসুস্থে সাবান মাখতে লাগল গালে। ইচ্ছে করেই দেরি করছে। ঠিক সময়ে অ্যাডমিরাল ম্যাকডেভিডের অফিসে হাজিরা দেবার কোন ইচ্ছেই তার নেই। আয়নার দিকে তাকিয়ে শয়তানী হাসি হাসল সে। প্রথম দিনেই নির্দেশ অমান্য করতে যাচ্ছে, দেখতে চায় রি-অ্যাকশনটা।

সাদা স্যুট আর গোলাপী শার্ট পরল রানা। টাইয়ের নট ঠিক করতে করতে সঙ্গে পিস্তল নেবে কিনা ভাবছে। ডায়না ব্যর্থ হয়েছে, কিন্তু তার সাঙ্গপাঙ্গরা আসবে আবার। সিরিঞ্জ নিয়ে আসার দরকার হবে না ওদের। সোজা একটা বুলেট ঢুকিয়ে দেবে জায়গামত, কিংবা ছুরি দিয়ে পেটটা ফাঁসিয়ে দিয়ে কেটে পড়বে।

অস্ত্র সাথে রাখারই সিদ্ধান্ত নিল রানা। সুটকেস খুলল। উদ্ভট চেহারার এক আগ্নেয়াস্ত্র। মাউজার মডেল ৭১২ Schnell Feuer Pistole। মারাত্মক এই অস্ত্রটা উপহার দিয়েছে গগল। একেক রকম পিস্তল মানুষের মনে একেক রকমের ছাপ ফেলে। কোনটার শান্তশিষ্ট নিরীহ চেহারা, কোনটা নির্মম নিষ্ঠুর, আবার কোনটা দেখলে মনে হয় রক্তপিপাসু। গগলের দেয়া পিস্তলটা নিঃসন্দেহে রক্তপিপাসু। শুধু তাই নয়, ওটা সাধারণ আর দশটা পিস্তলের থেকে আলাদা। একটা করে গুলি করা যায়, আবার ইচ্ছে করলে বোতাম টিপে মেশিনগানের মত অটোমেটিক বানিয়ে ফেলা যায়। পিস্তলটার চেহারা দেখলেই যে-কোন মানুষের পিলে চমকে যাবে। মাত্র কয়েকটাই তৈরি হয়েছিল এই ৭১২ মাউজার, তার একটা ঘুরতে ঘুরতে হাতে এসে গিয়েছিল গগলের।

বিদঘুটে চেহারার অস্ত্রটা বের করে বিছানার ওপর রাখল রানা। সুটকেস থেকে বের করল কাঠের ফাঁপা শোল্ডার স্টক—হোলস্টার হিসেবেও ব্যবহার করা

যায় কুঁদোটাকে। এই স্টক ৭১২ মাউজারে লাগিয়ে এটাকে কারবাইন বানিয়ে ফেলা যায়, গুলি করা যায় বহু দূরের নিশানাকে। পিস্তলটাকে পুরো অটোমেটিকে দিয়ে ব্যবহারের সময়ও কাজে লাগে এই স্টক, ধরার সুবিধে হয়।

মাউজারটা কাঠের হোলস্টারে ঢোকাল রানা। পঞ্চাশ গুলির একটা ক্লিপ নিল সঙ্গে। সব এক সাথে করে তোয়ালেতে পেঁচিয়ে নিল। পোঁটলাটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। দরজায় তালা দিয়ে লিফটে গিয়ে উঠল। নামতে নামতে কয়েকবার থামল লিফট, লোক উঠল। রানার হাতের পোঁটলার দিকে আড়চোখে তাকাল কেউ কেউ। ভেতরে কি আছে জানলে, ওদের মুখের অবস্থাটা কেমন হবে অনুমান করল রানা। লবিতে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল লিফট। সবাই একে একে নেমে গেলে 'বি' বোতামটা টিপে দিল সে। নিচের পার্কিং ফ্লোরে এসে থামল লিফট। দরজা খুলে যেতেই বেরিয়ে পড়ল সে। গাড়ির দরজা খুলে তোয়ালে জড়ানো মাউজারটা ড্রাইভিং সীটের পেছনের স্বল্প-পরিসর পকেটে ঢুকিয়ে রাখল। তারপর উঠে বসে স্টার্ট দিল ইঞ্জিন।

কালাকাউকা অ্যাভিন্যুর গাড়ির স্রোতে গা ভাসিয়ে দিল এসি কোবরা। গাড়ির ভোঁতা নাকটা উত্তর দিকে মুখ করে আছে, শহরের একেবারে শেষপ্রান্তে পৌছানোর ইচ্ছে। রাস্তার দু'ধারে পাম গাছের সারি সারি বাঁধা দোকান-পাট আর অফিসঘরের ওপর ছড়িয়ে আছে ডালপাতাগুলো। পাকা ফুটপাথে মানুষের ঢল নেমেছে, বেশির ভাগই ট্যুরিস্ট। চকচকে উজ্জ্বল রঙের জামা-কাপড় পরনে ওদের। মেটাল বাঁধানো রাস্তায় তীব্র রোদ প্রতিফলিত হচ্ছে, ধাঁধিয়ে দিচ্ছে চোখ। হাত বাড়িয়ে সরু ড্যাশবোর্ড থেকে সানগ্লাসটা তুলে নিল রানা।

দশটা বাজে। পুরো একঘণ্টা লেট হয়ে গেছে। কিন্তু এখনও যাবে না সে ম্যাকডেভিডের অফিসে। অন্য একটা কাজ আছে। একটা কথা মনের মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারছে অনেকক্ষণ ধরে, মনোযোগের দাবি জানাচ্ছে—ওটাকে একটু চান্স দেয়া দরকার। মনে দ্বিধা। দ্বিধা করতে করতেই গাড়ির নাক ঘুরিয়ে দিল সে। বড় রাস্তা ছেড়ে নামল লাল আগ্নেয়-নুড়ি বিছানো সরু পথের ওপর। মাইল দু'য়েক চলে এসে থামল একটা ছোট্ট সাইনপোস্টের সামনে। গাড়ি থেকে নামল। 'বার্নিস পাউয়াহি বিশপ মিউজিয়াম অভ পলিনেশিয়ান এথনোলোজি অ্যান্ড ন্যাচারাল হিস্টরি' লেখা সাইন বোর্ডটাকে পাশ কাটিয়ে দ্রুত পা চালাল।

মিউজিয়ামের প্রধান হলঘরের চারদিক চওড়া বারান্দা দিয়ে ঘেরা। প্রাচীন ক্যানো নৌকা, স্টাফ করা মাছ আর পাখি, আদিম যুগের ঘাসের তৈরি কুঁড়েঘরের প্রতিকৃতি, এবং প্রাচীন হাওয়াইয়ান দেবতাদের কুৎসিত চেহারার কিম্ভূত মূর্তি গাদাগাদি করে রাখা রয়েছে পুরো বারান্দায় দূর থেকেই হিরামকে দেখতে পেল রানা, হিরাম মাতসুনাগা। একটা কাঁচের পাত্রে কিছু দুর্লভ শামুক-ঝিনুকের খোলা তুলে রাখছে। মাথার একটা চুলও কাঁচা নেই। ছিপছিপে লম্বা শরীর, থ্যাবড়া মুখ, ঠেলে বেরিয়ে থাকা চোয়াল আর ভারী ঠোঁট মিলিয়ে হিরাম খাঁটি হাওয়াইয়ান। পেছনে পদশব্দ শুনে ঘুরে চাইল। ধোঁয়াটে বাদামী চোখ সঙ্গে সঙ্গেই চিনল রানাকে।

'আরে, রানা! এসো, এসো। তোমাকে দেখলেই দিনটা আনন্দে কাটে। এসো, আমার অফিসে, ওখানে বসেই আলাপ হবে।'

হিরামের পিছু পিছু চলল রানা। কাঠের মেঝেতে জুতোর খট খট আওয়াজ তুলে, বিশাল হলরূম পেরিয়ে অফিসে এসে ঢুকল। নতুন বার্নিস দিয়ে চকচকে করে তোলা হয়েছে পুরানো আসবাবপত্র। তিন দিকের দেয়ালেই তাক, বইয়ে ঠাসা, এক কণা ধুলো নেই কোথাও। ডেস্কের ওপারে নিজের চেয়ারে গিয়ে বসল হিরাম। একটা ভিক্টোরিয়ান সেটি দেখিয়ে বসার ইঙ্গিত করল রানাকে।

'হ্যাঁ, বলো এবার, বন্ধু। রাজা কামেহামেহার সমাধি খুঁজে পেয়েছ?'

হেলান দিয়ে বসল রানা। 'গত হপ্তার বেশির ভাগ সময়ই কোনা কোস্টে ডোবাডুবি করেছি। আপনার কবরের কোন চিহ্নই দেখিনি।'

'আমার কবর? হা, হা, হা! হাসালে দেখছি!' খানিক হেসে নিয়ে গম্ভীর হলো বৃদ্ধ। 'আমাদের কিংবদন্তী বলে, পানির তলার কোন একটা গুহার ভেতরে কবর আছে ওঁর। কোন নদী-টদীর তলায়ও হতে পারে।'

'আমার চেয়ে আপনিই ভাল জানেন। গরমের সময় এখানকার নদীগুলো তো শুকিয়ে খটখটে হয়ে যায়।'

শ্রাগ করল হিরাম। 'কবরটা আমরা খুঁজে না পেলেই বোধহয় ভাল, রানা। শান্তিতে ঘুমোতে পারবেন তাহলে রাজা।'

'আপনাদের রাজাকে কেউ জ্বালাতে যাবে না। ধনরত্ন সঙ্গে নিয়ে কবরে নামেননি তিনি। মহান কামেহামেহার সমাধি খুঁজে পাওয়া গেলে বিরাট এক প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার হবে, ব্যস, এছাড়া আর কিছু না। রাজার একটা উপকার হবে অবশ্য। পানির তলায় ভ্যাপসা কোন গুহায় পড়ে আছে হয়তো তাঁর হাড়গোড়। ওগুলো হনলুলুর ফাসক্লাস কোন কবরে ঠাঁই পাবে।'

দুঃখ পেল হিরাম। 'তোমাদের জ্বালাতন মহান রাজা সহ্য করবেন বলে মনে হয় না।'

'না করে উপায় কি? তাঁর রাজ্যের আশি ভাগই এখন বিদেশীদের দখলে। একটু অত্যাচার তো সহ্য করতেই হবে।'

'দুঃখজনক, কিন্তু সত্য। যুদ্ধের সময় বোমা মেরে যতটা ক্ষতি করেছিল জাপানীরা, তার চেয়ে অনেক, অনেক বেশি করেছে সত্তর আর আশির দশকে। সমস্ত টাকা লুটেপুটে নিয়ে যাচ্ছে ওরা। কোনদিন ঘুম থেকে উঠে যদি দেখি, আয়োলানি প্যালেসের মাথায় "রাইজিং সান" পতাকা উড়ছে, অবাক হব না।' স্থির চোখে রানার দিকে তাকিয়ে কথা বলছে মাতসুনাগা। কোন ভাবান্তর নেই চেহারায়। 'আর বেশিদিন টিকতে পারব না আমরা। দুই, বড়জোর তিন পুরুষ পরেই খাঁটি হাওয়াইয়ান রক্ত বলে আর থাকবে না কিছু। বিদেশী রক্তের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে যাবে। আমি অবশ্য ভাগ্যবান। আমার বংশে আমিই শেষ পুরুষ, খাঁটি রক্ত নিয়ে মরব।' হাত তুলে ঘরের চারদিকটা দেখাল। 'সেজন্যেই এই ঘরটাকে জীবনের কর্মক্ষেত্র বানিয়েছি আমি। একটা মুমূর্ষু জাতির শিল্পসংস্কৃতি ধরে রাখার চেষ্টা করছি এখানে এনে।'

থামল হিরাম। ছোট জানালা দিয়ে শূন্য দৃষ্টিতে তাকাল কুলাউ পর্বতের দিকে। ধোঁয়াটে চোখ আর সম্ভ্রান্ত বাদামী মুখটা বিষণ্ন নরম। স্মৃতি রোমন্থন করছে হয়তো। 'বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বড় বেশি কল্পনাবিলাসী হয়ে পড়ছি।' রানার দিকে চোখ ফেরাল। 'এক বুড়োর বকবকানি শুনতে নিশ্চয় আসোনি এখানে। কি দরকার?'

'হাওয়াইয়ান ভোরটেক্স সম্পর্কে কিছু জানতে চাই।'

চোখের দুই জোড়া পাপড়ি আরও কাছাকাছি হলো হিরামের। 'হাওয়াইয়ান ভোর... ও হ্যাঁ, কোন্ জায়গাটার কথা বলছ, বুঝতে পারছি।' চিন্তিত দেখাচ্ছে বৃদ্ধকে। কয়েক মুহূর্ত পর নরম গলায় প্রায় ফিসফিস করে বলল,

'আ কা মাকানি হেমা পা কা মাউনা ও কানোলি
ইকিয়া আ কানাকা কে কাউয়াহিউই হুপী।'

'হাওয়াইয়ান ভাষা শুনতে ভারি মিষ্টি,' বলল রানা।

মাথা ঝাঁকাল হিরাম, 'মাত্র সাতটা ব্যঞ্জনবর্ণ আছে তো, বোধহয় সেজন্যেই। যে কবিতটা আবৃত্তি করলাম, ওটাকে ইংরেজী করলে দাঁড়ায়:

হোয়েন দা সাউথ উইন্ড ব্লোজ, দা মাউনটেইন
অভ কানোলি ইজ সীন, অ্যান্ড দা
সামিট সীমস পিপলড।'

মনে মনে কবিতাটা বাংলা গদ্যে অনুবাদ করে ফেলল রানা: দখিনা বাতাস বইলে সাগর থেকে জেগে ওঠে কানোলি পর্বত, দেখলে মনে হয় মানুষের বাস আছে চুড়োয়। মুখে বলল, 'কানোলি পর্বত...ঠিক বুঝলাম না। এই নামে কোন পর্বত...'

'উত্তরের একটা পৌরাণিক দ্বীপ,' বাধা দিল হিরাম। 'কিংবদন্তী বলে, হাজার হাজার বছর আগে এক উপজাতীয় পরিবার নাকি নিজেদের দ্বীপ—সম্ভবত তাহিতি, ছেড়ে বিশাল এক ক্যানোতে করে পাড়ি জমায় সাগরে। তাদের আগে ওই দ্বীপের আরও লোক হাওয়াইয়ে পাড়ি জমিয়েছিল। পরিবারটা বোধহয় তাদের সঙ্গেই মিলিত হতে আসছিল। কিন্তু মাতৃভূমি ছেড়ে চলে আসায় তাদের ওপর খেপে গিয়ে তারার অবস্থান বদলে দিলেন দেবতারা। ফলে পথ ভুল করল ক্যানোচালক। হাওয়াই ছাড়িয়ে অনেক মাইল উত্তরে চলে গেল ওরা। তারপর কানোলির দেখা পেয়ে ওখানেই ভিড়াল ক্যানো। পরিবারটাকে শাস্তি দেয়ার উদ্দেশ্যেই কাজটা করেছেন দেবতারা। দেখা গেল কোনালি একটা রুক্ষ জায়গা। দ্বীপে গোটা কয়েক নারকেল গাছ, কিছু অন্যান্য ফল আর টারো গাছ ছাড়া আর কিচ্ছু নেই। মিষ্টি পানির ঝর্ণা-টরণাও পেল না। ভয় পেয়ে গেল অভিযাত্রীরা। দেবতার কাছে ক্ষমা ও করুণা ভিক্ষা চেয়ে অনেক কাকুতি-মিনতি, অনেক কান্না-কাটি করল, নৈবেদ্য দিল। কিন্তু তাদের ফরিয়াদে কান দিলেন না নিষ্ঠুর দেবতারা। তখন রেগে গেল অভিযাত্রীরা, ছুঁড়ে ফেলে দিল দেবতার মূর্তি। নিজেদের ভাগ্য গড়ার কাজ তুলে নিল নিজেদেরই হাতে। মিষ্টি পানির জন্যে খোঁড়াখুঁড়ি শুরু করল, ফলের গাছ লাগানোর দিকে মন দিল, আর মাছ তো আছেই সাগরে। কাজটা সহজ হলো না। মারা গেল

অনেকেই, কিন্তু যারা বেঁচে থাকল, আস্তে আস্তে সমৃদ্ধ এক সভ্যতা গড়ে তুলল তারা।'

'দারুণ তো!' মুগ্ধ হলো রানা। 'কানোলিবাসীদের মত একই রকম সংগ্রাম করেছিল আমেরিকার কোয়েকার আর মরমনরা-ও।'

'উহুঁ,' শব্দটার ওপর জোর দিল হিরাম। 'একই রকম নয়। কোয়েকার কিংবা মরমনরা তাদের ধর্মকে ত্যাগ করেনি, বরং বিপদের সময় সেটাকেই আরও আঁকড়ে ধরেছিল। কিন্তু কানোলির ওরা দেবতাকে একেবারেই ত্যাগ করেছিল। নিজেদের চেষ্টায় একটা আগ্নেয়দ্বীপকে স্বর্গ বানিয়ে গর্ব এসে গিয়েছিল ওদের মধ্যে। ধারণা করেছিল ওরাই দেবতা। ন্যায়-নীতির ধার ধারল না তারা আর। দেবতাকে তো মানলই না, সেই দেবতার ভক্ত—কাউয়াই, ওয়াহু, হাওয়াই, এবং আশেপাশের অন্যান্য দ্বীপবাসীদের ওপর আক্রমণ চালাল। কেউ পারে না ওদের সাথে। দেবতার দাসদের মেরেপিটে ধরে নিয়ে গিয়ে নিজেদের দাস বানাল, মেয়েদের বানাল বাঁদী। ওদের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠল আর সব দ্বীপের মানুষ, আকুল হয়ে প্রার্থনা করল দেবতাদের কাছে। অচলা ভক্তির জোরে শেষে মন পাওয়া গেল দেবতার। দেবতার আদেশে উঁচু হয়ে উঠল সাগর, তলিয়ে গেল গোটা দ্বীপসহ কানোলিবাসীরা সাগরের নিচে—আর উঠল না।'

'তার মানে আরেক আটলান্টিস সভ্যতা।'

'অনেকটা। আটলান্টিসের কথা পড়েছি আমি।'

'এই মিলটা হয় কেন?'

'কি জানি!' হিরাম হাসল। 'কিংবদন্তী, পৌরাণিক কাহিনী, যে কোন দেশেরই হোক না কেন, মনে হয় সব যেন একই সুতোয় গাঁথা। এস্কিমোদের কাহিনী বলতে পারি তোমাকে, বলতে পারি আরও অনেক দেশের পুরা কাহিনী। মিল হওয়ার কথা নয়, তবু অনেক মিল পাবে। থাক না হাজার হাজার মাইলের দূরত্ব, সব সভ্যতার সব পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যেই বিস্ময়কর মিল রয়েছে।'

'হারানো আটলান্টিস মহানগরী নাকি আবার জাগবে সাগরের বুক থেকে,' মৃদু হেসে বলল রানা।

'কানোলির ব্যাপারেও একই কথা প্রচলিত আছে।'

'এই সব কাহিনীর পেছনে সত্যতা কতটুকু আছে কে জানে! হয়তো সত্যিই ঘটেছিল এসব অতীতে!' বিড় বিড় করে বলল রানা।

টেবিলে কনুই রেখে দুই হাতের আঙুলগুলো খাঁজে খাঁজে বসিয়ে তার ওপর চিবুকের ভর রেখে সামনের দিকে ঝুঁকে বসল হিরাম। রানার দিকে তাকাল। 'সত্যিই আশ্চর্য! ঠিক তোমার মত একই কথা বলেছিল সে-ও!'

'সে?'

'হ্যাঁ। আরেকজন। অনেকদিন আগের কথা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর। এক সপ্তাহ ধরে নিয়মিত প্রত্যেকদিন এসেছিল লোকটা। লাইব্রেরীতে রাখা প্রতিটি বই আর ম্যানাস্ক্রিপ্ট ঘেঁটেছিল। বলেছিল, কানোলির ওপরই রিসার্চ করেছে।'

'তারপরেও আরও লোক নিশ্চয় খোঁজখবর করেছে কানোলির ব্যাপারে?'

'না। সে করেছিল, আর আজ তুমি।'

'সাংঘাতিক ভাল স্মৃতিশক্তি তো আপনার! সেই কবেকার কথা মনে রেখে দিয়েছেন!'

আঙুলের জট থেকে থাবাদুটোকে ছাড়াল হিরাম। রানার দিকে তাকিয়ে দ্বিধা করছে। বলবে কি বলবে না করতে করতে বলেই ফেলল, 'তাকে না ভোলার একটাই কারণ, রানা। ভোলার মত লোক নয় সে আসলে। দৈত্যের মত বিশালদেহী। সবচেয়ে আশ্চর্য তার চোখদুটো। চোখের এমন রঙ জীবনে দেখিনি আমি। সোনালী!'

সাড়ে এগারোটা বাজে। মাত্র কয়েক মিনিট আগে হিরামের অফিস থেকে বেরিয়ে এসেছে রানা। বিশেষ কিছু চিন্তা করছে, ঠিক তা নয়; অভ্যাসবশে গাড়ি চালাতে চালাতে অন্যমনস্ক হয়ে গেছে—যা সাধারণত হয় না। কেন এমন হলো বলতে পারবে না সে, তবে কাজটা মোটেই উচিত হয়নি তার। এতটা বেখেয়াল না হলে পুরানো ধূসর-রঙা ডজ ট্রাকটা আরও আগেই নজরে পড়ত। বড় রাস্তায় অপেক্ষা করছিল ট্রাকটা, এসি কোবরা লাল নুড়ি বিছানো রাস্তা থেকে বেরিয়ে আসতেই পিছু নিল।

পার্ল হারবারে চলেছে কোবরা। পেছনে ছায়ার মত লেগে আছে ধূসর ডজ। রানা যেদিকে মোড় নেয়, সে-ও মোড় নিচ্ছে সেদিকে। রিয়ার ভিউ মিররে ট্রাকটাকে দেখল রানা। কোবরার সঙ্গে একই গতিবেগ রেখে এগিয়ে আসছে। নিশ্চিত হওয়ার জন্যে গতি বাড়াল রানা। একটু পিছিয়ে পড়ল, কিন্তু তারপরই গতি বেড়ে গেল ডজের। না, আর সন্দেহ নেই। অনুসরণই করছে ওটা।

আরও দুই মাইল এগিয়ে গেল রানা। তারপর আচমকা মোড় নিল মাউন্ট ট্যান্টালাস ড্রাইভের দিকে। চুলের কাঁটার মত বাঁক ঘুরে স্প্রিংয়ের মত পেঁচিয়ে ওঠা রাস্তা ধরে মসৃণ গতিতে উঠে চলল। কোলাউ রেঞ্জ, পর্বতের ঢালে ফার্নের জঙ্গল। পথের প্রতিটি বাঁক পেরিয়ে এক মিলিমিটার করে এক্সিলারেটরে পায়ের চাপ বাড়াচ্ছে রানা। কোন গোলমাল করছে না স্পোর্টস কার, হেয়ার পিন বেন্ডগুলো নিপুণভাবে পেরিয়ে যাচ্ছে, যেন রেলের ওপরে বসানো রয়েছে গাড়ির চাকা। রিয়ার ভিউ মিররে দেখছে, লাল ছোট্ট গাড়িটার সঙ্গে তাল রেখে ছুটতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে বিশাল ডজের ড্রাইভার।

নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবেই ঘটল ঘটনাটা। তাল হারিয়ে ফেলল রানা। কোনরকম আগাম সঙ্কেত না দিয়েই ছুটে এল বুলেট। দরজার পাশে বসানো ছোট্ট সাইড ভিউ মিররটা চুরমার করে দিল গুলি। স্টিয়ারিঙের ওপরে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল রানা, এক্সিলারেটরে পুরো চেপে বসল পা।

হারামজাদা সাইলেন্সার ব্যবহার করছে, বিড়বিড় করে গাল দিয়ে উঠল রানা। শহরের দিক থেকে সরে এসে মস্ত বোকামি করে ফেলেছে। যেদিকে যাচ্ছিল, সেদিকে চলাটাই বরং নিরাপদ ছিল। এখন তার একমাত্র চিন্তা কিভাবে গুলি এড়িয়ে হনলুলুতে পৌছানো যায়। কপাল ভাল হলে অবশ্য এর আগেই পথে কোন

পুলিসের গাড়ির সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে। কিন্তু রিয়ার ভিউ মিররে আবার চোখ পড়তেই ঘাবড়ে গেল সে। কোবরার পেছনের বাম্পারের দশ গজের মধ্যে এসে গেছে ডজ।

পরিষ্কার বুঝল রানা, ডজের ইঞ্জিনে কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে—বাইরের চেহারা যাই হোক, ওটাকে খসানো ওর সাধ্য নয়। স্পীডে পারবে না ওটার সাথে।

সামনে দু'হাজার ফুট ওপরে উঠে গেছে পথটা, তারপর তীক্ষ্ণ কয়েকটা মোড় নিয়ে আবার নিচে শহরের দিকে নেমে গেছে। মাইলখানেক একেবারে সোজা রাস্তা ধরে এগিয়ে গেল কোবরা, এই এক মাইলে আরও কিছুটা এগিয়ে এল ডজ।

সামনে আবার মোড়। গতিবেগ কমাল না রানা। যতটা সম্ভব নিচু করে রেখেছে মাথা। স্পীডোমিটারের কাঁটা পঁচাত্তর ছুঁই ছুঁই করছে।

কোবরার একেবারে পাশে চলে এল ট্রাক। নির্দ্বিধায় রাস্তার সেন্টার লাইন ক্রস করে এগিয়ে এসেছে। জানালা দিয়ে একপলকের জন্যে ড্রাইভারের দিকে তাকাল রানা। তামাকের রঙে ছোপানো অসমান দাঁত বের করে হাসল ড্রাইভার। লম্বা কালো চুল। কালো চোখের তারা জ্বলছে। বাদামী চামড়ায় ঢাকা ছোট্ট নাক। এক নজরেই লোকটার চেহারার খুঁটিনাটি জানা হয়ে গেল রানার। শত্রুতা তো দূরে থাক, জীবনে দেখেনি এ চেহারা।

ড্রাইভারের হাসির জবাবে, তার বোঁচা নাকের ওপর প্রচণ্ড এক ঘুসি বসিয়ে দেয়ার ইচ্ছে হলো রানার। রীতিমত অসহায় বোধ করছে সে। তার সীটের পেছনেই রয়েছে পিস্তল, কিন্তু সেটা বের করার সুযোগ নেই। তোয়ালের ভাঁজ খুলে হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে, তাতে গুলি ভরতে হলে গাড়ি থামাতে হবে। কিন্তু সে উপায় নেই। সীটের পেছন থেকে এনে পুঁটুলিটা খোলা শেষ হবার আগেই অন্তত আধডজন গুলি ঢুকে যাবে বুকে-মাথায়।

সামনে, বাঁয়ে চুলের কাঁটার মত বাঁক নিয়েছে রাস্তা। একটা সাইন বোর্ড পার হয়ে গেল, হলদে রঙে লেখা: 'গতিবেগ বিশ মাইল'। কিন্তু পঞ্চান্ন মাইল গতিতে ছুটে গেল কোবরা। ছোট্ট স্পোর্টস কারের মত এত দ্রুত মোড় নিতে পারল না ভারী ট্রাক, বাধ্য হয়েই পিছিয়ে পড়ল। কিন্তু মুহূর্তের জন্যে। মোড়টা ঘুরেই এক্সিলারেটর পুরো চেপে ধরল ড্রাইভার। দ্রুত এগিয়ে আসছে আবার।

তুমুল বেগে চিন্তা চলেছে রানার মাথায়। কি করে পার পাওয়া যাবে, ভাবছে। একটার পর একটা ফন্দি আঁটছে, কিন্তু পছন্দ হচ্ছে না কোনটাই। আরেকটা মোড় আসছে। গতি কমানোর জন্যে ব্রেকে চাপ দিল। সাথে সাথেই একটা বুদ্ধি খেলে গেল মাথায়। ব্রেক ছেড়ে এক্সিলারেটরে পায়ের চাপ বাড়াতে লাগল, রিয়ার ভিউ মিররে ট্রাক এবং ড্রাইভারের গতিবিধি লক্ষ্য করছে। ডজকে আবার কোবরার পাশে নিয়ে আসতে চাইছে ড্রাইভার।

গুলি চালাচ্ছে না আর লোকটা। ডজের উদ্দেশ্য পরিষ্কার হয়ে গেল রানার কাছে। কোবরাকে ঠেলে পাহাড়ের কয়েকশো ফুট নিচের উপত্যকায় ফেলে দিতে চাইছে ট্রাকটা।

দুশো গজ পরেই আরেকটা বাঁক। গতি কমাল না রানা। ক্রমেই কোবরার সামনের লেফট-ফেন্ডারের কাছে এসে যাচ্ছে ধূসর ডজ। আর একটু এগিয়ে একটা ধাক্কা লাগাতে পারলেই আকাশে উড়ে যাবে ছোট্ট স্পোর্টসকার। পড়বে গিয়ে একশো গজ নিচের পাথুরে মাটিতে।

এক্সিলারেটর পুরো চেপে ধরল রানা। ধরে রাখল, তারপর আচমকা ছেড়ে দিয়ে ব্রেক করল। হঠাৎ কোবরার এই অদ্ভুত ব্যবহারে ক্ষণিকের জন্যে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল ড্রাইভার। হাসি মিলিয়ে গেল মুখ থেকে। স্পোর্টস কারের সঙ্গে সঙ্গে সে-ও গতি বাড়িয়েছিল। পাশে গিয়ে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়ার সুযোগটা নিতে চেয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ গতি বাড়িয়ে অসতর্ক করে দিয়েছে তাকে কোবরা। বাঁকে পৌঁছে গেছে স্পোর্টস কার।

ব্রেক চেপে রেখেই বন বন স্টিয়ারিং কেটে কোবরার নাক ঘোরাল রানা। রাস্তার সঙ্গে ঘষা খেয়ে তীক্ষ্ণ আর্তনাদ তুলল টায়ার। মাটি কামড়ে রয়েছে কোবরা, তবু গাড়ির পেছনটা স্কিড করে রাস্তার বাইরে চলে যেতে শুরু করল। সেইদিকেই সামান্য একটু স্টিয়ারিং কাটল রানা। সোজা হয়ে গেল আবার গাড়ি। সামলে নিয়ে ছুটল সামনের সোজা পথ ধরে। রিয়ার ভিউ মিররে ডজটাকে আর পেল না রানা। পেছনের রাস্তা শূন্য। ধূসর ট্রাকটা অদৃশ্য হয়ে গেছে।

এক্সিলারেটর থেকে পা তুলে আনল রানা। ব্রেক চাপল না। গতি কমতে কমতে আধ মাইল দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেল গাড়ি। এখনও দেখা যাচ্ছে না ট্রাকটাকে। ব্যাপার কি?

সাবধানে কোবরার নাক ঘোরাল রানা। যেদিক থেকে এসেছিল, সেদিকে ফিরল। এগিয়ে চলল সেই বাঁকের দিকে। থেমে দাঁড়ায়নি তো ডজ? এগিয়ে আসছে আবার? দ্বিধা করতে করতে বাঁকের কাছে পৌঁছে গেল রানা। গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়ল।

নিচে ঝোপঝাড়ের ওপরে সবে বসতে শুরু করেছে ধুলো। পাহাড়ের গোড়াটা যেখানে উপত্যকায় মিশেছে, তার কাছ থেকে একটু দূরে পড়ে আছে ডজ। ইঞ্জিনটা ফ্রেম থেকে ছিঁড়ে একপাশে ছিটকে পড়েছে। তালগোল পাকানো ধাতব বস্তুতে পরিণত হয়েছে ট্রাকের শরীরটা। আশেপাশে কোথাও দেখা যাচ্ছে না ড্রাইভারকে।

এদিক ওদিক তাকিয়ে শেষ পর্যন্ত ড্রাইভারকে দেখতে পেল রানা। ভাঙাচোরা ডজের বাঁয়ে একশো ফুট দূরে একটা টেলিফোন থামের ক্রসবারে উপুড় হয়ে ঝুলে আছে লোকটা। পেটটা ক্রসবারে আটকানো, মাথা আর পা ঝুলছে দু'দিকে। ট্রাকটাকে সামলানো যাবে না বুঝতে পেরেই দরজা খুলে লাফ দিয়েছিল ড্রাইভার। পথের ওপর পড়তে চেয়েছিল, কিন্তু পারেনি, ধার দিয়ে ফসকে বেরিয়ে গেছে। ডিগবাজি খেতে খেতে গিয়ে পড়েছে দুশো ফুট নিচে, পাহাড়ের ঢালের মাঝামাঝি কংক্রীটের ভিত্তিতে বসানো একটা টেলিফোনের থামে।

দেখতে পাচ্ছে রানা, ড্রাইভারের নিচে থামের অ্যালুমিনিয়াম রঙ লাল হয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। বমি আসা বীভৎস দৃশ্য। চাওয়া যায় না। ফিরে এসে গাড়িতে

চড়ল রানা।

মাউন্ট ট্যান্টালাস ধরে নিচে নামতে লাগল কোবরা। মাউনা ভ্যালি ছাড়িয়ে এসে সামনে প্রথম যে বাড়িটা চোখে পড়ল রানার, সেটার আঙ্গুর-লতায় ছাওয়া গাড়ি বারান্দায় এসে গাড়ি থামাল। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে একজন বয়স্কা জাপানী মহিলা। মুখের খসখসে চামড়ায় অসংখ্য ভাঁজ। টেলিফোন ব্যবহারের অনুমতি চাইল রানা।

জাপানী কায়দায় বাউ করে ডাকল মহিলা। রান্নাঘরে ফোনটা দেখিয়ে দিল।

টেলিফোনে অ্যাডমিরাল ম্যাকডেভিডের সঙ্গে যোগাযোগ করল রানা। সংক্ষেপে বলল সবকিছু, কোথায় অ্যাক্সিডেন্ট ঘটেছে জানাল।

রিসিভারের ভেতরেই যেন বোমা ফাটাল অ্যাডমিরালের গলা। কানের ইঞ্চি ছয়েক দূরে রিসিভার সরিয়ে নিতে বাধ্য হলো রানা।

'খবরদার, হনলুলু পুলিসকে ডাকবেন না এখুনি,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'দশ মিনিট সময় দিন। আমাদের সিকিউরিটির লোক গিয়ে আগে দেখুক ট্রাকটাকে। লোকাল ট্রাফিক ইনভেস্টিগেটর একটু পরে গেলেও কোন ক্ষতি হবে না। বুঝেছেন?'

'লাউড অ্যান্ড ক্লিয়ার,' রিসিভারটা দুই হাতে মট করে ভেঙে ফেলার ইচ্ছেটা দমন করল রানা। ম্যাকডেভিডের বাচন-ভঙ্গি মোটেই পছন্দ হচ্ছে না তার। আক্রমণের ইচ্ছে হচ্ছে।

'গুড,' বাচন-ভঙ্গি মোটেই বদলালেন না অ্যাডমিরাল। 'দশ মিনিট, বুঝেছেন তো? তারপর পুলিসকে জানাতে পারেন। হ্যাঁ, এখানে পৌঁছতে আর বেশি দেরি করবেন না। কাজ আছে।'

'আচ্ছা,' রিসিভার রেখে দিল রানা।

পাশে থেকে অ্যাক্সিডেন্টের খবর শুনেছে জাপানী মহিলা। রানা রিসিভার রাখতেই প্রশ্নের তুবড়ি ছোটাল। জবাব দিতে দিতে অস্থির হয়ে উঠল রানা।

দশ মিনিট, তারপর আরও পাঁচ মিনিট ব্যয় করল রানা। ভাঙা ডজটা পরীক্ষা করার সময় দিল অ্যাডমিরালের লোকেদের। আবার তুলে নিল রিসিভার। বরফের মত ঠাণ্ডা গলা মহিলা অপারেটরের। হনলুলু পুলিসের জন্যে কিছু খবর সরবরাহ করল রানা। অ্যাক্সিডেন্টের জায়গার বর্ণনা দেয়া শেষ করতেই রানার পরিচয় জানতে চাইল মেয়েটা। আস্তে করে রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা। জাপানী মহিলাকে ধন্যবাদ জানাল।

বাউ করল মহিলা। বিনিময়ে সম্মান দেখানোর জন্যে বাউ করতে হলো রানাকেও। আবার বাউ করল মহিলা। আবার বাউ করতে হলো রানাকে। কিন্তু বিনয়ে কেউ তাকে ছাড়িয়ে যাবে, সেটি হতে দিল না মহিলা। আরও নিচু হয়ে বাউ করল।

ভড়কে গেল রানা। ভ্যালা বিপদরে বাবা! মহিলার বাউ-এর জবাবে পাল্টা বাউ করতে করতে দ্রুত গাড়ির কাছে পিছিয়ে এল। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে বাঁচল।

আরও পাঁচ মিনিট ব্যয় করার ইচ্ছে রানার। কিন্তু গাড়ির ভেতরে অসহ্য গরম। দরদর করে ঘামছে সে। চামড়ায় মোড়ানো বাকেট-সীটে বসে গরম যেন আরও বেশি লাগছে। মনের ভেতরে কি একটা যেন ঠিক খাপে খাপে বসছে না। কিসের যেন টানাপোড়েন চলছে, কিন্তু ঠিক ধরতে পারছে না রানা। হঠাৎই ধরতে পারল।

সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি স্টার্ট দিল সে। দ্রুত স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে অ্যাসফল্টের রাস্তায় ঘষা লাগিয়ে আরও কিছু ছাল-চামড়া তুলল টায়ারের। তীব্র গতিতে ফিরে চলল দুর্ঘটনার জায়গায়। অ্যাডমিরাল ম্যাকডেভিডকে ফোন করতে পাঁচ মিনিট ব্যয় করেছে। তারপর গেছে আরও পনেরো মিনিট। গাড়িতে বসে কাটিয়েছে তিন মিনিট। পুরো তেইশ মিনিট দেরি করে ফেলেছে সে।

ডজের পেছনে একই দলের আরও লোক অনুসরণ করতে পারে, আগে কথাটা মনে হয়নি কেন! অনেক বেশি দেরি হয়ে গেল না তো? বাঁকের মুখে এসে গাড়ি থামাল রানা। বেরিয়ে এসে ছুটে গেল পথের ধারে।

আগের মতই বেঁকেচুরে পড়ে আছে ডজটা। টেলিফোনের থামটাও তেমনি আছে। নিচের দিকে আরও খানিকটা জায়গা লাল হয়ে গেছে। ক্রসবারে ঝোলানো তারগুলো বাতাসে দুলছে, দু'দিকেই থামের মাথায় আটকে আটকে চলে গেছে যেন অনন্তের পথে। সবকিছুই আগের মত। শুধু সেই থামটার ওপর ড্রাইভারের দেহটা নেই এখন। সকালের সূর্যে চকচক করছে লাল রঙ, দানা বাঁধতে শুরু করেছে রক্তের লোহিতকণিকা।

নিচের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ মাথা ঘুরে উঠল রানার। আচমকা একটা ঝিমঝিমানি ভাব এসেছে। টলে পড়েই যাচ্ছিল, নিজের অজান্তেই লাফ মেরে সরে এল পেছনে। মাথার ভেতরটা শূন্য শূন্য লাগছে। রাস্তার ওপরেই বসে পড়ল সে। কিচ্ছু ভাবতে পারছে না। সে কে, কোথায়, কিজন্যে এসেছে, কিছুই মনে নেই; ফাঁকা হয়ে গেছে মাথার ভেতরটা।

মাত্র কয়েক সেকেন্ড, তারপরেই আবার স্বাভাবিক হয়ে এল মাথা। আশ্চর্য! আবার সবকিছু মনে করতে পারছে সে। মনে পড়ল, তাড়াতাড়ি পার্ল হারবারে যেতে বলেছেন তাকে অ্যাডমিরাল ম্যাকডেভিড।

ভাবতে ভাবতে গাড়ি চালাচ্ছে রানা। কিছু একটা গোলমাল হয়েছে। মগজেই বোধহয়। গতকাল সৈকতে ডায়নার আক্রমণের পর থেকেই। কেন এমন হলো?

সাত

পুরানো কায়দায় তৈরি ঘরটার মরচে ধরা টিনের চাল। ময়লা আর শুকনো শেওলা লেগে আছে দরজা-জানালায়।

ঢোকার মুখেই বাধা পেল রানা। কোমরে ঝোলানো নাইন মিলিমিটার কোল্ট

অটোমেটিক, ডাকাতে চেহারার গম্ভীর ম্যারিন-সার্জেন্ট হাত বাড়াল. 'আইডেন্টিফিকেশন. প্লীজ।'

কথাটা ঠিক অনুরোধের মত শোনাল না রানার কানে। কার্ড বের করে সার্জেন্টের চোখের সামনে তুলে ধরল। 'মাসুদ রানা। অ্যাডমিরাল ম্যাকডেভিডের কাছে রিপোর্ট করার কথা আছে।'

'তাহলে আদেশপত্র দেখাতে হবে, স্যার।'

এসব নিয়ম-কানুনের ঝামেলা সহ্য করার মত মানসিক অবস্থা এখন নেই রানার। সার্জেন্টের পা থেকে মাথা পর্যন্ত দ্রুত একবার চোখ বোলাল চওড়া বুকের ছাতি, ফুলে আছে পেশী, মারামারির জন্যে যেন মুখিয়ে আছে সর্বক্ষণ। চকচকে পালিশ করা জুতোয় মুখ দেখা যাবে যেন। নিখুঁত ছাঁটের ইউনিফর্ম। ইউ এস নেভির এসব কেমন যেন অস্বস্তিকর, বাড়াবাড়ি মনে হয় রানার কাছে। 'অফিসার ইনচার্জ ছাড়া আর কাউকে কাগজপত্র দেখাব না আমি।'

'আমার ওপর নির্দেশ…'

'তোমার নির্দেশ আছে শুধু কার্ড চেক করার,' রানার কণ্ঠ শীতল। 'কাগজপত্র চেক করে হিরো সাজার নির্দেশ কেউ দেয়নি তোমাকে।' দরজার দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'ভেতরে যাব। পথ দেখাও।'

লাল হয়ে উঠেছে সার্জেন্টের চেহারা। রানার মনে হলো. ঘুসিই মেরে বসবে সার্জেন্ট। কিন্তু না, সামলে নিল। রানার বরফ শীতল মুখের দিকে তাকিয়ে দ্বিধা করল, ঘুরল, দরজা খুলল, তারপর ফিরে চেয়ে অনুসরণের ইঙ্গিত করল।

ঘরের ভেতরটা জনশূন্য। উল্টেপাল্টে এদিক ওদিক পড়ে আছে কয়েকটা চেয়ার। একটা ফাইল ক্যাবিনেট অযত্ন অবহেলায় পড়ে আছে. ধুলো-ময়লায় মলিন। পুরানো কিছু খবরের কাগজ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে কাঠের মেঝেতে। বদ্ধ বাতাসে কেমন একটা ভাপসা গন্ধ। সিলিঙে. দেয়ালে মাকড়সার জাল। কেউ দেখলে অনুমান করবে, দীর্ঘদিন অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে ঘরটা।

অবাক চোখে দেখল রানা, ঘরের শেষ মাথায় গিয়ে কাঠের মেঝেতে দু'বার বুট ঠুকল সার্জেন্ট। জবাবে নিচ থেকে চাপা অদ্ভুত শব্দ ভেসে এল। একটা ট্র্যাপ ডোর খুলে রানাকে ডাকল সার্জেন্ট।

ট্র্যাপ ডোর থেকে ধাপে ধাপে সিঁড়ি নেমে গেছে, ম্লান আলোয় আলোকিত। রানাকে নামার ইঙ্গিত করে একপাশে সরে দাঁড়াল সার্জেন্ট। নেমে গেল রানা। ওপরে দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল ট্র্যাপ ডোর, কয়েক ইঞ্চির জন্যে লাগল না রানার মাথায়।

এডগার অ্যালান পো-র রহস্য গল্পের জগতে এসে গেছে যেন রানা। কিন্তু সিঁড়ির গোড়ায় পৌছে ভারী পর্দা সরিয়ে ভেতরে উঁকি দিতেই ধারণা পাল্টে গেল তার। বিশাল এক বাংকারে এসে পৌছেছে। দুশো বাই দশো ফুট একটা হলঘরের মত। ছাতে উজ্জ্বল ফ্লুরোসেন্ট বাতি জ্বলছে। বিশাল মেঝেতে পুরু কার্পেট। অসংখ্য ডেস্ক, কম্পিউটার আর টেলিটাইপ মেশিনে ঠাসা ঘর।

বেশির ভাগ ডেস্কের সামনেই সুন্দরী মেয়ে বসে কিংবা দাঁড়িয়ে। গম্ভীর মুখ.

ন্যাভাল ইউনিফর্ম পরা। ভিডিও ডিসপ্লে নিয়ে কাজ করছে কেউ, কেউ কম্পিউটার নিয়ে ব্যস্ত। সহজ স্বাভাবিক অভ্যস্ত আচরণ, যেন যুগ যুগ ধরে এই একই কাজ করে যাচ্ছে মেয়েগুলো।

সাদা ন্যাভাল ইউনিফর্ম পরা জনাবিশেক পুরুষ মেয়েদের থেকে আলাদা হয়ে দাঁড়িয়ে কাজ করছে এক জায়গায়। কম্পিউটার রিড-আউট শীট পরীক্ষা করছে কেউ, কেউ দ্রুত হাতে মন্তব্য লিখছে সবুজ চকবোর্ডে—চার দেয়ালের তিনটেই ওই বোর্ডে ঢাকা।

রানার ওপর চোখ পড়তেই সোজা হলেন ম্যাকডেভিড। হাসলেন। হাত বাড়িয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে এলেন রানার দিকে। 'আরে, মিস্টার রানা, এসেছেন? হান্ড্রেড অ্যান্ড ফার্স্টের নতুন হেডকোয়ার্টারে স্বাগতম।'

'বেশ জায়গা পছন্দ করেছেন।'

হাত নেড়ে পুরো ঘরটা দেখালেন অ্যাডমিরাল। 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তৈরি হয়েছিল। যুদ্ধের পর থেকে আর ব্যবহার করা হয়নি। চমৎকার জায়গা। পড়ে ছিল। পছন্দ হলো, তাই চলে এলাম।'

সুন্দরী এক মহিলা লেফটেন্যান্ট এগিয়ে এল এই সময়। হাতে ফাইলের বোঝা। রানা আর ম্যাকডেভিডকে পাশ কাটিয়ে যাবার সময় সংকোচ-মেশানো হাসি হাসল।

ইঙ্গিতে রানাকে অনুসরণ করতে বলে হাঁটতে লাগলেন অ্যাডমিরাল। এক কোণে একটা ছোট আলাদা ঘরে এসে ঢুকলেন রানাকে নিয়ে। দরজা বন্ধ করলেন।

'পুরো দুই ঘণ্টা আটতিরিশ মিনিট লেট করেছেন,' গম্ভীর গলায় বললেন অ্যাডমিরাল।

'রাস্তায় গাড়ি ঘোড়ার এত বেশি ভিড়··· দেরিই হয়ে গেল।'

'একটু আগে বেরোলেই হত। যাকগে, পুলিসের আগে আমাকে সব জানিয়ে ভালই করেছেন।'

'কিন্তু তা-ও একটা বোকামি হয়ে গেছে। ড্রাইভারকে দেখতে পারল না আপনার লোকেরা।' ব্যাপারটা খুলে বলল রানা।

'ওকে দেখলেও তেমন লাভ হত না,' মাথা নাড়লেন অ্যাডমিরাল। 'শরীরে আইডেন্টিফিকেশন মার্ক পাওয়া যেত বড়জোর। স্থানীয় গুণ্ডাপাণ্ডা কেউ হবে। আপনাকে কবরে পাঠানোর জন্যে টাকা খেয়েছিল, নিজেই চলে গেছে সেখানে।'

'কিন্তু তবুও কোন ধরনের···'

বাধা দিলেন অ্যাডমিরাল। 'প্রফেশনাল এজেন্টরা ভাড়া করা লোকের শার্টের পকেটে নোট রেখে দেয় না।'

'প্রফেশনাল এজেন্ট। রাশান?'

'হয়তো। এখনও কোন প্রমাণ হাতে পাইনি। কিন্তু আমাদের ইন্টেলিজেন্স জানাচ্ছে, রাশানদের একটা দল নাকি নড়াচড়া শুরু করেছে। স্করপিয়নকে খুঁজে বের করে আমাদের আগেই তুলে নিতে চায়।'

'অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনও এই সন্দেহ করেছেন।'

'বেশ ভাল লোক!' সন্তুষ্টি প্রকাশ পেল ম্যাকডেভিডের কণ্ঠে। 'আপনার সম্পর্কে অনেক কথাই বললেন। ইয়ান ফ্লেমিং কিংবা অ্যালিস্টেয়ার ম্যাকলিনের গল্পের মত অনেকটা। আপনাকে নাকি প্রেসিডেন্টের বিশেষ বীরত্বের মেডাল দেয়ার কথা...' বলতে বলতে ডেস্কের ওপর থেকে সিগারেটের প্যাকেট তুলে রানার দিকে বাড়িয়ে ধরলেন ম্যাকডেভিড।

বুড়ো বদমাশ, ভাবল রানা, সৌজন্য দেখানোর চেষ্টা করছে। বলল, 'কিন্তু খেয়াল করেছেন নিশ্চয়, আমাকে কোন গুড কন্ডাক্ট মেডাল দেয়ার কথা ভাবেনি কেউ।' মাথা ঝাঁকিয়ে সিগারেট প্রত্যাখ্যান করল সে।

তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল অ্যাডমিরালের দুই চোখ, 'খেয়াল করেছি।' সিগারেট ধরালেন। তারপর ডেস্কের ওপর ঝুঁকে ইন্টারকমের সুইচ টিপলেন। 'নরিস, পল আর জনকে খুঁজে বের করে পাঠিয়ে দাও।' সুইচ অফ করে দিলেন। ঘুরে, দেয়ালে টাঙানো একটা ম্যাপের দিকে আঙুল তুললেন। উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরের ম্যাপ। 'মেজর, হাওয়াইয়ান ভোরটেক্সের নাম শুনেছেন কখনও?'

'শুনেছি।'

ম্যাপের এক জায়গায় আঙুল রাখলেন ম্যাকডেভিড। ওয়াহুর উত্তরে একটা জায়গা। 'এখানে। এই চারশো মাইল ডায়ামিটার, উনিশশো ছাপ্পান্ন থেকে আজ পর্যন্ত গোটা চল্লিশেক জাহাজ গায়েব হয়ে গেছে এই অঞ্চলে। প্রচুর খোঁজাখুঁজি করা হয়েছে, কিন্তু কোন হদিস পাওয়া যায়নি। ছাপ্পান্নর আগে এত অস্বাভাবিক হারে জাহাজ হারায়নি ওখানে।' ম্যাপের দিক থেকে ঘুরে দাঁড়ালেন অ্যাডমিরাল। কান চুলকালেন। 'জায়গাটার ওপর অনেক গবেষণা চালানো হয়েছে। যতরকমের ধারণা বা সূত্র পাওয়া গেছে, সব কম্পিউটারে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। কিন্তু কোন লাভ হয়নি। থিওরি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেছে বিজ্ঞানীরা। ওই পর্যন্তই। প্রমাণ-নির্ভর বিশ্বাসযোগ্য কিছু...'

দরজায় মৃদু টোকার শব্দে থেমে গেলেন অ্যাডমিরাল। চাইলেন। দরজা খুলে ঘরে ঢুকল রিচার্ড আর টার্নার। শূন্য দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকাল দু'জনেই।

প্রথমে কথা বলে উঠল টার্নার। 'আরে, মাসুদ রানা যে! আপনাকে দলে পাওয়ায় ভালই হয়েছে।'

হাসল রানা। 'এবারের কাপড়-চোপড় পছন্দ হয়েছে তো?'

রানার দিকে তাকিয়ে সামান্য একটু মাথা ঝাঁকাল রিচার্ড। তারপর একটা চেয়ারে বসে পড়ল।

ম্যাকডেভিড বললেন, 'মিস্টার রানা, সময় কম, তাই পুরো অরগানাইজড হওয়া যাচ্ছে না। তবে উপযুক্ত জাহাজ আর বেশ কিছু উন্নত মানের যন্ত্রপাতি আছে আমাদের। দেশের প্রত্যেকটা সিকিউরিটি এজেন্সীর সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে কম্পিউটারের মাধ্যমে। তবু, আপনার এবং নুমার সাহায্য চাই আমি। স্করপিয়নের ব্যাপারটার দ্রুত সমাধান প্রয়োজন। কোন কিছুর দরকার হলে কমান্ডার রিচার্ডকে জানাবেন, সে-ই ব্যবস্থা করে দেবে।'

'একটা ব্যাপার,' বলল রানা।

'বলে ফেলুন।'

'আমিই এখানে সবচেয়ে কমজান্তা লোক। ভোরটেক্সের কথা বলছি। নামটা শুনেছি, আর শুনেছি ওখানে রহস্যজনকভাবে জাহাজ-সারমেরিন হারায়। এই পর্যন্তই। এ সম্পর্কে ভাল জ্ঞান না থাকলে সাহায্য করতে অসুবিধে হবে আমার। সাগরের রহস্যজনক ওই এলাকা সম্পর্কে আরও কিছু জানা দরকার।'

চিন্তিতভাবে রানার দিকে তাকালেন ম্যাকডেভিড। শান্ত গলায় বললেন, 'বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের নাম শুনেছেন নিশ্চয়?'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

'ওই অভিশপ্ত ত্রিভুজটাই একমাত্র নয়,' বলে চললেন ম্যাকডেভিড। 'পৃথিবীতে আরও অনেক জায়গা আছে, যেখানে ব্যাখ্যার অতীত অনেক অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটে থাকে। ভূমধ্যসাগরে আছে এমন জায়গা। জাপানের দক্ষিণ-পুবে প্যাসিফিকের রোমোন্ডো রিজিওনের কথা তেমন প্রচার পায়নি, অথচ গত দুই শতাব্দী ধরে ওখানেই সবচেয়ে বেশি জাহাজ গায়েব হচ্ছে। তেমনি এক জায়গা হলো এই হাওয়াইয়ান ভোরটেক্স। প্যাসিফিকের বারমুডা ট্রায়াঙ্গলও বলে একে অনেকে।'

'এসব গাঁজায় আমার বিশ্বাস নেই,' সহজভাবে মনের কথাটা বলে ফেলল রানা।

'কি জানি,' বলল রিচার্ড। 'অনেকেই অনেক কথা বলে। কিন্তু নামজাদা ডাকসেটে বিজ্ঞানী পর্যন্ত স্বীকার করেছেন, জায়গাগুলোতে কিছু একটা থাকা সম্ভব।'

'আপনার বিশ্বাস হয় না, না?' জিজ্ঞেস করলেন ম্যাকডেভিড।

'আসলে, অনুমানে বিশ্বাসী নই। নিশ্চিত প্রমাণ পেলে তবেই বলব আমি, আছে।'

'ঠিক বলেছেন,' মাথা ঝাঁকালেন ম্যাকডেভিড। 'বিশ্বাস, অবিশ্বাস, অনুমান এসব যতটা পরিহার করে চলা যায় আমাদের জন্যে ততই মঙ্গল। ফ্যাক্টস্ নিয়ে কারবার আমাদের—আমাদের কাজ স্যালভেজ। স্করপিয়নকে খুঁজে বের করে তুলতে হবে। তার ফলে যদি কোন রহস্যের সমাধান হয়ে যায়, অন্যান্য জাহাজডুবির কারণ জানা যায়—ভাল কথা। সেটা উপরি-লাভ। কিন্তু আমাদের আগেই যদি রাশান বা চীনারা ওটাকে খুঁজে বের করে তুলে নিয়ে যায়, তাহলে সমূহ ক্ষতি। আমাদের মুখে থুতু দেবে তখন লোকে।'

'নেভির কলজে বরাবর ছুরির মত বিঁধবে ব্যাপারটা,' যোগ করল রিচার্ড।

মাথা ঝাঁকালেন ম্যাকডেভিড। 'বছরের পর বছর আপ্রাণ চেষ্টার পর তৈরি হয়েছে স্করপিয়ন। এর সৃষ্টির সঙ্গে জড়িত লোকেরা তো বটেই, প্রত্যেকটি আমেরিকান সাংঘাতিক চোট খাবে যদি জানা যায় ভ্লাডিভোস্টকের ঘাটে বাঁধা রয়েছে আমাদের লেটেস্ট নিউক্লিয়ার সাবমেরিন স্করপিয়ন।'

'আচ্ছা, স্করপিয়ন, অন্যান্য জাহাজ আর প্লেন যেভাবে নিখোঁজ হয়েছে তার মধ্যে কোন মিল আছে?' জানতে চাইল রানা।

'আপনার প্রশ্নের জবাব আমি দিচ্ছি, মেজর,' বলল পল রিচার্ড। 'বারমুডার মত হাওয়াইয়ান ভোরটেক্সে কিন্তু কখনও কোন প্লেন হারায়নি। আর জাহাজ সাবমেরিন নিখোঁজ হওয়ার মধ্যে মিল খুঁজে পাওয়া যাবে কি করে—কোন রকমের চিহ্নই তো পাওয়া যায়নি। কোন লাশ না, তেল না, লাইফবোট না, কিচ্ছু না। একটি মাত্র মিল যা দেখা যাচ্ছে: এরা সবাই হারিয়ে গেছে প্রশান্ত মহাসাগরের একটা বিশেষ এলাকায়।'

ঝুঁকে রানার হাত স্পর্শ করল টার্নার। 'একমাত্র স্করপিয়নের মেসেজ ক্যাপসুলটাই একটা ব্যতিক্রম, যেটা কায়েনা পয়েন্টে পেয়েছেন আপনি।' একটু ভাবল, তারপর বলল, 'আরও একটা ঘটনা অবশ্য ঘটেছে...'

'কি ঘটনা?'

'আটলান্টা,' শান্তকণ্ঠে বললেন অ্যাডমিরাল। অদ্ভুত দৃষ্টি তাঁর চোখে। হাজার হাজার আলোকবর্ষ দূরের কোন অজানা বস্তু দেখতে পাচ্ছেন যেন। 'ঘটনাটা মেরি সিলেস্টের চেয়েও অদ্ভুত।' টেনে একটা ড্রয়ার খুললেন ম্যাকডেভিড। খুঁজে-পেতে একটা ফোল্ডার বের করে রানার দিকে বাড়িয়ে ধরলেন। 'বেশি না, মাত্র কয়েকটা পাতা।' ইন্টারকমের সুইচ টিপলেন। 'নরিস, কফি লাগবে।'

চেয়ারে হেলান দিয়ে আরাম করে বসল রানা। ফোল্ডারের ওপরের লেখাটা পড়ল: 'এস এস আটলান্টার আজব দুর্ঘটনা!'

পাতা উল্টে পড়ে গেল রানা:

'১০ জুলাই, ১৯৬৮, বিকেল। হনলুলু পোর্ট ত্যাগ করল প্রাইভেট ইয়ট এস এস আটলান্টা—একটা রূপান্তরিত ব্রিটিশ টর্পেডো বোট। গন্তব্য, ওয়াহু দ্বীপের উত্তর-পূর্ব অঞ্চল। উদ্দেশ্য, একটা লাইফবোট সীন চিত্রায়িত করা। ছবিটা পরিচালনা করছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পরিচালক প্রযোজক হার্বার্ট ভেরুসন। আটলান্টার মালিকও তিনিই। সাগর শান্ত। আবহাওয়া চমৎকার। শুধু কয়েক টুকরো সাদা মেঘ ভাসছে আকাশের অনেক উঁচুতে। বাতাসের গতি চার নট।

'১৩ জুলাই, সন্ধে ৮-৫০ মিনিটে, ম্যাকাপু পয়েন্টের কোস্ট গার্ড স্টেশন এবং পার্ল হারবারের ন্যাভাল কমুনিকেশন সেন্টার আটলান্টা থেকে একটা ডিসট্রেস-কল পেল। পজিশনও জানাল ইয়টটা। হিকাম ফিল্ডে এয়ার রেসকিউকে খবরটা দেয়া হলো সঙ্গে সঙ্গেই। ওয়াহু থেকে রওনা হয়ে গেল ন্যাভাল এবং কোস্ট গার্ডদের জাহাজ। মাত্র বারো মিনিট স্থায়ী রইল এস ও এস। তারপর নীরবতা। বেশ কিছুক্ষণ পরেই রেডিওতে ভেসে এল কয়েকটা আজব কথা: "কুয়াশার ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে ওরা। মারা গেছেন ক্যাপ্টেন আর ফার্স্ট মেট। নাবিকেরা যুদ্ধ করছে। কোন আশা নেই। অনেক বেশি। প্রথমেই খতম হয়েছে যাত্রীরা। এমন কি মহিলাদেরও রেহাই দেয়া হয়নি।" অসংলগ্ন কিছু কথাবার্তা ভেসে এল এরপর। "দক্ষিণ দিগন্তে একটা জাহাজ চোখে পড়ছে। খোদা! যদি সময় মত পৌঁছে যেত জাহাজটা! মিস্টার ভেরুসন মৃত। আমার জন্যে আসছে এখন ওরা। আর সময় নেই। রেডিওর কথা শুনে ফেলেছে। ক্যাপ্টেনের দোষ নেই। তাঁর জানার কথা

না। দরজায় ধাক্কা মারছে ওরা। সময় নেই! কিছুই বুঝতে পারছি না। আবার চলতে শুরু করেছে জাহাজ। সাহায্য, খোদার দোহাই লাগে, সাহায্য করুন আমাদের! হায়, খোদা! ওরা...'' মেসেজ শেষ হয়ে গেল এরপর।

'সবার আগে গিয়ে পৌছেছে ওখানে একটা স্প্যানিশ ফ্রেইটার, কলম্বাস। আটলান্টার ডিসট্রেস সিগন্যাল মাত্র বারো মাইল দূর থেকে রিসিভ করে জাহাজটা। এই জাহাজটার কথাই বলেছিল রেডিও অপারেটর। আটলান্টার পাশে চলে এল কলম্বাস। ফ্রেইটারের লোকেরা দেখল, অক্ষত রয়েছে আটলান্টা। ধীর গতিতে চলছে। হঠাৎই, অদ্ভুতভাবে থেমে গেল আটলান্টা। অবাক হলেন কলম্বাসের ক্যাপ্টেন, কিন্তু ঠিক কেন যে থেমে গেল বুঝতে পারলেন না তিনি। যাই হোক, কয়েকজনের একটা দলকে বোটে করে ইয়টে পাঠালেন ক্যাপ্টেন। আটলান্টায় উঠেই চমকে গেল নাবিকেরা, শিউরে উঠল। বীভৎস দৃশ্য! সারা জাহাজে শুধু লাশ আর লাশ। ডেকে, কেবিনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে যাত্রী, নাবিক, অফিসার, ক্যাপ্টেন। রেডিওরুমে রেডিওর ওপরেই মরে পড়ে আছে অপারেটর। প্যানেলে তখনও ''অন'' লেখাটার নিচে লাল আলো জ্বলছে।

'দেরি না করে কলম্বাসের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে রেডিওতে যোগাযোগ করল উদ্ধারকারী দলের নেতা, অফিসার। কি কি দেখেছে তারা, আতঙ্কিত গলায় বর্ণনা দিতে লাগল। লাশের চামড়ার রঙ সবুজ হয়ে গেছে। প্রচণ্ড উত্তাপে গলিয়ে দেয়া হয়েছে যেন মুখ। একটা দুর্গন্ধ সারা জাহাজে, অফিসারের কাছে কিছুটা গন্ধকের মত মনে হয়েছিল। লাশগুলোর পড়ে থাকার ভঙ্গি দেখেই বোঝা গেছে, প্রচণ্ড যন্ত্রণা পেয়ে মরেছে হতভাগ্য মানুষগুলো। অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে বেঁকেচুরে ছিল হাত-পাগুলো, যেন দুমড়ে মুচড়ে দেয়া হয়েছে। পোড়া-গলা মুখগুলো সব উত্তর দিক নির্দেশ করে রয়েছে। একজন যাত্রীর পোষা ছোট্ট কুকুরটা পর্যন্ত রেহাই পায়নি। মনিবের মত একই অবস্থা হয়েছে জানোয়ারটারও।

'নিজের লোকদের নিয়ে হুইলহাউসে সংক্ষিপ্ত মীটিং করল অফিসার। তারপর কলম্বাসের সঙ্গে আটলান্টাকে বেঁধে নেয়ার অনুরোধ জানাল ক্যাপ্টেনকে। লাশগুলো সহ হনলুলু বন্দরে টেনে নিয়ে যাবার ইচ্ছে অফিসারের।

'কলম্বাস কাজ শুরু করার আগেই ঘটল আচমকা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। আটলান্টার তলাটা আগা থেকে পেছন পর্যন্ত চিরে ফাঁক হয়ে গেল। ভয়ঙ্কর ঝাঁকুনিতে ডেকের লাশ-মালপত্র সব ছিটকে গিয়ে পড়ল সিকি মাইল দূরে পানিতে।

'আতঙ্কিত, অসহায় অবস্থায় এই মারাত্মক ঘটনা ঘটতে দেখলেন কলম্বাসের ক্যাপ্টেন আর নাবিকেরা। ধীরে ধীরে ডুবে গেল ভাঙা আটলান্টা। কলম্বাস থেকে পাঠানো উদ্ধারকারী দলের কেউ-ই ফিরে এল না।

'সব শুনল-জানল কোস্ট গার্ড বোর্ড অভ এনকোয়েরী। দর্শকদের সাক্ষ্য নিল নিজেরাও প্রচুর তদন্ত তল্লাশী চালাল। তারপর নিতান্ত হতাশভাবেই মন্তব্য লিখল: ''কলম্বাসের উদ্ধারকারী দল এবং আটলান্টার যাত্রী-নাবিকের মৃত্যু, ইয়টে বিস্ফোরণ, এ সবেরই পেছনে কোন অজানা রহস্য রয়েছে।'' বন্ধ করে দেয়া হলো ফাইল।'

ফোল্ডারটা বন্ধ করে অ্যাডমিরালের টেবিলে রেখে দিল রানা। 'সত্যিই উদ্ভট!'

'এই একটাই ঘটনা,' বিষণ্ণ গলায় বললেন অ্যাডমিরাল। 'জানা মতে এই একটাই ঘটনা ঘটেছে হাওয়াইয়ান ভোরটেক্সে—ডিসট্রেস সিগন্যাল দিতে পেরেছে বিপদগ্রস্ত জাহাজ। লাশসুদ্ধ জাহাজটাকে দেখেছে জ্যান্ত মানুষ।'

'মনে হচ্ছে,' বলল রানা। 'আটলান্টায় এসে চড়াও হয়েছিল একদল জলদস্যু। ওরাই নিষ্ঠুর ভাবে খুন করেছে ইয়টের যাত্রী-নাবিকদের।'

মাথা নাড়াল রিচার্ড। 'কলম্বাস থেকে যারা উঠেছিল সবাই শেষ হয়ে গেছে। রেডিও ডিরেকশনাল ইকুইপমেন্ট প্রমাণ করেছে, বারো মাইল দূর থেকে ডিসট্রেস কলের সাড়া দিয়েছে স্প্যানিশ ফ্রেইটারটা। সুতরাং সন্দেহের বাইরে রাখতে হচ্ছে কলম্বাসকে।'

'কাছেপিঠে আর কোন জাহাজ দেখা যায়নি?' জানতে চাইল রানা।

'কি ভাবছেন, বুঝতে পারছি,' রিচার্ডের হয়ে বলল টার্নার। 'কিন্তু জলদস্যুতা বন্ধ হয়ে গেছে আজকাল।'

'ক্যাপ্টেন ম্যাসনের মেসেজে ফগ ব্যাংকের উল্লেখ আছে,' রানা নাছোড়বান্দা। 'ওই ধরনের কোনকিছু দেখেছে কলম্বাস?'

'না,' জবাবটা দিলেন ম্যাকডেভিড। 'প্রথম মে-ডে কলম্বাসে আটটা পঞ্চাশ মিনিটে। ওই ল্যাটিচিউডে তখন গোধূলি। দিগন্তে কুয়াশা থাকলেও অন্ধকারে চোখে পড়ার কথা নয়।'

'তাছাড়া,' যোগ করল টার্নার, 'জুলাই মাসে প্যাসিফিকের ওই এলাকায় কুয়াশা থাকে না। ফগ ব্যাংক সৃষ্টি হওয়ারও কতগুলো নিয়মকানুন আছে। ঠাণ্ডা পানির সংস্পর্শে এসে ঘনীভূত হয়ে ফগ ব্যাংকের সৃষ্টি করে গতিহীন গরম বাতাস, তা-ও বেশির ভাগই রাতের বেলা। কিন্তু ওই এলাকায় বছরের প্রায় সব সময়ই বাতাস গতিশীল, পানিও ঠাণ্ডা হয় না।'

শ্রাগ করল রানা। 'হুঁ।'

'কলম্বাস আরেকটু পরে গেলেই আটলান্টার বিস্ফোরণের কথা জানতে পারত না,' বলল রিচার্ড। 'রহস্যজনক নিখোঁজের তালিকায় আরেকটা জাহাজের নাম যোগ হত।'

রিচার্ডের দিকে তাকাল টার্নার। 'আরেকভাবেও দেখা যায় ব্যাপারটাকে। আটলান্টাকে যদি অপার্থিব জীবেরাই আক্রমণ করে থাকে, অন্য একটা জাহাজকে সেটা দেখতে দেবার কথা নয়। কিংবা অন্য জাহাজের লোকেদের ইয়টটাতে উঠে তল্লাশী চালাতে দেয়াটাও কেমন যেন বেমানান। নিশ্চয় এর পেছনে কোন কারণ আছে।'

হাত তুলে বাধা দিল রিচার্ড, 'আবার শুরু হলো!'

'সত্যের কাছাকাছি থাকো, কমান্ডার,' টার্নারের দিকে শীতল দৃষ্টিতে তাকালেন অ্যাডমিরাল। 'সাইন্স ফিকশন নিয়ে আলোচনার সময় নেই আমাদের।'

ছোট্ট অফিস ঘরটায় থমথমে নীরবতা। হলঘর থেকে ভেসে আসছে যন্ত্রপাতির

চাপা শব্দ। হাত দিয়ে ক্লান্তভাবে চোখ ডলল রানা। দু'হাতে মাথার দুই পাশ চেপে ধরল, মগজ পরিষ্কারের চেষ্টা করছে যেন। তারপর টার্নারকে দেখিয়ে বলল, 'কমান্ডার একটা বেশ ভাল কথা বলেছেন।'

রানার দিকে তাকালেন অ্যাডমিরাল। 'চোখা কানওয়ালা সবুজ মানুষেরা জাহাজের পেছনে লেগেছে, বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন?'

'না,' বলল রানা। 'তবে আটলান্টার পরিণতি কলম্বাসকে দেখানোর পেছনে কোন কারণ আছে, এটা বিশ্বাস করতে শুরু করেছি।'

আগ্রহী হয়ে উঠলেন অ্যাডমিরাল, 'মানে?'

'খারাপ আবহাওয়া, ভুল পরিচালনা, এবং কপাল খারাপ হওয়ায় অল্প কিছু জাহাজ নিখোঁজ হয়েছে, এই চিন্তাটা মুহূর্তের জন্যে বাদ দিই। কল্পনার আরেকটু প্রসার ঘটাই, যদি ভাবি, এই সামান্য কিছু জাহাজ গায়েব হওয়ার পেছনে প্রখর বুদ্ধিমান কোন ব্রেনের কারসাজি রয়েছে?'

'বেশ বেশ, প্রখর বুদ্ধিমান ব্রেনই অঘটনগুলো ঘটাচ্ছে,' বলল রিচার্ড। 'কিন্তু লোকটা...,' টার্নারের হাসি হাসি মুখের দিকে তাকিয়ে ক্ষণিকের জন্যে থেমে গেল '... কিংবা জীবটার উদ্দেশ্য কি? পাইকারী খুনের দৃশ্যটা স্প্যানিয়ার্ডদের দেখিয়ে লাভটা কি হয়েছে?'

'লাভ নিশ্চয় আছে, নইলে রুটিন ভাঙত না,' বলল রানা। 'কুসংস্কারে নাবিকেরা খুব বেশি বিশ্বাসী। বেশির ভাগই সাঁতার জানে না, অ্যাকোয়ালাঙ পরে ডুব দেয়ার তো প্রশ্নই আসে না। জীবন কাটে তাদের জাহাজে। পানিতে ডুবে কিংবা হাঙরের মুখে মরার ভয় মনের গভীরে পুষে রাখে, দুঃস্বপ্ন দেখে। আমার মনে হয়, প্ল্যান করে আটলান্টার লোকদের খুন করেছে অজানা বন্ধুটি, ডেকে ফেলে রেখেছে। নিরীহ কুকুরটা পর্যন্ত তার নিষ্ঠুরতা থেকে রেহাই পায়নি।'

'শুনে মনে হচ্ছে, কয়েকজন নাবিককে ভয় দেখানোর জন্যে ভেবেচিন্তেই তৈরি করেছে প্লট,' বলল রিচার্ড।

'কয়েকজন নয়,' শুধরে দিল রানা। 'বলুন পুরো নাবিক গোষ্ঠী। ভেবেচিন্তে হুঁশিয়ারি জানানো হয়েছে।'

'কিসের হুঁশিয়ারি?' জানতে চাইল টার্নার।

'সাগরের নির্দিষ্ট ওই এলাকাটা থেকে দূরে সরে থাকার হুঁশিয়ারি,' জবাব দিল রানা।

'একটা কথা ঠিক বলেছেন,' আস্তে করে বলল রিচার্ড। 'আটলান্টার ঘটনার পর থেকে ভোরটেক্স এলাকাটাকে প্লেগের মত এড়িয়ে চলে নাবিকেরা।'

'কিন্তু একটা কথা,' আশ্চর্য শান্ত অ্যাডমিরালের গলা। 'প্রত্যক্ষদর্শী, মানে কলম্বাস থেকে যারা আটলান্টায় উঠেছিল, বিস্ফোরণে তারা সবাই মারা গেছে। এ ব্যাপারে আপনার কি মনে হয়?'

হাসল রানা। 'সহজ ব্যাপার। আমাদের বন্ধুটির ধারণা ছিল, উদ্ধারকর্মীরা কলম্বাসে ফিরে গিয়ে ক্যাপ্টেনের কাছে রিপোর্ট করবে। ব্যস, তাদের কাজ শেষ। কিন্তু মানুষের মনের লোভের কথাটা একবারও মনে হয়নি তার। স্যালভেজ

মানি—আটলান্টাকে টেনে বন্দরে নিয়ে যেতে পারলে টাকা পাওয়া যাবে, এই মোহে পড়েছিল কলম্বাসের নাবিকেরা। বাধ্য হয়ে মারতে হয়েছিল তাদের। আটলান্টা বন্দরে ফিরে গেলে তার ওপর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান চালানো হত, আমাদের বন্ধুটির বিরুদ্ধে বিপজ্জনক কোন কিছু বেরিয়ে পড়ত হয়তো। ঝুঁকি নিতে চায়নি সে। ভালমত একটা বিস্ফোরণ। ব্যস, সমস্ত সাক্ষী-প্রমাণ নিয়ে সাগরে তলিয়ে গেল ভেরুসনের ইয়ট।'

'কেস বেশ ভালই সাজিয়েছেন,' হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গি করলেন ম্যাকডেভিড। 'ধরে নিলাম, আপনার কথায় সত্যতা আছে। কিন্তু এসবের সঙ্গে স্করপিয়নকে খোঁজার সম্পর্ক কি?'

'আসছি সে-কথায়,' বলল রানা। 'আটলান্টার রেডিও অপারেটর এবং কমান্ডার ম্যাসনের মেসেজের কিছু কিছু বাক্যের মধ্যে মিল রয়েছে, নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন। বলার ঢঙও একই ধরনের। এটা কি উত্তেজনার মুহূর্তে দু'জন লোকের মাঝে কথার একই রকমের মিল?' থেমে অন্যদের বোঝার সময় দিল রানা। 'এসবকিছুই সন্দেহকে একটা দিকে ঠেলে দেয়: ক্যাপ্টেন ম্যাসনের মেসেজ ভুয়া।'

'মনে হয় না,' বললেন ম্যাকডেভিড। 'গতকাল ম্যাসনের মেসেজ প্লেনে করে ওয়াশিংটনে পাঠানো হয়েছে। ন্যাভাল ইন্টেলিজেন্সের ফরজারি অফিস একঘণ্টা আগে জানিয়েছে খবরটা। কোন সন্দেহ নেই, হাতের লেখাটা ম্যাসনেরই।'

'অবশ্যই,' জোর দিয়ে বলল রানা। 'এতগুলো পাতা জাল করতে যাবে, এত বোকা নয় ওরা। আমার পরামর্শ চাইলে আপনাদের এক্সপার্টকে দিয়ে পাতাগুলোতে কলমের চাপের খাঁজ ঠিকমত আছে কিনা আবার পরীক্ষা করে দেখতে বলব। শব্দগুলো প্রিন্ট করে তার ওপর হয়তো বলপেনের কালি-ছাড়া সীস বুলিয়ে নেয়া হয়েছে।'

'ঠিক মানাচ্ছে না,' বলল রিচার্ড। 'নকল করতে হলে ম্যাসনের হাতের লেখা জোগাড় করতে হবে ওদের।'

'কিচ্ছু কঠিন কাজ না, লগবুকটা পেয়েছে ওরা, ম্যাসনের লেখা চিঠিপত্র কিংবা একটা ডায়েরী পেতে পারে সহজেই। মেসেজ ক্যাপসুলে পাওয়া লগবুকের কয়েকটা পাতা নেই, খেয়াল করেছেন নিশ্চয়। দরকারী শব্দ আর অক্ষর কেটে নিয়ে পরপর সেঁটে বাক্য তৈরি করেছে। ফটো কপি করে তারপর ছাপিয়ে নিয়েছে। ছাপার ওপর বলপেনের সীস বুলিয়ে নিয়েছে। হতে পারে না এরকম?'

চিন্তিত দেখাচ্ছে অ্যাডমিরালকে, কিন্তু গলায় কোন রকম ভাবান্তর নেই। 'ম্যাসনের মেসেজের খাপছাড়া অদ্ভুত কথাবার্তার এবার মনে হয় একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে।' একটা ছায়া ফুটল ম্যাকডেভিডের চোখে। মাথা নাড়লেন তিনি। 'কিন্তু এই ব্যাখ্যা থেকে ক্যাপ্টেন আর তার নাবিকদের কোন হদিস বের করা যাচ্ছে না।'

চেয়ার থেকে উঠে দেয়ালে টাঙানো ম্যাপের কাছে এগিয়ে গেল রানা। 'পার্ল হারবারে মেসেজ পাঠাতে কি কোনরকম কোড ব্যবহার করেছিল স্করপিয়ন?'

জানতে চাইল সে।

'কোড মেশিনই বসানো হয়নি স্করপিয়নে,' জবাব দিলেন অ্যাডমিরাল। 'ধরতে গেলে আমাদের পানিতেই একটা পরীক্ষামূলক মহড়ায় বেরিয়েছিল সাবমেরিনটা। টপ সিক্রেট ট্র্যান্সমিশনের কোন দরকার মনে করেনি নেভি।'

'একটা নিউক্লিয়ার সাবমেরিন রেডিওতে খোলাখুলি আলাপ করেছে, কথাটা বিশ্বাসই হতে চায় না,' বলল রানা।

'স্টেশনে থাকলে কিংবা প্যাট্রোলে বেরোলে কড়াকড়ি নীরবতা পালন করে সাবমেরিন। কিন্তু স্করপিয়ন একটা অপরীক্ষিত আনকোরা নতুন জাহাজ। প্রতি দুই ঘণ্টা পর পর বেসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছিল ওটাকে শুধু একটাই কারণে, যদি যন্ত্রপাতিতে কোন গোলমাল ঘটে যায়! প্রথম মহড়া পাঁচদিনের জন্যে নির্দিষ্ট হয়েছিল। রাশানরা রেডিও কল রিসিভ করে, ইলেকট্রনিক স্পাই গিয়ারে সাজানো জাহাজ পাঠিয়ে তাড়া করতে করতে পার্ল হারবারের দিকে রওনা হয়ে পড়বে স্করপিয়ন। এই ছিল ধারণা।'

ম্যাপের দিকে তাকিয়ে রয়েছে রানা। 'এই লাল চিহ্নটা কি নির্দেশ করছে?'

'ক্যাপ্টেন ম্যাসনের মেসেজে জানানো পজিশন। তার কথামত এখন ওখানেই থাকার কথা স্করপিয়নের।'

'আর এই যে পর পর কালো রঙের সঙ্কেতগুলো, স্যার? স্করপিয়নের শেষ পজিশন রিপোর্ট, না?'

'ঠিকই ধরেছেন।'

'সবচেয়ে ওপরের চিহ্নটাই তাহলে ম্যাসনের শেষ বোনাফাইড মেসেজ?'

মাথা ঝাঁকাল ম্যাকডেভিড।

অ্যাডমিরালের ডেস্কে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ম্যাপের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল রানা। সোজা হয়ে দাঁড়াল। ওপরের কালো চিহ্নটার ওপর আঙুল ছোঁয়াল। 'এখান থেকে শুরু করে কোন্দিকে কতদূর ছড়িয়ে তল্লাশী চালিয়েছেন আপনারা?'

'উত্তর-পুবে তিনশো মাইল সার্কেলের ভেতরে সমস্ত জায়গায়,' জবাবটা দিল রিচার্ড, দু'চোখে বিস্ময়। 'কিন্তু এসব কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন?'

'বোঝার চেষ্টা করুন,' বলল রানা। 'বিশটারও বেশি জাহাজ আর তিনশো প্লেন নিয়ে ব্যাপকহারে তল্লাশী চালিয়েছেন আপনারা। কিন্তু কিচ্ছু পাননি, এমনকি তেলের সামান্য চিহ্নও না। ম্যাগনেটোমিটার, সেনজিটিভ ফ্যাদোমিটার, আন্ডারওয়াটার টেলিভিশন ক্যামেরার মত আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেছেন। কিন্তু তবুও ব্যর্থ হয়েছেন পুরোপুরি। ব্যাপারটা অদ্ভুত ঠেকেনি আপনাদের কাছে?'

চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে, রানার কথার অর্থ ঠিক বুঝতে পারছেন না অ্যাডমিরাল। 'কেন ঠেকবে? কোন জলজ খাদে ঢুকে গেছে হয়তো স্করপিয়ন...'.

'কিংবা নরম বালি-কাদায় দেবে গেছে,' যোগ করল টার্নার। 'সাগরের বিশাল এক এলাকায় ছোট্ট একটা জাহাজ খোঁজা আর খড়ের গাদায় সুচ খোঁজা সমান কথা।'

'মাই ফ্রেন্ড,' হাসল রানা, 'এতক্ষণে একটা কথার মত কথা বলেছেন।'

কিছু বলল না টার্নার। হাঁ করে তাকিয়ে রইল রানার দিকে।

'ছোট্ট একটা জাহাজ,' টার্নারের কথাটাই রিপিট করল রানা। 'এত ব্যাপকহারে তল্লাশী চালিয়েও ছোট্ট একটা জাহাজকে খুঁজে বের করতে পারেননি আপনারা।'

'সুতরাং?' বরফের মত শীতল অ্যাডমিরালের কণ্ঠ।

'বুঝতে পারছেন না? হাওয়াইয়ান ভোরটেক্সের ঠিক মাঝখানে তল্লাশী চালানো উচিত ছিল আপনাদের। স্করপিয়নকে হয়তো পেতেন না, কিন্তু অন্য কিছু পেয়ে যেতেন। তিরিশটার বেশি জাহাজ ডুবেছে ওই এলাকায়।'

'আচ্ছা-আ!' রানার কথার অর্থ বুঝে গেছেন অ্যাডমিরাল। নিজের আত্মবিশ্বাসে জোর নাড়া খেয়েছেন। 'কখনও মনেই হয়নি আমাদের...'

'আপনার কথা বুঝতে পারছি,' রানাকে বলল রিচার্ড। 'কিন্তু এতে কি প্রমাণ হয়?'

'প্রমাণ হয়,' জবাব দিল রানা, 'ভুল জায়গায় তল্লাশী চালিয়েছেন আপনারা। প্রমাণ হয়, ম্যাসনের মেসেজ এক মস্ত জুয়াচুরি। এবং প্রমাণ হয়, রেডিওতে ম্যাসনের জানানো স্করপিয়নের শেষ পজিশনও এক মহা জালিয়াতি। আসলে, উত্তর-পুবে আপনাদের সাবমেরিনটাকে পাবেন না, পাবেন একেবারে উল্টোদিকে, দক্ষিণ-পশ্চিমে।'

ঘরের ভেতরে বোমা ফাটাল যেন রানা। স্তব্ধ হয়ে গেছে অন্য তিনজন।

প্রথম কথা বলে উঠল টার্নার, 'খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে!'

অ্যাডমিরালের শুকনো হাড্ডি সর্বস্ব মুখটা জ্যান্ত হয়ে উঠেছে। গভীর আগ্রহ প্রকাশ পাচ্ছে দু'চোখে। স্থির তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেয়ালের ম্যাপটার দিকে পুরো আধ মিনিট তাকিয়ে রইলেন। তারপর ঘুরে এদিকে ফিরলেন। সরাসরি তাকালেন রিচার্ডের দিকে। 'পিকারিংকে কত তাড়াতাড়ি রওনা করাতে পারবে, কমান্ডার?'

'হেলিকপ্টারটা ডেকে তুলতে হবে, তেল নিতে হবে, ডিটেকশন ইনস্ট্রুমেন্টসগুলো শেষ বারের মত চেক করতে হবে...আমার মনে হয় স্যার, রাত ন'টা নাগাদ রওনা হয়ে যেতে পারব।'

হাতঘড়ির দিকে তাকালেন অ্যাডমিরাল। 'সার্চ এরিয়ার প্লটিং করার জন্যে বেশি সময় হাতে নেই।' টার্নারের দিকে তাকালেন। 'এটা তোমার দায়িত্ব। এখুনি সার্চ গ্রিডের প্রোগ্রামিং শুরু করে দাও।'

'প্রাইমারি ডাটা টেপে উঠে গেছে, অ্যাডমিরাল। লোকেশনটা শুধু বদলে নিয়ে উল্টোদিক করে দেব।'

ক্লান্তভাবে চোখ ডললেন ম্যাকডেভিড। 'ঠিক আছে, তোমাদের ওপরই দায়িত্ব ছেড়ে দিলাম। তা, মিস্টার রানা, ওই সময়ে রওনা দিতে আশা করি আপনার কোন অসুবিধে হবে না?'

হাসল রানা। 'না।'

'গুড,' জিভ দিয়ে ঠেলে ঠোঁটের এক কোণ থেকে অন্য কোণে সিগারেট নিয়ে এলেন অ্যাডমিরাল। হঠাৎ প্রসঙ্গ পাল্টালেন। 'আচ্ছা মিস্টার রানা, একটা কথা

বলবেন কি? একজন বিদেশী হয়ে আমেরিকান সরকারের টপ ওশেনোগ্রাফিক এজেন্সীর ডিপার্টমেন্টাল হেড হলেন কি করে?'

'ওটা অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের স্নেহ। বিনা পয়সার কাজ, অনারারি পোস্ট—তাই আপনাদের কোন ডিপার্টমেন্টই কোন উচ্চবাচ্য করেনি।'

স্নেহটা খামোকা আসেনি—ভাবলেন ম্যাকডেভিড, কাজ পেয়েছে বুড়ো, উপকার পেয়েছে। হ্যামিলটনের কথাগুলো কানে বাজছে এখনও, 'এই ছেলেটির অভিধানে ''অসম্ভব'' শব্দটা খুঁজেই পাবেন না আপনি।'

আট

এক ঘণ্টা আগে সূর্য ডুবেছে। হনলুলু ডক এলাকার একটা পার্কিং স্টলের রঙিন লাইন টানা খোপের ভেতরে এসে ঢুকল এসি কোবরা। সামনের চাকার সঙ্গে কাঠের টায়ার স্টপের ছোঁয়া লাগল, ইঞ্জিন বন্ধ হয় গেল, নিভে গেল হেডলাইট। দরজা খুলে একটা পা মাটিতে নামাল রানা। গাড়ির ভেতরে অর্ধেক শরীর, অর্ধেক বাইরে। দৃষ্টি ঘোরাঘুরি করছে বন্দরের কালো পানিতে।

জাহাজ আর ডকের আলোগুলোর ওপর চোখ বোলাচ্ছে রানা, এই সময় দিক পরিবর্তন করল বাতাস। ভারী গন্ধ এসে ঝাপটা মারল নাকে। নাবিকের মনে নেশা ধরানো তেল, গ্যাসোলিন, আলকাতরা, ধোঁয়া আর লোনা পানির মিশ্র গন্ধ। রানারও ভাল লাগে এই গন্ধ, দূর-দূরান্তের বন্দরগুলোতে ঘুরে ঘুরে বেড়ানোর ইচ্ছে জাগে মনে।

গাড়ির বাইরে বেরিয়ে এল রানা। পার্কিং এলাকাটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে খুঁজল, কিন্তু মানুষজনের ছায়াও চোখে পড়ল না। একটা কাঠের স্তূপের ওপর বসে আছে একটা সী-গাল, এদিকেই তাকিয়ে। ঝুঁকে ড্রাইভিং সীটের পেছনে গুঁজে রাখা তোয়ালে মোড়ানো মাউজারটা বের করে আনল রানা। বুক ভরে টেনে নিল রাতের বাতাস। পুঁটুলিটা বগলের তলায় চেপে ধরে নিয়ে এগোল জেটি বরাবর।

চেহারা আর বেশভূষায় একজন সাধারণ নাবিক এখন রানা। পুরানো মলিন খাকি শার্ট গায়ে, পরনে রঙচটা গ্যাবার্ডিনের প্যান্ট। পায়ে তালিমারা ভারী জুতো, লেসের বদলে পাকানো সুতলি ব্যবহার করা হয়েছে। এসবই হানড্রেড অ্যান্ড ফার্স্ট ফ্লীটের সিকিউরিটি অফিসারের কাছ থেকে পেয়েছে রানা। চমৎকার ছদ্মবেশ হয়েছে।

একশো গজ পেরিয়ে এসে থামল রানা। জেটির ধারেই ভাসছে জাহাজটা, অন্ধকারে অস্পষ্ট দেখাচ্ছে বিশাল কালো শরীর। পায়ের তলায় জেটির কাঠের পাটাতন, আলকাতরা মাখানো। একটু দূরের একটা গুদামঘরের টিনের দেয়ালে ঝোলানো সবুজ-শেডে ঢাকা আলো এসে ছড়িয়ে পড়েছে পাটাতনের ওপর। ম্লান আলো আর সন্ধ্যার এই স্তব্ধ নীরবতায় জাহাজের পানিতে ভাসমান দানবীয়

আকারটা দেখলে কেমন যেন ভয় ভয় করে।

পুরানো স্টাইলের বড়সড় বারো হাজার টনী জাহাজ। ডেকে অসংখ্য মাস্তুল আর ক্রেন মরা বনের মরা গাছের মত দাঁড়িয়ে। অতীতে কোন এক সময় কালোরঙ ছিল জাহাজটার, ওয়াটার লাইনের শুরু থেকে নিচটা ছিল লাল, আজ আর সেটা বোঝা যায় না। তলাটা শ্যাওলায় ঢাকা, ওপরটাতে মরচে, তার ওপর ধুলোময়লা তো আছেই। এগিয়ে এসে জাহাজটার স্টার্নের তলায় দাঁড়াল রানা। মরচের জন্যে নামটা পর্যন্ত ভাল পড়া যায় না। তার ওপর আলো অস্পষ্ট। আগে থেকে 'পিকারিং' নামটা জানা না থাকলে পড়তেই পারত না সে।

ওপরের কালো শূন্যতার দিকে উঠে গেছে জাহাজে ওঠার সিঁড়ি। জাহাজটার কোথাও আলোর চিহ্ন নেই। খোলের গভীর থেকে ভেসে আসছে জেনারেটরের চাপা গুঞ্জন, চিমনি দিয়ে বেরোচ্ছে হালকা একটা ধোঁয়ার রেখা। মানুষের ছায়াও দেখা যাচ্ছে না জাহাজের কোথাও।

শনের দড়ি দিয়ে তৈরি হয়েছে সিঁড়ির রেলিং। খসখসে দড়ি চেপে ধরে তিরিশ ডিগ্রি কোণে উঠে যাওয়া সিঁড়ি বেয়ে উপরে চলল রানা। আকাশে চাঁদ নেই। সিঁড়ির শেষ মাথায় ডেকের কাছে গুদামঘরের আলোও এসে পৌঁছুচ্ছে না। ডেকের নির্জন ছায়াঢাকা অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে দ্বিধা করছে রানা।

'মিস্টার রানা?' অন্ধকারের আড়াল থেকে জিজ্ঞেস করল কেউ।

'হ্যাঁ, আমি মাসুদ রানা।'

'আইডেন্টিফিকেশন দেখাবেন দয়া করে?'

'দেখাতে পারি। কিন্তু কাকে দেখাচ্ছি আগে দেখতে হবে আমাকে।'

'কার্ডটা ডেকে রাখুন, স্যার। তারপর পিছিয়ে যান।'

ব্যাপারটা কি?—নিজেকে প্রশ্ন করল রানা। জরুরী অবস্থায় এভাবে কার্ড চেক করার নিয়ম আছে মিলিটারিতে। কিন্তু এখন তো তেমন কোন সময় নয়, তাছাড়া একটা পুরানো জাহাজে…? মাউজারটা আস্তে করে ডেকে নামিয়ে রাখল রানা। পকেটে হাত ঢোকাল। তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে লোকটাকে খোঁজার চেষ্টা করল, কিন্তু অন্ধকারে দৃষ্টি চলছে না। প্লাস্টিকের একটা কার্ড বের করে সামনের দিকে কয়েক ফুট দূরে ছুঁড়ে দিল। অন্ধকার ফুঁড়ে এল পেন্সিল লাইটের সরু রশ্মি, কার্ডের ওপর পড়ল। তারপর ওপরের দিকে উঠল আলোটা, রানার মুখে পড়ল।

'দুঃখিত, স্যার,' বলল লোকটা। 'অ্যাডমিরাল ম্যাকডেভিডের আদেশে কড়া নিরাপত্তা বজায় রাখতে হয় জাহাজে।' একটা কালো ছায়া কার্ডটা তুলে রানাকে ফিরিয়ে দিল। 'ডানের প্রথম সিঁড়িটা ধরে চার্টরুমে চলে যান। কমান্ডার টার্নার ওখানেই।'

'ধন্যবাদ,' ডেক থেকে মাউজারটা তুলে নিল রানা। সিঁড়ি বেয়ে ব্রিজে উঠতে লাগল। সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে অন্ধকার হুইলহাউসটা চোখে পড়ল। নির্জন। সরু প্যাসেজ ধরে এগিয়ে গিয়ে একটা দরজার সামনে থামল। এটাই চার্টরুম, অনুমান করল সে। ভেতরে জ্বলছে উজ্জ্বল আলো।

'হ্যালো, রানা,' আন্তরিক সম্বর্ধনা জানাল টার্নার। হাত নাড়ল রানার উদ্দেশে। আঙুলের ফাঁকে চেপে রাখা সিগারেটের ছাই ঝরে পড়ল চার্ট টেবিলে। 'আমেরিকান নেভির একমাত্র ভাসমান ফসিলে, স্বাগতম!'

টার্নারের গায়ে কালো পুলওভার। পরনের ডেনিম ট্রাউজারে মাটি লেগে আছে। ঠিক নাবিকের মত নয়, এই পোশাকে কেমন যেন জোকারের মত দেখাচ্ছে টার্নারকে।

সালামের ভঙ্গিতে হাত তুলল রানা। 'আপনাকে এখানে দেখব আশা করিনি, জন। আমি ভেবেছিলাম, আপনি অ্যাডমিরালের সঙ্গেই রয়েছেন।'

টার্নার হাসল। 'ওখানেই যাব। কিন্তু আপনাকে আর পলকে বিদায় জানাতে না এসে পারলাম না। শুভকামনা করছি আপনাদের।'

'ভালই করছেন। ওটা এখন খুবই দরকার। আসলে কি জানেন, যে কাজে চলেছি, তারচেয়ে খড়ের গাদায় সুচ খোঁজা অনেক সহজ।'

চার্ট টেবিলের ওপার থেকে রানার দিকে চেয়ে আছে টার্নার। রানার মুখের প্রতিটি রেখা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ করছে, এই প্রথম দেখছে যেন। এই কঠিন বিপজ্জনক কাজে কেন যাচ্ছে বিদেশী এই লোকটা অযথা? ইচ্ছে করলেই অজানা রহস্যের ঘাড়ে দায় চাপিয়ে দিয়ে নিজের ঝামেলা কমিয়ে ফেলতে পারত রানা। কিন্তু তা তো করলই না, উল্টে কাজটাকে স্বাগতম জানাল। ভোরটেক্সের অজানা রহস্যের মুখোমখি হতে যেন মজাই পাচ্ছে সে। আস্তে আস্তে যেন অনুধাবন করতে পারছে টার্নার, রানাকে এই কাজে নিয়ে মোটেই ভুল করেননি ম্যাকডেভিড। নুমার স্পেশাল প্রোজেক্ট ডাইরেক্টর আমেরিকান নয়, একজন বাংলাদেশী—একথা ভাবাই যায় না। এ থেকেই বুঝতে হবে, মাসুদ রানার মত লোক পথে ঘাটে পাওয়া যায় না।

'আচ্ছা, রানা,' হঠাৎ প্রশ্ন করল টার্নার, 'অদ্ভুত অবাস্তব কিছু রয়েছে ওখানে, বিশ্বাস হয় আপনার?'

'আপনার বসের নির্দেশ অনুযায়ী স্করপিয়নকে খুঁজে বের করে ওপরে তোলার চেষ্টা করব আমরা। সেইসাথে যদি কোন ভূতকে ধরতে পারি, সেটা বাড়তি লাভ। তাছাড়া নুমার লোকেরা বারমুডা ট্রায়াঙ্গল আর হাওয়াইয়ান ভোরটেক্স নিয়ে মাথা ঘামায় না। এই বিশেষ দায়িত্বটা সাইন্স ফিকশন লেখকদের ওপরই ছেড়ে দিয়েছি আমরা। সাগর নিয়ে কারবার নুমার, ব্যাখ্যাতীত কিছু ঘটনার সম্মুখীন যে আমরা না হয়েছি, তা নয়। তবে সে-সব নিয়ে বেশি মাথা না ঘামিয়ে নীরবে ফাইল করে রাখাই দস্তুর।'

'যেমন? কোন একটা ঘটনার উল্লেখ করতে পারেন?' জানতে চাইল টার্নার।

টেবিলে রাখা আধ-খোলা একটা চার্টের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকাল রানা। 'কয়েক বছর আগে একটা ঘটনা ঘটেছিল, জুল ভার্নের কল্পনাকেও হার মানিয়ে দেয় সে-ঘটনা। নুমার দুটো জাহাজ জাপানের অদূরে কুরাইল ট্রেঞ্চের সাগর তলে গবেষণা চালাচ্ছিল। হঠাৎই জাহাজের ইন্সট্রুমেন্টসে ধরা পড়ল, সাগরের গভীর তল দিয়ে দ্রুত ছুটে যাচ্ছে কিছু একটা। ওটার আওয়াজ ধরা পড়েছে যন্ত্রপাতিতে।

সঙ্গে সঙ্গে কাছাকাছি সরে এল দুটো জাহাজ, ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল, চালু করল সমস্ত যন্ত্রপাতি। বোঝার চেষ্টা করল নিচের জিনিসটা কি।'

'কোন একটা যন্ত্র কিংবা অপারেটর ভুল করেছিল?' বিড় বিড় করল টার্নার।

'মনে হয় না,' বলল রানা। 'নুমার গবেষকেরা নিজের নিজের কাজে এক্সপার্ট লোক। তাছাড়া আমি বলেছি দুটো জাহাজ। দুটো জাহাজের যন্ত্রপাতি আর অপারেটর একই সঙ্গে একই ভুল করতে পারে না। কোন ভুল হয়নি। সাবমেরিন, সাগর-দানব কিংবা যা-ই বলুন, কিছু একটা ছিল তখন ওখানে। উনিশ হাজার ফুট পানির তলা দিয়ে ঘণ্টায় একশো দশ মাইল গতিতে ছুটছিল ওটা।'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল টার্নার। 'আশ্চর্য! বোধ-বুদ্ধির বাইরে!'

'শুধু অর্ধেক শুনেছেন, বাকি অর্ধেক শুনে নিন আগে,' বলল রানা। 'আরেকটা জাহাজ কিউবার কাছেই কেইমেন্ট ট্রেঞ্চে গবেষণা চালাচ্ছিল। একই ধরনের ব্যাপার ধরা পড়ল এই জাহাজের যন্ত্রপাতিতেও। কেইমেন্ট আর কুরাইলের ঘটনা দুটোর ফাইল পড়েছি আমি। ডাটা দেখেছি। দুটোর সোনার গ্রাফে এক বিন্দু অমিল নেই।'

'নেভিকে জানানো হয়নি?'

'লাভ নেই। এয়ার ফোর্স যেমন ইউ এফ ও সম্পর্কে আর শুনতে চায় না, তেমনি সাগর তলার এসব আজব ঘটনার কথা শুনতে নেভি অনিচ্ছুক। তাছাড়া ওদেরকে শোনানোর মত তেমন প্রমাণ কই? আছে তো শুধু গ্রাফ পেপারে সোনারের আঁকা হিজিবিজি কিছু লাইন।' একটা চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল রানা। দুই হাত পেছনে নিয়ে তালুতে মাথা রাখল। 'তবে, একবার ভিডিও টেপে একটা ছবি তোলা গিয়েছিল। নুমার একজন জুলজিস্ট, আইসল্যান্ডের কাছে কন্টিনেন্টাল স্লোপের ধার ঘেঁষে গবেষণা চালাচ্ছিলেন। মাছের মুখ থেকে বেরোনো শব্দের রেকর্ড করছিলেন তিনি। পানির দশ হাজার ফুট নিচে একটা মাইক্রোফোন নামিয়ে দিয়েছিলেন। কানে রিসিভার লাগিয়ে শোনেন গভীর সাগরের আজব জীবনের শব্দ, মাছেদের কথাবার্তার বিচিত্র আওয়াজ, শোনেন চিংড়ির চড়চড়ে একটানা গোলমেলে আওয়াজ।

'কয়েক দিন একইভাবে পেরিয়ে গেল। হঠাৎ এক বিকেলে, মাছের কথাবার্তা আর চিংড়ির চড়চড়ানি বন্ধ হয়ে গেল। পরিবর্তে রিসিভারে ভেসে এল অন্য একটা অদ্ভুত শব্দ। মাইক্রোফোনে পেন্সিল দিয়ে টোকা মারছে যেন কেউ। বিজ্ঞানী প্রথমে ভাবলেন, এটা কোন নতুন ধরনের মাছ। কিন্তু শুনতে শুনতে মনে হলো তার, কোন ধরনের কোড ব্যবহার করছে কেউ। তাড়াতাড়ি জাহাজের রেডিও অপারেটরকে ডেকে আনালেন বিজ্ঞানী। কোড ভাঙল রেডিও অপারেটর। দেখা গেল, অঙ্কের একটা ফরমুলা কোডে জানানো হয়েছে নিচ থেকে। টোকার আওয়াজ থেমে গেল। পরক্ষণেই তীক্ষ্ণ একটা হাসির শব্দ ভেসে এল, হাসছে কেউ স্পীকারের সামনে। অবিশ্বাস্য! তাড়াতাড়ি টিভি ক্যামেরা নামিয়ে দিল নাবিকেরা। কিন্তু কয়েক সেকেন্ড দেরি করে ফেলল তারা। তলার মিহি পলিতে ঝড় উঠেছে, সাংঘাতিক নাড়া খেয়ে ঘোলা হয়ে গেছে বালি-কাদা। পরিষ্কার হতে এক ঘণ্টা

লেগে গেল। দেখা গেল, নিচে মাটির ওপর লম্বা আঁচড়ের দাগ—ক্রমে অদৃশ্য হয়ে গেছে অন্ধকারে। কিসের আঁচড় বোঝা গেল না।'

'ফরমুলাটা কিসের, বোঝা গেছে?' জিজ্ঞেস করল টার্নার।

'হ্যাঁ। সহজ একটা ইকুয়েশন। মাইক্রোফোনটা যেখানে ঝুলছিল, সেখানে পানির চাপ কত, অঙ্ক কষে বের করবার ইকুয়েশন।'

'কত?'

'প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে আড়াই টনের মত।'

চার্টরুমে নীরবতা নামল, ঠাণ্ডা দীর্ঘ নীরবতা। জাহাজের খোলের গায়ে পানি আছড়ে পড়ার মৃদু শব্দ শুনতে পাচ্ছে শুধু ওরা।

'কফি-টফি পাওয়া যাবে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিল না টার্নার। গভীর সাগরের রহস্যময় জগতে তখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে তার মন। তারপর জোর করে যেন কল্পনার জগৎ থেকে ফিরিয়ে আনল মনকে, কাঁধ ঝাঁকাল। 'নিশ্চয়,' মৃদু হাসল সে। 'পিকারিঙে ভ্রমণ করার মানে, প্যাসিফিকের সবচেয়ে উন্নত সার্ভিস উপভোগ করা।' স্টোভের ওপর থেকে কালো হয়ে আসা পুরানো একটা পাত্র তুলে নিল টার্নার। তোবড়ানো একটা টিনের কাপে কফি ঢেলে রানার দিকে এগিয়ে দিল। 'এই যে, নিন, ভ্রমণটা উপভোগ করুন।'

চার্ট টেবিলের সামনে বসে কফি খাচ্ছে ওরা, এমনি সময় খুলে গেল দরজা। ঘরে ঢুকল পল রিচার্ড। গায়ে ময়লা টি-শার্ট, পরনে রঙচটা লেভিস। পায়ের জুতোজোড়া রানারটার চাইতেও মলিন, পুরানো। পাতলা শার্টের ভেতর থেকে ফুটে রয়েছে উঁচু বুক, শক্তিশালী কাঁধ। এই প্রথম খেয়াল করল রানা, রিচার্ডের ডান বাহুর বাইরের দিকটায় উল্কি আঁকা। বিষয়বস্তু: একটা ধারাল ছুরির মাথা চামড়ায় বিঁধে আছে, রক্ত বেরোচ্ছে ফিনকি দিয়ে। তার তলায় নীল কালিতে লেখা—ডেথ বিফোর ডিজঅনার। অবাক হলো রানা। অল্প বয়েসী ছোকরা, বোকা কিংবা বদ্ধ মাতালেরাই উল্কির মোহে পড়ে যায়, কিন্তু রিচার্ডের মত লোক···ঠিক বিশ্বাস হতে চায় না।

'মুখ দেখে মনে হচ্ছে এইমাত্র ভূত দেখেছ?' টার্নারের দিকে তাকিয়ে বলল রিচার্ড। 'কি হয়েছে?'

'মহাবিশ্বের উদ্ভট সব রহস্যের সমাধান করছিলাম আমরা,' জবাব দিল টার্নার। 'এই যে, নাও পল, তোমার বিশ্ববিখ্যাত কফি একটু চেখে দেখো।' একটা ধূমায়িত মগ রিচার্ডের দিকে বাড়িয়ে ধরল সে। নাড়া খেয়ে মগ থেকে কয়েক ফোঁটা বাদামী তরল পদার্থ ছলকে পড়ল ডেকে।

হাত বাড়িয়ে মগটা নিল রিচার্ড। মগের গা বেয়ে বাইরের দিকের তলায় জমে থাকা কফি ফোঁটা ফোঁটা ঝরছে, কিন্তু সেদিকে তাকাল না সে। খাওয়াও শুরু করল না। চিন্তিতভাবে তাকিয়ে আছে রানার দিকে। রানা ওর দিকে চোখ তুলে তাকাতেই একটু হাসল, ধূমায়িত মগটা ঠোঁটে ঠেকিয়ে চুমুক দিল।

'বুড়োর কাছ থেকে আর কোন আদেশ এসেছে?' জানতে চাইল রিচার্ড।

মাথা নাড়াল টার্নার। 'আগের নির্দেশই বলবৎ রয়েছে। বিপদের চেহারা দেখার আগেই পার্ল হারবারে পালিয়ে আসতে হবে তোমাদের।'

'সেজন্যে কপালের জোর থাকতে হবে,' বলল রিচার্ড। 'পালানো তো দূরের কথা, মে-ডে পাঠানোর সুযোগই পায়নি অনেক জাহাজ।'

'তাহলে ইনশ্যুরেন্স হিসেবে রানাকে ধরে নাও। সে এবং তার হেলিকপ্টার।'

'হেলিকপ্টারের ইঞ্জিন গরম করতে সময় লাগে,' রিচার্ডের গলায় সন্দেহ।

'আমাদেরটার লাগে না,' বলল রানা। 'স্টার্ট দিয়ে চল্লিশ সেকেন্ডের মধ্যে ওকে নিয়ে উড়াল দিতে পারব আমি।' উঠে দাঁড়িয়ে মাথার ওপর হাত তুলে আড়মোড়া ভাঙল রানা। 'একটা কথা। হেলিকপ্টারটা মাত্র পনেরোজন লোক বইতে পারে। ওভারলোডিং চলবে না।'

'দরকারও নেই,' বলল টার্নার। রিচার্ডের দিকে একবার তাকিয়ে দৃষ্টি ফেরাল রানার দিকে। 'আপনি হয়তো জানেন না, দেখতে বাতিল মাল হলে কি হবে, আসলে অতটা খারাপ নয় পিকারিং। এটা চালাতে বেশি নাবিকের দরকার হয় না। কারণ, উন্নতমানের আধুনিক অটোমেটেড সেন্ট্রালাইজড কনট্রোল সিসটেম রয়েছে এই জাহাজে। ধরতে গেলে, নিজেকে নিজেই চালাতে পারে পিকারিং।'

'কিন্তু খোলের যে অবস্থা দেখলাম! মরচে...'

'জালিয়াতি, মেজর, পুরো জালিয়াতি,' হেসে উঠল টার্নার। 'এক ধরনের কেমিকেল কোটিং লাগানো হয়েছে। দেখতে একেবারে মরচের মত। রোদের মধ্যে এক ফুট দূর থেকে দেখেও বুঝতে পারবেন না যে মরচেটা আসল মরচে নয়।'

'কি দরকার ছিল এসবের?'

'আমরা চাই, বাইরে থেকে দেখে যেন বোঝা না যায় জাহাজের ভেতরটা স্যালভেজ ইকুইপমেন্টে ঠাসা।'

'ছদ্মবেশী স্যালভেজ শিপ?' আস্তে করে বলল রানা। 'নতুনত্ব আছে।'

টার্নার হাসল। 'যে-কাজে চলেছেন আপনারা, তাতেও নতুনত্ব আছে।'

'আপনার অনেক তারিফ করেছেন অ্যাডমিরাল ম্যাকডেভিড,' বলল রানা। 'ভুল করেননি, তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু, ধরুন, আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে স্করপিয়নকে খুঁজে পেলামই আমরা। এত কম লোকজন নিয়ে ওটাকে তোলা হবে কি করে?'

গম্ভীর হয়ে গেল টার্নার। 'আসলে সাবধান থাকতে হচ্ছে আমাদের। তাই সার্চ অপারেশনে এত কম নাবিক নেবার আদেশ দিয়েছেন অ্যাডমিরাল। অযথা বেশি লোকের প্রাণের ঝুঁকি নিতে চাননি। পিকারিঙের ভাগ্যও অন্য জাহাজগুলোর মত খারাপ হবে না, কে বলতে পারে! আর যদি কপালগুণে স্করপিয়নকে পেয়েই যান আপনারা, ভাবনা নেই। হেলিকপ্টার নিয়ে সহজেই হনলুলুতে পৌঁছে যেতে পারবেন আপনি। ইচ্ছেমত নাবিক আর যন্ত্রপাতি পারাপার করতে পারবেন পিকারিঙে।'

'তা ঠিক,' সায় দিল রানা। 'তবে সশস্ত্র লোকবল আরেকটু বেশি থাকলে স্বস্তি

পেতাম, এই আরকি।'

মাথা নাড়ল টার্নার। 'উপায় নেই। একটা পুরানো ট্র্যাম্প স্টীমারে অস্বাভাবিক কিছু দেখলেই সন্দেহ করে বসবে রাশানরা। ভোর হবার আগেই আমাদের লেজুড় হিসেবে লেগে যাবে তেলেনিকভ।'

ভুরু কোঁচকাল রানা। 'তেলেনিকভ?'

জবাব দিল রিচার্ড। 'ওশেনোগ্রাফিক জাহাজের ছদ্মবেশে একটা রাশান স্পাই শিপ। গত ছয় মাসে যতবার স্করপিয়নের জন্যে তল্লাশী চালানো হয়েছে, ছায়ার মত সঙ্গে লেগে ছিল জাহাজটা। ন্যাভাল ইনটেলিজেন্স জানিয়েছে, এখনও ওদিকেই কোথাও রয়েছে ওটা। সাবমেরিনটাকে খুঁজছে।' কফির মগে চুমুক দেয়ার জন্যে একটু থামল সে। 'পিকারিংকে সদাগরী জাহাজ হিসেবে চালানোর জন্যে প্রচুর চেষ্টা আর সময় ব্যয় হয়েছে। এখন আর ছদ্মবেশ নষ্ট করতে পারি না আমরা।'

'হ্যাঁ,' বলল টার্নার, 'পিকারিংকে তালাক দিয়েছে নেভি। সদাগরী জাহাজের লিস্টে নাম রেজিস্ট্রি করা হয়েছে। এবং এভাবেই থাকতে দিতে চাই আমরা এটাকে।'

'তেলেনিকভ এদিকে নাক গলাচ্ছে, নেভি জানে না?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'জানে,' জবাব দিল রিচার্ড। 'আমাদের চারটে জাহাজও রয়েছে এদিকে। উত্তর সাগরে এখনও খোঁজাখুঁজি করছে ওগুলো। সহজে হাল ছেড়ে দিতে জানে না নেভি...।' দরজায় টোকার শব্দে ফিরে চাইল সে। ডাকল, 'এসো!'

ঘরে এসে ঢুকল উনিশ-বিশ বছর বয়েসের একটা ছেলে। মাথায় সাদা টুপি, পরনে নীল ওভারঅল। সরাসরি রিচার্ডের সঙ্গে কথা বলল সে। 'এক্সকিউজ মি, স্যার। চীফ ইঞ্জিনিয়ার জানাতে বলেছেন ইঞ্জিনরুম রেডি। নাবিকদের স্ট্যান্ড বাই করে রেখেছেন বোসান।'

হাত ঘড়ির দিকে চাইল রিচার্ড। 'ঠিক আছে। ওদেরকে বলো, দশ মিনিটের মধ্যেই রওনা হচ্ছি আমরা।'

'ইয়েস, স্যার।' স্যালুট করল তরুণ নাবিক। ঘুরে বেরিয়ে চলে গেল পাইলট হাউসের উদ্দেশে।

টার্নারের দিকে তাকিয়ে সন্তুষ্টির হাসি হাসল রিচার্ড। 'মন্দ না। শিডিউলের চল্লিশ মিনিট আগেই রওনা হয়ে যাচ্ছি আমরা।'

'হেলিকপ্টারটাকে ভাল মত বাঁধাছাঁদা হয়েছে তো?' জানতে চাইল রানা।

মাথা ঝাঁকাল রিচার্ড। 'হয়েছে। দিনের বেলা ফাইনাল চেক করতে পারবেন।'

উঠে, এগিয়ে গিয়ে পোর্টহোলের কাছে মুখ রেখে দাঁড়াল রানা। টার্নারের সিগারের বিচ্ছিরি গন্ধে ঘরের বাতাস ভারী হয়ে আছে। পোর্টহোল দিয়ে আসা বাইরের বাতাস ঘরের বাতাসের চেয়ে অনেক বিশুদ্ধ।

'রানার থাকার ব্যবস্থা কোথায় হয়েছে?' রিচার্ডকে জিজ্ঞেস করল টার্নার।

'আমার ঘরের পাশের স্টেটরুমটা শুধু ভি আই পি-দের জন্যে খালি রাখি,' মুচকি হেসে জবাব দিল রিচার্ড। 'তবে রানার জন্যে স্পেশাল কনসিডারেশন

হিসেবে ওটাই বরাদ্দ করা যায়।'

ঘুরল রানা। অ্যাশট্রে থেকে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে উঠে যাওয়া ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে রইল স্থির দৃষ্টিতে। ভাবছে, লোক বাছাই করতে ভুল হয়নি অ্যাডমিরাল ম্যাকডেভিডের।

'আচ্ছা, আমি চলি এবার,' নীরবতা ভাঙল টার্নার।

'যান। রোজ চিঠি লিখব আপনাকে,' হাসল রানা।

'চিঠি লিখলে চলবে না,' টার্নারও হাসল। রিচার্ডের দিকে ফিরে বলল, 'পল, কোড জানা আছে তোমার। স্যাটেলাইটের সাহায্যে তোমাদের ওপর নজর রাখব আমি আর অ্যাডমিরাল। স্করপিয়নকে খুঁজে পেলে রেডিওতে জানিয়ে দেবে, শ্যাফট বিয়ারিং পুড়ে যাওয়ায় ইঞ্জিন বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছ। তোমাদের পজিশন সঙ্গে সঙ্গেই জেনে নিতে পারব আমরা।'

রানা আর রিচার্ডের সঙ্গে হাত মেলাল টার্নার। 'গুড লাক!' বলে অন্য দু'জন কোন কথা বলার আগেই ঘুরে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ডকে, একটা কাঠের স্তূপের গায়ে হেলান দিয়ে আরেকটা সিগারেট ধরাল টার্নার। পিকারিংকে দেখছে। জেটির বাঁধন খোলা হয়েছে জাহাজের, সিঁড়ি টেনে তুলছে নাবিকেরা।

অলস ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে দেখছে টার্নার, ধীরে ধীরে চ্যানেলের মুখের দিকে ঘুরে যাচ্ছে পিকারিঙের নাক। নিস্তব্ধতাকে আরও গভীর করে তুলেছে ইঞ্জিনের ভরাট চাপা গোঙানি।

ধীরে ধীরে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল পিকারিঙের নেভিগেশন লাইট। সোজা হয়ে দাঁড়াল টার্নার। জেটির নিচের তেলতেলে কালো শান্ত পানিতে সিগারেটের পোড়া টুকরোটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ঘুরে চলল পার্কিং লটের দিকে।

নয়

পরদিন। রেলিঙ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে রানা। নিচের নীল সাগরের দিকে তাকিয়ে প্রপেলারের পানি কেটে এগোনো দেখছে। আবহাওয়া উষ্ণ, আকাশ পরিষ্কার। উত্তর-পুব থেকে বয়ে আসছে তাজা হাওয়া।

ভাবছে রানা। গত দু'দিনে অন্তত বার দুই মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছে সে। পরিচয় হয়েছে কতগুলো বিচিত্র চরিত্রের মানুষের সঙ্গে। কঠোর স্বভাবের এক অ্যাডমিরাল, কাজ ছাড়া যে কিচ্ছু বোঝে না। হাসিখুশি কাজপাগল তাঁর দুই সহকারী, পল রিচার্ড এবং জন টার্নার। আর ক্যাপ্টেন হেই ম্যাকেঞ্জী। ওর চরিত্রটা অবশ্য এখনও ঠিক বুঝতে পারেনি রানা।

তারপর ডায়না। গতকাল দুপুরে দ্বিতীয়বার দেখা হয়েছে মেয়েটার সঙ্গে। অ্যাডমিরালের মাটির তলার অফিস থেকে বেরিয়ে হোটেলে ফেরার পথে একটা

বিশেষ জিনিস খুঁজতে ওরিয়েন্ট ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে ঢুকেছিল রানা। খরিদ্দারের ভিড় এড়িয়ে সরু প্যাসেজ ধরে এগিয়ে মোড় ঘুরেই একেবারে ডায়নার মুখোমুখি পড়ে গেল। পাশের একটা দোকান থেকে বেরিয়ে এসেছে ডায়না, হাতে ছোট প্যাকেট। রানাকে দেখতেই পায়নি।

সামনের একটা লোককে হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে ডায়নার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে রানা। ডেকেছে, 'হ্যালো, ডায়না!'

'চোখ তুলে চেয়েই আঁতকে উঠেছে ডায়না। ধূসর চোখে আতঙ্কের ছায়া ফুটেছে। দ্রুত এদিক ওদিক একবার চেয়ে পাশ কাটিয়ে সরে যাবার চেষ্টা করতেই খপ করে তার হাত চেপে ধরেছে রানা। 'ডারলিং!' অভিমান করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসা বৌকে খুঁজে পেয়েছে যেন, এমনিভাবে ধরে টেনে করিডরের নির্জন একটা জায়গায় নিয়ে এসেছে। 'সাহস আছে তোমার, ডায়না,' গলার স্বর নামিয়ে বলেছে সে, 'দশ তলার ওপর থেকে ওভাবে...'

'প্লীজ রানা,' গলাটা কেঁপে গেছে ডায়নার, 'প্লীজ...আমাকে পুলিসে ধরিয়ে দিও না।'

'কিন্তু আমাকে জানতে হবে, কেন আমার শরীরে সুচ ঢোকাতে গিয়েছিলে। কে তুমি? কি করো?'

'সব বলব, কিন্তু এখন না। বিশ্বাস করো...' আকুল মিনতি ফুটে উঠল ওর বিশাল চোখে, 'আমি...আমি, ভুল করেছিলাম।'

'ভুল করেছিলে? মানে?'

'বাধ্য হয়ে কিছু কাজ করতে হচ্ছে আমাকে...রানা, প্লীজ... বিশ্বাস করো, এক্ষুণি আমাকে যেতে হবে। আমার দেরি হয়ে গেলে মস্ত বিপদে পড়বে একজন। অন্য সময় সব কথা বলব তোমাকে...'

'বিপদ...!' নিজেকেই যেন প্রশ্ন করছে রানা। ডায়নার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আমি তোমার সাহায্যে আসতে পারি?'

রানার হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে করতে কথাটা শুনে হঠাৎ স্থির হয়ে গেল ডায়না। রানার চোখে চোখ রেখে বোঝার চেষ্টা করল ওকে।

'তুমি...তুমি সাহায্য করবে আমাকে? সত্যিই?'

'সত্যি!'

'তাহলে এখুনি যেতে দাও আমাকে। তোমার সাথে আমাকে যদি দেখে ফেলে ওদের কেউ, মারা যাবে একজন।'

'কে?'

'আমার বাবা! প্রতি মুহূর্তেই বিপদ বাড়ছে কিন্তু!' অস্থির হয়ে উঠল ডায়না। কয়েক বিন্দু ঘাম জমেছে নাকের ডগায়। 'আমাকে অনুসরণ করে এখান পর্যন্ত লোক এসেছে, দেরি দেখলে ঢুকে পড়বে স্টোরে।' রানার হাতের ওপর হাত রাখল। 'প্লীজ!'

ডায়নার আয়ত দুই চোখের দিকে তাকিয়ে রইল রানা তিন সেকেন্ড। পাশের একটা দোকানের শো-কেসের ভেতরে বসানো লাল নিওন আলো এসে পড়ছে

মেয়েটার গালে। অপরূপ লাগছে রানার।

আস্তে করে ডায়নার হাত ছেড়ে দিল। তার সেই দুর্লভ মধুর হাসি হাসল। 'ঠিক আছে, যাও,' বলেই ঘুরে দাঁড়াল।

দুই পা এগিয়েই কোটের আস্তিনে টান অনুভব করল রানা। ফিরতে হলো। মেয়েটার গভীর দুই চোখে কৃতজ্ঞতা। বলল। 'ধন্যবাদ!' বলেই আর দাঁড়াল না, ঘুরে হেঁটে চলে গেল দ্রুতপায়ে।

ভাবছে রানা···সত্যিই, আশ্চর্য আকর্ষণ! সুন্দরী নয়, অথচ অন্তরের গভীরে কোথায় যেন দোলা দেয়। রানার মনে হলো, এমন মেয়ের মোহে পড়ে সারাটা জীবন কাটিয়ে দেয়া যায়, নিশ্চিন্তে ঘর বাঁধা যায় ওকে নিয়ে—চিরকালের জন্যে। ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল ওর বুক চিরে। যা হবার নয়, তাই নিয়ে আবার ভাবছে সে।

ঝুপ করে একটা শব্দ হতেই চিন্তার সুতোটা ছিঁড়ে গেল। ঠোঁট নিচের দিকে করে তীরবেগে পানিতে ডাইভ দিয়ে পড়েছে বিশাল এক অ্যালবেট্রস। বার দুই ডানা ঝাপটাল পানিতে। তারপর শাঁ করে কোনাকুনিভাবে শূন্যে উড়ে গেল আবার। বাঁকানো ঠোঁটে কিলবিল করছে একটা রূপালী মাছ।

পাখিটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আবার ভাবনার জগতে হারিয়ে গেল রানা। আরও অনেকগুলো নাম ভিড় করছে মনে। কত মানুষ এল ওর জীবনে, কত গেল। জীবনটা খুব ছোট না কিন্তু। শেষ হয়ে গেলেই শেষ, নইলে যেন লঙ্গরখানার লাইন, শুধু আশায় আশায় এগিয়ে যাওয়া।···এলোমেলো চিন্তার মাঝেই হঠাৎ গিলটি মিঞার কথা মনে এল। জাহাজে ওঠার আগে গিলটি মিঞার সঙ্গে একবার দেখা হওয়া দরকার ছিল···আবার ফিরে এসেছে অ্যালবেট্রস। ঠোঁটে মাছটা নেই। গিলে ফেলেছে। চক্কর মারছে ঘুরে ঘুরে। সাগরের ওই জায়গাটায় নিশ্চয়ই মাছের ঝাঁক এসেছে···ঝুপ করে পড়ে আরেকটা মাছ ঠোঁটে চেপে উড়াল দিল বিশাল পাখিটা···উড়াল দিল রানার মনও। পিছিয়ে গেল পনেরো দিন, চলে গেল হাজার হাজার মাইল দূরে, সবুজে ছাওয়া সেই দেশটাতে, যে দেশটার জন্যে প্রাণ দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই তার।

দরজার নবটা ঘোরাতে গিয়ে ধক করে উঠল রানার বুকের ভেতরটা। এইখানটায় এসে এমনিই হয় বরাবর। গলা শুকিয়ে গেছে। বার দুই ঢোক গিলে আস্তে করে ঠেলে খুলে ফেলল ভারী কাঠের দরজা। বিশাল সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপাশে পুরু গদিমোড়া পিঠ-উঁচু সেই চেয়ারে ঠিক আগের মতই বসে আছেন বৃদ্ধ। অনেকদিন পর এই ঘরে ঢুকল রানা, কিন্তু মনে হচ্ছে, গতকালও এসেছে। কোন পরিবর্তন নেই। না ঘরে, না রাহাত খানের চেহারায়।

দাঁতের ফাঁকে মোটা চুরুট। রানার দিকে তাকিয়ে চা[illegible]াকা ভুরুজোড়া একটু কোঁচকালেন। তারপর মাথাটা একপাশে সামান্য [illegible] আবছা ইঙ্গিতে বসতে বললেন ওকে।

পেছনে আস্তে করে ঠেলে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে এসে একটা চেয়ারে বসে পড়ল রানা।

এক মিনিট চুপচাপ চুরুট টানলেন রাহাত খান। চোখ দুটো চঞ্চল আজ, নানানদিকে ছুটে বেড়াচ্ছে, মাঝে মাঝে এক-আধ সেকেন্ডের জন্যে স্থির হচ্ছে এসে রানার চোখে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে দারুণ অস্বস্তি বোধ করছে রানা। বার দুই বৃদ্ধের চোখের ওপর চোখ রাখার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। চোখ নামিয়ে নিয়েছে। ধবধবে সাদা কড়া ইস্তিরি করা ইজিপশিয়ান কটনের শার্ট গায়ে, গলায় হাতে বোনা চমৎকার হাওয়াইয়ান টাই। নিখুঁত নট। দারুণ লাগছে বৃদ্ধকে। বয়েসকালে নিঃসন্দেহে বহু মেয়ের রাতের ঘুম হারাম করে দিয়েছে বুড়ো, ভাবল রানা। আরও অনেকবারের মত আজও ভেবে অবাক লাগল রানার, মেয়েদের হাত এড়িয়ে এত সুদর্শন লোকটা এ-পর্যন্ত আইবুড়ো থেকে গেল কি করে?

কাউকে ভালবেসেছিল মানুষটা? বিফল হয়েছিল প্রেমে?

'তারপর?' রাহাত খানের গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বরে চমকে বাস্তবে ফিরে এল রানা। 'কেমন আছ?'

আরে! বুড়োটা দেখছি সত্যিই বুড়ো হয়ে গেছে! চাবুকটা গেল কই? মনে হচ্ছে যেন খোশগল্প আরম্ভ করতে যাচ্ছে!—ভাবল রানা। আস্তে করে গলা খাঁকারি দিল একবার। 'জ্বি, ভাল, স্যার।'

'ভাল থাকলেই ভাল,' আবার কিছুক্ষণ চুরুট ফুঁকলেন রাহাত খান। বামহাতের দুটো আঙুল দিয়ে টোকা দিলেন টেবিলের কিনারে, যেন মনে মনে উচ্চারণ করা কোন ছড়ার সাথে তাল দিচ্ছেন। তারপর আচমকা দাঁতের ফাঁক থেকে চুরুটটা বের করে জিজ্ঞেস করলেন, 'কফি খাবে?'

এবার রীতিমত ঘাবড়ে গেল রানা। ব্যাপার কি! হঠাৎ কফি! রানা জানে, মেজর জেনারেল (অবঃ) রাহাত খানের ব্যবহার পাল্টে যায় তখনই, যখন কোন গুরুতর সমস্যায় পড়ে হালে পানি না পান। ভুরু কুঁচকে, দোষারোপের ভঙ্গিতে ওর দিকে তাকালেই বুঝতে হবে ব্যাপার সিরিয়াস। বলল, 'ইয়ে, মানে, আপনি যদি খান...'

'তো গিলতে রাজি আছি, না? কথাটা সোজা করে বলতে শিখলে না আর,' হাত বাড়িয়ে ইন্টারকমের সুইচ টিপলেন রাহাত খান। 'ইলোরা, দু'কাপ।' সুইচটা অফ করে দিলেন।

ব্যস, মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকলেন বৃদ্ধ। ভেতর ভেতর ছটফট করছে রানা।

নিঃশব্দে কফি দিয়ে চলে গেল ইলোরা।

চুরুটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে রেখে কাপটা তুলে নিলেন রাহাত খান। আস্তে করে দুটো চুমুক দিয়ে নামিয়ে রাখলেন পিরিচে। আচমকা ছুঁড়ে মারলেন প্রশ্নটা, 'বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের নাম শুনেছ?'

আর কোন সন্দেহ রইল না রানার, বুড়িয়ে গেছেন রাহাত খান। রিটায়ার

করার সময় হয়ে গেছে।

'শুনেছি, স্যার,' বলল রানা। 'সাইন্স ফিকশন লেখকরা রঙচঙা গল্প লিখে বিখ্যাত করে দিয়েছে জায়গাটাকে।'

'ডেভিলস্ সী আর হাওয়াইয়ান ভোরটেক্সের নামও শুনেছ নিশ্চয়?' রানার মন্তব্যে কান না দিয়ে আবার প্রশ্ন করলেন রাহাত খান।

'শুনেছি, স্যার।'

'কি মনে হয় তোমার? সত্যিই আছে কিছু ওসব জায়গায়?'

'জানি না, স্যার। সবই কেমন অতি-কল্পনা মনে হয়। আমি বিশ্বাস করি না।'

'আমিও না,' কাপ তুলে নিয়ে আবার চুমুক দিলেন রাহাত খান। কফিটুকু শেষ করে নামিয়ে রাখলেন কাপটা। আরেকটা চুরুট ধরালেন। কষে দুটো টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়লেন।

অপেক্ষা করছে রানা। সে-ও শেষ করেছে কফি খাওয়া। চোখ তুলে তাকাতেই খেয়াল করল, রাহাত খানের কপালের পাশে একটা শিরা টিপ টিপ করছে। চমকে গেল রানা ভেতর ভেতর। না, খোশ-গল্প করতে ডাকেননি তাকে বৃদ্ধ। গুরুতর ব্যাপার কিছু ঘটেছে। আসলে কি করে শুরু করবেন, ঠিক করতে পারছেন না রাহাত খান। একটু হালকা ভাব এসেছিল রানার চেহারায়, নিমেষে দূর হয়ে গেল।

'অবসর সময়ে ওসব রহস্যগল্প পড়তে বেশ ভালই লাগে, তাই না?' আবার কথা বললেন রাহাত খান। 'জানতে ইচ্ছে করে, কি করে হারিয়ে যাচ্ছে জাহাজ-বিমান-মানুষ। ইচ্ছে করে, জোশোয়া স্লোকামের মত বোট নিয়ে বেরিয়ে পড়ি, একা। গিয়ে দেখে আসি, কি ঘটছে সাগরের ওই রহস্যময় জায়গাগুলোতে। তাই না?' থামলেন বৃদ্ধ। একটু সামনে ঝুঁকে বসলেন। 'ওসব কথা থাক।...কিন্তু ব্যাপারটা আমার ঘাড়ে এসে পড়বে, একথা ঘুণাক্ষরেও ভাবিনি।'

'কোন্ ব্যাপার, স্যার?'

রানার প্রশ্নের সরাসরি জবাব না দিয়ে প্রশ্ন করলেন রাহাত খান, 'এস. এস. তুরাগের নাম শুনেছ?'

'কিছুদিন আগে আমেরিকার কাছ থেকে যে জাহাজটা কিনেছিল বি এস সি?'

'হ্যাঁ।'

হঠাৎই বুঝে গেল রানা, কেন বারমুডা ট্রায়াঙ্গল আর সাগরের অন্যান্য রহস্যঢাকা অঞ্চলগুলোর কথা তুলেছেন রাহাত খান। আস্তে করে বলল, 'হাওয়াইয়ান ভোরটেক্স...' থেমে রাহাত খানের দিকে চাইল রানা।

'হ্যাঁ, হাওয়াইয়ান ভোরটেক্সে নিখোঁজ হয়েছে জাহাজটা।...আর কি জানো?'

'জাহাজটা নতুন কেনা হয়েছিল। ওটাই ছিল তার প্রথম ট্রিপ। অনেক টাকার মালামাল ছিল ঃ এগ্রিকালচারাল ইকুইপমেন্ট, ইলেকট্রনিকস যন্ত্রপাতি, কেমিকেলস, দরকারী ওষুধপত্র, গম ইত্যাদি জিনিস। স্যানফ্র্যান্সিসকো থেকে রওনা হয়ে বাংলাদেশে আসছিল। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের ওদিকেই কোথাও গায়েব হয়ে

যায়। অনেক খুঁজেও কোন ট্রেস পাওয়া যায়নি আর ওটার।'

'আমিও তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু সামান্য একটু ট্রেস পাওয়া গেছে এই ক'দিন আগে।'

হাঁ করে মেজর জেনারেলের দিকে তাকিয়ে রইল রানা।

টেবিলের ড্রয়ার খুলে ছোট্ট একটা জিনিস বের করলেন রাহাত খান। একটা ক্রোনোমিটার। রানাকে দেখিয়ে বললেন, 'গত পরশু আমার জন্মদিনে এটা প্রেজেন্ট করেছে রফিক। হাওয়াই থেকে পাঠিয়েছে।'

'গত পরশু...' অবাক হলো রানা। 'কিন্তু দেড় মাস আগেই তো গেল আপনার জন্মদিন। আমার যতদূর মনে পড়ে, ঢাকাতেই ছিল তখন রফিক...পার্টিতেও ছিল।'

'ঠিকই মনে আছে তোমার। ছিল। আমার জন্মদিনে এই টাইটা প্রেজেন্ট করেছিল ও,' গলার টাইটা দেখিয়ে বললেন বি সি আই—চীফ।

রাহাত খানের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল রানা। এতক্ষণে কিছু একটা আঁচ করতে শুরু করেছে সে।

'ক্রোনোমিটারটা আমার নামে উপহার পাঠিয়েই প্লেনের টিকেট কাটে রফিক। দেশে ফিরে আসছিল। অনুমান করছি, আমার সঙ্গেই কথা বলতে,' থামলেন রাহাত খান। চুরুটের আগুনের দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। 'কিন্তু হিকাম এয়ারপোর্টে যাওয়ার পথে কার-ক্র্যাশে মারা গেছে।' থমথমে গম্ভীর হয়ে উঠেছে বৃদ্ধের চেহারা।

'রফিক মারা গেছে!' প্রায় আর্তনাদ করে উঠল রানা। পরিষ্কার ভেসে উঠল ওর চেহারাটা মনের পর্দায়! খুব স্টাইল করে একটু জড়িয়ে কথা বলত ছেলেটা, মাথাটা ছিল দুষ্টবুদ্ধির আখড়া, হাসাতে হাসাতে খিল ধরিয়ে দিত পেটে।

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ চুরুট টানলেন রাহাত খান।

'আপনার ধারণা, এটা খুন?' মোলায়েম কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ, খুন। এই যে ক্রোনোমিটারটা...এটা এস.এস. তুরাগে ছিল। জাহাজ নিখোঁজ হয়ে গেছে সাগরে, ধরে নিচ্ছি ডুবে গেছে; একজন নাবিকও ফিরে আসেনি যখন, ধরে নিচ্ছি মারা গেছে সবাই। অথচ হনলুলু থেকে পাঠাল রফিক এটা। তারমানে ওখান থেকেই কিনেছে, কিংবা কোনভাবে জোগাড় করেছে। তার মারা যাবার খবর পেয়েই খোঁজ নিতে শুরু করি আমি। বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশনের কাছ থেকে ইনভয়েস, শিপিং ইন্সট্রাকশন, প্যাকিং লিস্টের কপি আনিয়েছি। এই ক্রোনোমিটারটার নাম্বার রয়েছে প্যাকিং লিস্টে। জাহাজের নাম এস. এস. তুরাগ।'

'জাহাজ ডোবার আগেই এটা চুরি হয়ে থাকতে পারে,' যুক্তি দেখাল রানা।

'অসম্ভব নয়,' সাথে সাথেই জবাব দিলেন বৃদ্ধ। 'তবে আমার তা মনে হয় না।'

কিছুক্ষণ নীরবতা। তারপর জিজ্ঞেস করল রানা, 'আমাকে এখন কি করতে হবে, স্যার?'

'হাওয়াইয়ে চলে যাও। জানতে চেষ্টা করো কেন মারা গেল রফিক। খোঁজ নাও, তুরাগ আর তার মালপত্রগুলোর কি হলো। চল্লিশ কোটি টাকার ব্যাপার।'

'কিন্তু, স্যার, বাংলাদেশের তো কোন ক্ষতি নেই। টাকা তো দেবে বীমা কোম্পানী।'

'কোম্পানীটা বাংলাদেশী। সাধারণ বীমা করপোরেশন।'

বোঝা গেল, পুরো টাকাটাই গচ্চা দিতে হয়েছে বাংলাদেশকে। কোন কথা বলল না রানা। পরবর্তী নির্দেশের জন্যে অপেক্ষা করছে।

'সোহেলের কাছে কাগজপত্র যা যা দরকার—ইনভয়েস, প্যাকিং লিস্ট, এসবের কপি পাবে। মালপত্রগুলো খুঁজে বের করতে কাজে লাগবে,' চুপ করলেন রাহাত খান। কি যেন ভাবলেন, তারপর বললেন, 'আর হ্যাঁ, গিলটি মিঞাকে নিয়ে যাও সঙ্গে, মালগুলো ট্রেস করবার কাজে ওকে ব্যবহার করতে পারবে।···কোন প্রশ্ন আছে?'

'না, স্যার···ও হ্যাঁ, কবে রওনা হব?'

'কাল ফ্লাইট আছে···কালই রওনা হয়ে যাও, তবে দু'জনে দুই পথে। একই প্লেনে একসঙ্গে যাবে না। সুবিধেমত যে-কোন দুটো দেশে চলে যাও। সেখান থেকে ভিন্ন ভিন্ন রুটে বিভিন্ন দিনে হাওয়াইয়ে গিয়ে পৌঁছুবে দু'জন। গোপনে যোগাযোগ রাখবে নিজেদের মধ্যে। কাউকে বুঝতে দিও না, একই সঙ্গে কাজ করছ তোমরা। হ্যাঁ, এসো। উইশ ইউ গুড লাক।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার।' উঠে দাঁড়াল রানা।

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের চীফ তখন টেনে নিয়েছেন একটা ফাইল, ডুবে গেছেন তার মধ্যে। মনে হয় ভুলেই গেছেন রানার অস্তিত্ব।

'মিস্টার রানা?'

বাস্তবে ফিরে এল রানা। ফিরে চাইল। ওভারঅল পরা বিশ-উনিশ বছরের তরুণ নাবিকটি দাঁড়িয়ে।

হাসল রানা। 'কি?'

অভ্যাসমাফিক স্যালুট করতে গিয়েও হাতটা সামলে নিল নাবিক। নেভির জাহাজে একজন সিভিলিয়ানের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করবে, ঠিক বুঝতে পারছে না। 'কমান্ডার পল রিচার্ড আপনাকে সালাম দিয়েছেন। উনি ব্রিজে আছেন, স্যার।'

'ঠিক আছে, যাচ্ছি আমি।'

ঘুরে হাঁটতে শুরু করল রানা। ইস্পাতের ডেক। তারপুলিনে ঢাকা হ্যাচগুলোর পাশ দিয়ে ব্রিজের দিকে চলেছে। পায়ের তলায় ইঞ্জিনের একটানা চাপা ভারী গুমগুমানি।

ইস্পাতের মই বেয়ে ব্রিজে উঠে এল রানা। হেলম্স্ম্যানের সামনে দাঁড়িয়ে আছে রিচার্ড। চোখে বিনকিউলার। জাহাজের বো-এর ওপর দিয়ে দূরের গাঢ় নীল

দিগন্তের দিকে তাকিয়ে আছে। কি মনে করে চোখ থেকে নামিয়ে আনল বিনকিউলার, টি-শার্টের নিচের অংশ দিয়ে লেন্স মুছল। লেন্সে কোনরকমের দাগ আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখল। তারপর আবার বিনকিউলার চোখে লাগিয়ে তাকাল সামনের বিস্তীর্ণ শূন্যতার দিকে।

'কি হয়েছে?' পাশে দাঁড়িয়ে জানতে চাইল রানা। জানালা দিয়ে রিচার্ড যেদিকে তাকিয়ে আছে সেদিকে তাকাল। কিন্তু কিছুই চোখে পড়ল না।

'আপনার জানা দরকার,' বলল রিচার্ড। 'নতুন সার্চ এরিয়ায় ঢুকেছি আমরা।' বাল্কহেড শেলফে বিনকিউলারটা নামিয়ে রাখল সে। একটা ট্র্যান্সমিটারের সুইচ টিপল। 'লেফটেন্যান্ট হারপার, স্কিপার বলছি। সব ইঞ্জিন বন্ধ করে দাও।' রানার দিকে তাকিয়ে বলল, 'চলুন, কাজ দেখি।'

ব্রিজের লাগোয়া সিঁড়ি বেয়ে একটা সংকীর্ণ গলিপথে নেমে এল দু'জনে। কয়েকটা কেবিন পেরিয়ে এসে একটা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দ্বিধা করল রিচার্ড। তারপর ঠেলে ভেতরে পা রাখল।

'এ ঘরটাকে জাহাজের যান্ত্রিক ব্রেন বলতে পারেন,' বলল রিচার্ড। 'আমাদের ফ্ল্যাশ গর্ডন রুম। চার টন ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি রয়েছে এখানে। মানুষের ব্রেন এর কাছে কিচ্ছু না। জাহাজ চালানোর দায়িত্ব দিলে তাও পালন করে।' রানাকে ডাকল, 'দেখতে চাইলে, আসুন।'

বেশ বড়সড় ঘর, আটশো বর্গফুটের মত হবে, অনুমান করল রানা। যন্ত্রপাতিতে বোঝাই। সাউন্ড, ভেলোসিটি এবং প্রেশার মাপার যন্ত্র, সাগরের তলায় পড়ে থাকা লোহার জিনিসের অস্তিত্ব বোঝার জন্যে রয়েছে প্রোটন প্রেসিশন ম্যাগনেটিক সেনসর, আন্ডারওয়াটার টিভি ক্যামেরার জন্যে মনিটর এবং আরও সব জটিল যন্ত্রপাতি কি নেই ঘরটায়।

টিভির পর্দার দিকে তাকাল রানা। ক্যামেরাগুলো পানি ছুঁয়েছে, ছোট ছোট ঢেউগুলো পরিষ্কার ফুটেছে পর্দায়। নেমে যাচ্ছে ক্যামেরা। পানির রঙ বদলাচ্ছে ধীরে ধীরে।

'ওই যে যন্ত্রটা দেখছেন,' একটা যন্ত্র দেখিয়ে বলল রিচার্ড, 'ওটা একটা নতুন ধরনের সোনার। পানির তলার অতি ক্ষীণ শব্দও পরিষ্কার ধরতে পারে ওটা।'

খেয়াল করছে রানা, কোন্‌টা কোন্ যন্ত্র, তাকে বুঝিয়ে দিচ্ছে, চিনিয়ে দিচ্ছে রিচার্ড, কিন্তু যন্ত্রপাতিগুলোর সামনে কাজে-রত লোকগুলোর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে না। সামাজিকতার ধার ধারে না লোকটা। তবু কি করে এত উন্নতি করল? সাহস ও প্রতিভার প্রমাণ দিয়ে, নাকি জন কেনেডির মত চেহারার গুণে?

'আর ওই যে চমৎকার জিনিসটা,' গর্বের সাথে বলল রিচার্ড, সমস্ত যন্ত্রগুলোর ব্রেন ওটা। 'সেলকো-র‍্যামসী ৮৩০০ কম্পিউটার সিসটেম।'

রানা দেখল, চওড়া একটা কী বোর্ডে বসানো সরু লম্বা একটা প্যানেল, তাতে অসংখ্য বাতি আর নব।

যন্ত্রটার দিকে ইঙ্গিত করে বলল রিচার্ড, 'এখন থেকে কাজ শুরু করবে ওটা। স্করপিয়নকে খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত পিকারিঙের ভার এখন ওই সেলকো-র‍্যামসীর

ওপর ছেড়ে দেয়া হচ্ছে।'

কী-বোর্ড অপারেটরের কাঁধের ওপর দিয়ে প্রিন্ট-আউট টেপ পরীক্ষা করল রিচার্ড। 'ইচ্ছে করলে, পার্ল হারবারে বসে একটা মাস্টার কন্ট্রোলের সাহায্যে যন্ত্রটা এবং সেইসাথে জাহাজটাকে পরিচালনা করা যায়—এ মুহূর্তে হয়তো অ্যাডমিরাল ম্যাকডেভিড আর জন ওই কন্ট্রোলের ওপরই চোখ রেখে বসে আছে। আমাদের অবস্থাও আটলান্টার নাবিকদের মত হতে পারে। বিপদের সম্ভাবনা দেখলেই, সিসটেম পাল্টে আমাদের সাহায্য ছাড়াই পিকারিংকে বন্দরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে টার্নার। কিছু নাবিককে হারাবে হয়তো হান্ড্রেড অ্যান্ড ফার্স্ট, কিন্তু জাহাজটাকে অক্ষত অবস্থায় ফিরে পাবে।'

'এই ধরনের যন্ত্র এর আগেও দেখেছি। তবে সেলকো-র‍্যামসী ৮৩০০ এই প্রথম দেখলাম,' বলল রানা।

'তাই নাকি?' রিচার্ডের চোখে তার প্রতি শ্রদ্ধা এবং সন্দেহের মিশ্রণ দেখল রানা।

'এঘরের আরও অনেক যন্ত্রপাতিই দেখেছি।'

'দেখেছেন?'

'নুমার তিনটে রিসার্চ শিপে কাজ করেছি আমি, ওগুলোতেই দেখেছি।'

'অ-অ,' জোর করে হাসল রিচার্ড। 'আমি ভেবেছিলাম নতুন কিছু দেখাচ্ছি বুঝি— মাপ করবেন,' ঘুরে, ডিটেকশনরূম অফিসারের কাছে এগিয়ে গেল সে, কিছু বলল, ফিরে এল আবার। 'আসুন, কিছু ড্রিঙ্ক করা যাক।'

'নেভি রেগুলেশনের বাইরে চলে গেল না ব্যাপারটা?' হেসে বলল রানা। রিচার্ডের এই হঠাৎ আন্তরিকতায় একটু অবাকই হয়েছে।

মুচকে হাসল রিচার্ড। হাসিতে শয়তানী মেশানো। 'ভুলে গেছেন? নামে-পরিচয়ে এটা একটা বেসামরিক সদাগরী জাহাজ।'

'ঠিক আছে, সদাগর হতে আপত্তি নেই আমার।'

সবে রওনা হয়েছে দু'জনে, এমন সময় ডাকল ডিটেকশনরূম অফিসার, 'স্কিপার, টেলিভিশন ক্যামেরা আর সোনার সেনসরগুলো পজিশনে এসেছে।'

মাথা ঝাঁকাল রিচার্ড। 'চমৎকার, খুব তাড়াতাড়ি সেরেছ, লেফটেন্যান্ট। এখুনি আবার রওনা হব আমরা।'

'আচ্ছা,' বলল রানা, 'আমাদের নিচের গভীরতা কত?'

রানার দিকে একবার চেয়ে আবার চোখ ফেরাল রিচার্ড, 'লেফটেন্যান্ট?'

ইতিমধ্যে সোনার সেনসরের ওপর ঝুঁকে পড়েছে ডিটেকশনরূম অফিসার। 'পাঁচ হাজার ছ'শো পঁচাত্তর ফুট, স্যার।'

'অস্বাভাবিক কিছু?' রানার দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল রিচার্ড।

'আরও বেশি গভীর হলেই স্বাভাবিক হত যেন,' জবাব দিল রানা। 'ওশেন ফ্লোর চার্টটা দেখি তো?'

'এই যে, স্যার,' ঘষা কাঁচে ঢাকা বিশাল চার্ট টেবিলের কাছে গিয়ে মাথার ওপরের একটা লাইট জ্বেলে দিল লেফটেন্যান্ট। বিরাট একটা চার্ট খুলে টেবিলের

ধারের সঙ্গে ক্লিপ দিয়ে আটকে দিল। 'উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরের তলার চার্ট। তেমন পরিষ্কারভাবে দেখানো হয়নি। আসলে এদিকটায় ডেপথ সাউন্ডিং অভিযান হয়েছেও খুব কম।'

হঠাৎই যেন কথাটা মনে পড়ল রিচার্ডের, 'রানা, ও লেফটেন্যান্ট স্মিথ।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। হাত ঝাঁকিয়ে দিয়ে বলল, 'গ্ল্যাড টু মীট ইউ। চার্টটা একটু দেখি?' টেবিলের কিনারে কনুইয়ের ভর রেখে ঝুঁকে দাঁড়াল সে। চার্টের দিকে নজর। 'আমাদের পজিশন কি?'

চার্টের এক জায়গায় আঙুল রাখল স্মিথ, 'বত্রিশ ডিগ্রী দশ মিনিট উত্তর, একশো একান্ন ডিগ্রী সতেরো মিনিট পশ্চিম।'

'তারমানে, ফুলারটন ফ্র্যাকচার জোন,' আস্তে করে বলল রানা।

'শুনে মনে হচ্ছে, হাড় ভাঙার ব্যাপার-স্যাপার,' টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়েছে রিচার্ডও।

'পৃথিবীর বুকের এক ধরনের ফাটল। এখান থেকে ক্যালিফোর্নিয়া কোস্টের মাঝে পানির তলায় এমন শত শত ফাটল রয়েছে।'

'আপনি ঠিকই বলেছেন, মিস্টার রানা,' বলল স্মিথ। 'এখানে গভীরতা আরও বেশি হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। চার্ট অনুযায়ী এই এলাকার গভীরতা হওয়ার কথা পনেরো হাজার ফুট।'

'কোন ডুবোপর্বত রয়েছে আমাদের তলায়?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'সামনের দিকে সাগরের তলা ক্রমেই উঠে গেছে,' শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল রিচার্ড। হিসেব করে বলল, 'এক মাইলে আড়াইশো ফুট। এতে অবাক হবার কিছু নেই। নিচে ছোট কোন ডুবোপাহাড় থাকলেও এটা ঘটতে পারে।'

মাথা নাড়ল রানা। 'চার্টে কিন্তু সেটা দেখানো নেই।'

'এখানটায় সাউন্ডিং অভিযান চালানো হয়নি হয়তো, তাই দেখানো হয়নি।'

'ঢাল এভাবে উঠে যেতে থাকলে, বেশি দূরে হবে না চূড়াটা। এটা আপনার জাহাজ, পল, কিন্তু আমার মনে হয় তদন্ত করে দেখা দরকার। মনে হয়, এদিকেই কোথাও পাওয়া যেতে পারে স্করপিয়নকে।'

'কেন? চার্টে জায়গাটার উল্লেখ নেই বলে?'

'হ্যাঁ।'

'আনচার্টেড এমন আরও বহু জায়গা রয়েছে এদিকে,' ক্লান্ত ভঙ্গিতে হাত দিয়ে চোখ ডলল রিচার্ড।

'দরকার পড়লে সবকটা জায়গাই খুঁজতে হবে।'

চিন্তিত দেখাচ্ছে রিচার্ডকে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ঘুরল। 'লেফটেন্যান্ট হাই গ্রাউন্ডের দিকে একটা কোর্স প্রোগ্রাম করো। কম্পিউটারকে সেনসর রিডিং জানাও। স্টিয়ারিঙের ভার দাও সেন্ট্রালাইজড কন্ট্রোলের ওপর। গভীরতার যে কোন হঠাৎ পরিবর্তন জানাবে আমাকে। আমি কেবিনেই থাকব।' রানার দিকে ফিরে বলল, 'এবার কিছু পান করা যায়, কি বলেন?'

টিভি ক্যামেরা আর সোনার সেনসরগুলোকে বিশেষ কাজের জন্যে তৈরি করা

হলো। সেন্ট্রালাইজড কন্ট্রোল সিসটেমের দায়িত্ব দেয়া হলো কম্পিউটারকে। দশ মিনিটের মধ্যেই আবার রওনা হয়ে গেল পিকারিং। গতি ধীর। দীর্ঘ একটা অর্ধবৃত্ত রচনা করে ঘুরবে পুবে।

ব্রিজে, হুইলহাউসের দরজায় অলস ভঙ্গিতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকছে বোসান। কোন কাজ নেই তার। ধীরে, কোন অদৃশ্য হাতের কারসাজিতে যেন একবার এদিক একবার ওদিক ঘুরছে স্টিয়ারিং। ঢেউ কেটে এগিয়ে চলেছে জাহাজটা। নাবিকদের কারোই তেমন কোন কাজ নেই। অসংখ্য ডায়াল, রঙিন বাতি আর মনিটরের ওপর শুধু চোখ রাখতে হচ্ছে।

দুপুরটা ক্যাপ্টেনের কেবিনেই কাটাল রিচার্ড আর রানা। অসহ্য ধীরে কাটছে সময়। সোনারের রিডিং জানছে ওরা কেবিনে বসেই, ধীরে ধীরে উঠে যাচ্ছে তাদের নিচে সাগরের তলা। এক ঘণ্টা দু'ঘণ্টা, তারপর তিন ঘণ্টা কাটল। রিপোর্ট আর ডাটা নিয়ে মগ্ন হলো রানা। কপালগুণে যদি পাওয়াই যায় স্করপিয়নকে, কিভাবে তুলবে, প্ল্যান আঁটতে লাগল রিচার্ড।

বিকেল চাড়ে চারটে। ডেক আর ইঞ্জিনরুমের নাবিকদের অলস আলোচনায় ফিল্ম আর মেয়েমানুষ এসে পড়েছে। ডিটেকশনরুমের নাবিকেরা নীরব, মনিটর আর যন্ত্রপাতির ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছে। কেবল কিছুক্ষণ পরপর ইন্টারকমে ঘোষিত স্মিথের 'সাগরের তলা এখনও উঠছে' শব্দগুলোই যেন জাহাজটার স্বাভাবিকতা খানিকটা বজায় রেখেছে। পুরো জাহাজে অসহ্য একটা পরিবেশ। যারা জানার, জানে, ডুবে যাওয়া জাহাজ খোঁজা এক মহাবিরক্তিকর কাজ।

বিকেল পাঁচটা। হঠাৎ স্পীকারে বোমা ফাটাল যেন স্মিথের গলা, 'গত আধ মাইলে নয়শো ফুট উঠে গেছে!'

চোখাচোখি হয়ে গেল রানা আর রিচার্ডের। দু'জনেই লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল, নির্বাক। ছুটল ডিটেকশনরুমের দিকে।

চার্ট টেবিলে ঝুঁকে নোট তৈরি করছে স্মিথ। রিচার্ডকে দেখেই বলে উঠল, 'অবিশ্বাস্য ব্যাপার, স্যার! এমন কাণ্ড জীবনে দেখিনি! তীর থেকে শ' শ' মাইল দূরে রয়েছি আমরা, অথচ পানির গভীরতা মাত্র বারোশো ফুট। যতই এগোচ্ছি, কমছে আরও।'

'খুব খাড়া তো!' বলল রানা।

'হাওয়াইয়ান আইল্যান্ডের ঢালের কোন অংশ হতে পারে,' জোর নেই রিচার্ডের গলায়।

'অনেক বেশি উত্তরে রয়েছি আমরা। ওই ঢালের সঙ্গে কোন যোগাযোগ থাকা সম্ভব নয়। মনে হচ্ছে, এই খাড়াই আলাদা কিছু।'

'এগারোশো ফুট,' জোরে বলল স্মিথ।

'ইয়াল্লা! দু'ফুটে এক ফুট, এমনি হারে বাড়ছে!' মৃদু গলায় বলল রানা।

প্রায় ফিসফিসিয়ে বলল রিচার্ড, 'এইহারে চললে শিগ্গিরই চড়ায় ঠেকবে গিয়ে পিকারিং,' চরকির মত পাক খেয়ে স্মিথের দিকে ঘুরল সে। 'কম্পিউটার ডিজএনগেজ করো। ম্যানুয়েলে ফিরিয়ে আনো স্টিয়ারিং।'

পাঁচ সেকেন্ড পরেই বলল স্মিথ, 'ম্যানুয়েলে চলছে, স্যার।'

ইন্টারকম মাইক তুলে নিল রিচার্ড। 'ব্রিজ? স্কিপার বলছি। নাক বরাবর আটশো গজ দূরে কিছু দেখা যাচ্ছে?'

একটা যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর ভেসে এল স্পীকারে, 'না, স্যার। দিগন্ত পরিষ্কার।'

'হোয়াইটওয়াটারের কোন চিহ্ন?'

'না, কমান্ডার।'

রিচার্ডের দিকে তাকাল রানা। 'পানির রঙ জিজ্ঞেস করুন ওকে।'

'ব্রিজ, পানির রঙে কোন পরিবর্তন আছে?'

একটু দ্বিধার পর জবাব এল, 'সবুজ হয়ে আসছে, স্যার। পোর্ট বো-এর শ' পাঁচেক গজ বামে।'

'আটশো ফুট। এখনও উঠছে,' বলল স্মিথ।

'হুমম! রহস্য ঘন হচ্ছে,' বলল রানা। পাহাড়ের চূড়া সাগর সমতলের কাছাকাছি হলে পানির রঙ হালকা নীল হত। সবুজ, তার মানে শেওলা, ঘাস। এই এলাকার জলজ উদ্ভিদ, কেমন যেন বেমানান!'

'কোরাল?' নিজেকেই যেন প্রশ্ন করল রিচার্ড। রানার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কিন্তু কোরালে তো জলজ ঘাস জন্মাতে পারে না।'

'না। তাছাড়া এদিককার আবহাওয়াও উদ্ভিদের ঠিক উপযোগী নয়!'

'ম্যাগনেটোমিটারে একটা সলিড রিডিং পাচ্ছি,' বলে উঠল একজন কোঁকড়া সোনালী চুলের লোক।

'কোথায়?' জিজ্ঞেস করল রিচার্ড।

'দু'শো গজ দূরে। বেয়ারিং দু'শো আশি ডিগ্রি।'

'খনিজ বালু বা পাথর হতে পারে,' বলল রিচার্ড হালকা গলায়।

'তিনশো গজ দূরে আরেকটা রিডিং পাচ্ছি,' বলল সেই লোকটাই। 'বেয়ারিং তিনশো পনেরো ডিগ্রি। আরও দুটো! গ-অ-ড, আমাদের চারপাশেই ছড়িয়ে রয়েছে ওগুলো!'

'গুপ্তধন পেয়ে গেছি মনে হচ্ছে!' হাসিমুখে বলল রানা।

'সমস্ত ইঞ্জিন বন্ধ করে দাও,' ইন্টারকমে প্রায় চেঁচিয়েই উঠল রিচার্ড।

'আরও, আরও উঠছে,' উত্তেজিত গলায় বলল স্মিথ, 'চারশো পঞ্চাশ ফুট, এখনও উঠছেই।'

টিভি মনিটরের দিকে তাকাল রানা। এখনও কিছু দেখা যাচ্ছে না পর্দায়। ক্যামেরার নজর একশো ফুটেই সীমাবদ্ধ, দেখা যাবার কথাও অবশ্য নয়। হিপ পকেট থেকে রুমাল বের করে ঘাড়-মুখ মুছল সে। পুরো এয়ার কন্ডিশনড ডিটেকশনরুমে থেকেও রীতিমত ঘামছে সে। ঘামে ভেজা রুমালটা আবার ঠেলেঠুলে হিপ পকেটে ভরে নজর ফেরাল মনিটরের দিকে।

মাইক্রোফোনটা এখনও রয়েছে রিচার্ডের হাতে। ঠোঁটের কাছে তুলে নিল সে ফোনটা। শুনতে পাচ্ছে রানা, সারা জাহাজে ধ্বনিত হচ্ছে রিচার্ডের গলা। 'রিচার্ড বলছি। লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে হাওয়াইয়ান ভোরটেক্সের গোরস্থানে এসে পড়েছি

আমরা। সবাই হুঁশিয়ার! এখানে বিপদটা কি ধরনের, আমরা কেউ কিচ্ছু জানি না। কাজেই সর্বক্ষণ সতর্ক থাকতে হবে সবাইকে। তৈরি থাকা দরকার, যেন অসাবধান অবস্থায় মারা না পড়ি। রেকর্ড থেকে যা জানি, এই এলাকায় জাহাজ নিয়ে ঢুকে এতক্ষণ আস্ত রয়েছি একমাত্র আমরাই।'

মুহূর্তের জন্যেও মনিটরের দিক থেকে চোখ সরছে না রানার। ভাসতে ভাসতে সামনে এগোচ্ছে পিকারিং, সাগরতলের ছবি ফুটে উঠছে টিভি পর্দায়। পানি ভেদ করে নেমে এসেছে সূর্য রশ্মি। সরু সরু হলদে দণ্ডের মত দেখাচ্ছে। সেই আলোয় নিচের জগতের বিচিত্র রঙ আরও অপূর্ব হয়ে উঠেছে। স্থির হয়ে ভাসছে একটা ট্রিগার ফিশ। মাথার ওপর দিয়ে ভেসে যাওয়া জাহাজের বিশাল ছায়াটার দিকে সতর্ক চোখে নজর রেখেছে।

সোনালী চুলের লোকটির কাঁধে হাত রাখল রিচার্ড। 'একটার ওপর দিয়ে যখন ভেসে যাব, একই লাইনে সামনে আরও থাকলে সঙ্গে সঙ্গে জানাবে।' স্মিথের দিকে ফিরে বলল, 'ইঞ্জিন রুমের সঙ্গে কথা বলো। খুব ধীরে এগিয়ে যেতে বলো মরিসকে।'

টান টান উত্তেজনা বিরাজ করছে ডিটেকশনরুমে। দু'মিনিট পেরোল, দুই ঘণ্টার মত মনে হলো ভেতরের সবার কাছে। দীর্ঘদিন ধরে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ জাহাজের মৃতদেহগুলো দেখার জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে ওরা।

নিচে চাঁদের পিঠের মত অনুর্বর বন্ধ্যা মাটি থাকার কথা এখানে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে পাথুরে অসমতল মাটি আঁকড়ে ধরে আছে আশ্চর্য তাজা উদ্ভিদ—ফ্রন্ড কেল্প আর জলজ ঘাস। থির থির করে কাঁপছে, দুলছে এদিক ওদিক। ওপর থেকে চুঁইয়ে আসা সূর্যের আলোয় রঙ বদলাচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে। অবাক হয়ে দৃশ্যটা দেখছে রানা। একটা উদ্ভিদ বাগান যেন ডুবে গেছে সাগর তলায়—তদারকির কেউ নেই, নিজেদের ইচ্ছে মত বাড়ছে-ছড়াচ্ছে।

সোনার অপারেট করছে লম্বাচুলো এক তরুণ। উত্তেজনা চেপে রাখতে পারল না সে, চেঁচিয়ে উঠল, 'কমান্ডার! একটা জাহাজ!'

'ঠিক আছে। কম্পিউটারকে তৈরি রাখো,' আদেশ দিল রিচার্ড।

'রেকর্ড রাখবেন?' জানতে চাইল রানা।

'না, চেনার জন্যে,' জবাব দিল রিচার্ড। 'নিখোঁজ জাহাজগুলো সম্পর্কে যতটা জানা গেছে, ডাটা কালেকশন করে কম্পিউটারের মেমোরি ব্যাংকে জমানো হয়েছে। ওগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে কোন্‌টা কোন্ জাহাজ চেনার চেষ্টা করবে কম্পিউটার। আমাদেরকে জানাবে।'

'ওই যে, জাহাজটা!' বলল স্মিথ।

মনিটরের ওপর আটকে গেল তিনজোড়া দৃষ্টি। কেমন যেন ভীতিকর দৃশ্য! ভেঙেচুরে গেছে জাহাজটা। শরীরে জলজ উদ্ভিদের পুরু আস্তরণ। সামনে-পেছনের মাস্তুল দুটো সোজা উঠে গেছে ওপরের দিকে, পানি ফুঁড়ে বেরিয়ে বাতাসে মাথা জাগাবার বৃথা চেষ্টা করছে যেন। একটা মাত্র ফানেল, ছাল ক্ষয়ে গিয়ে বাদামী আস্তরণ দেখা যাচ্ছে। বাঁকাচোরা ধাতব বস্তু ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ডেকে। একটা

পোর্টহোল দিয়ে কিলবিলিয়ে বেরিয়ে এল বিশাল এক মোরে ঈল। চামড়ার রঙ সবুজাভ। ভয়ঙ্কর মুখটা খুলছে, বন্ধ করছে—সাপের মত এঁকেবেঁকে গিয়ে ঢুকে পড়ল ডেকের একটা গর্তে।

'বাবারে বাবা! ব্যাটা দশ ফুটের কম হবে না,' অবাককণ্ঠে বলল রিচার্ড।

'অত না হলেও আটের কাছাকাছি। টিভি লেন্সের ম্যাগনিফিকেশনের জন্যে একটু বেশি বড় মনে হচ্ছে,' বলল রানা।

'চোখের ভুলও হতে পারে,' বলে উঠল স্মিথ, 'কিন্তু জাহাজের হোল্ডে একটা ট্রাকটর দেখলাম যেন মনে হলো!'

কম্পিউটারের গুঞ্জনে মনোযোগ নষ্ট হলো মনিটর দর্শকদের। কম্পিউটার থেকে ছাপা হয়ে ঝুড়িতে পড়তে শুরু করেছে রীলের কাগজ। মেশিনটা বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছোঁ মারল রিচার্ড। রিল থেকে ছিঁড়ে আনল টাইপ হওয়া কাগজটুকু। জোরে পড়ল, 'সম্ভবত জাহাজটা লাইবেরিয়ান ফ্রেইটার, ওশেনিক স্টার, ৫১৩৫ টন, কার্গো: রবার এবং কৃষি যন্ত্রপাতি। নিখোঁজ হয়েছিল ১৪ জুন, ১৯৪৯ সাল।'

ডিটেকশনরুমের প্রতিটি লোক স্তব্ধ হয়ে গেল। বোবা হয়ে রিচার্ডের হাতের কাগজটার দিকে তাকিয়ে রইল সবাই। সবার মনে একটাই ভাবনা: শেষ পর্যন্ত সত্যিই হাওয়াইয়ান ভোরটেক্সের একটা শিকার খুঁজে পেল তারা!

প্রথম সচল হলো রিচার্ড। ছোঁ মেরে ক্রাডল থেকে ছিনিয়ে আনল মাইক। 'রেডিওরুম। রিচার্ড বলছি। ওপেন মেরিটাইম ফ্রিকোয়েন্সী। সেন্ড মেসেজ কোড সিক্সটিন।'

রানা বলল, 'একটু আগেভাগেই হয়ে যাচ্ছে না কাজটা? স্করপিয়নকে খুঁজে পাইনি আমরা এখনও।'

'ঠিকই বলেছেন,' একমত হলো রিচার্ড, 'তাড়াহুড়োই করছি। কিন্তু আমরা ঠিক কোথায় রয়েছি অ্যাডমিরাল ম্যাকডেভিডকে এখুনি জানিয়ে রাখা দরকার। বলা তো যায় না কিছুই।'

'গোলমাল আশা করছেন?'

'আসলে কোন ঝুঁকি নিতে চাইছি না।'

'পরের কন্ট্যাক্ট, বেয়ারিং দু'শো সাতাশি ডিগ্রি,' সোনার অপারেটরের গলা শোনা গেল এই সময়।

মনিটরের দিকে চোখ ফেরাল আবার ওরা। একটা স্টীমার দেখা যাচ্ছে পর্দায়। পেছন দিকটা এদিকে করে ঢালের ওপর পড়ে আছে স্টীমারটা। সামনের বো নিচু হয়ে হারিয়ে গেছে নীলচে-সবুজ অন্ধকারে। বিশাল চিমনির ওপর দিয়ে পেরিয়ে গেল ক্যামেরা, গোল ছিদ্র দিয়ে ভেতরের কালো অন্ধকার চোখে পড়ল। জাহাজের মাঝ বরাবর অসংখ্য পাইপ আর ভালভ। সারা গায়ে শেওলা জমেছে—এমনকি মাস্তুলের তারগুলোকেও রেহাই দেয়নি—চূড়া পর্যন্ত উঠে গেছে, কামড়ে ধরে ঝুলছে। মরা জাহাজের ক্ষত-বিক্ষত লাশটাকে নিজেদের বাড়িঘর বানিয়ে নিয়েছে নানা ধরনের মাছ আর সামুদ্রিক জীবেরা।

আবার গুঞ্জন উঠল কম্পিউটারে। রীল থেকে কাগজ ছিঁড়ে নিয়ে পড়ল রিচার্ড, 'জাপানী অয়েল ট্যাংকার, ইশিয়োমারু, ৮, ০৬ টন, সবকজন নাবিকসহ নিখোঁজ হয়েছিল, ১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৪ সাল।'

'গড!' বিড়বিড় করে উঠল স্মিথ, 'জায়গাটা সত্যিই একটা গোরস্থান!'

পরের এক ঘণ্টায় আরও ছ'টা ক্ষতবিক্ষত জাহাজের লাশ পাওয়া গেল: চারটে সদাগরী জাহাজ, একটা বিশাল স্কুনার এবং একটা ট্রলার। একটা করে জাহাজ পাওয়া যাচ্ছে, সনাক্ত করছে কম্পিউটার, উত্তেজনা বাড়ছে ডিটেকশনরুমের ভেতরে। সাংঘাতিক এক দুঃস্বপ্ন দেখছে যেন ওরা।

কানের ওপর জোরে ইয়ারফোন চেপে ধরেছে সোনার অপারেটর। গভীর মনোযোগে শুনছে কিছু, অবিশ্বাস ফুটছে চোখে। তারপর হঠাৎই সকলকে চমকে দিয়ে বলে উঠল, 'একটা সাবমেরিন পেয়েছি। বেয়ারিং একশো নব্বই ডিগ্রি,' উত্তেজনায় গলা কাঁপছে তার।

'ঠিক বলছ?' ভুরু কুঁচকে গেছে রিচার্ডের।

'নিশ্চয়ই। এর আগেও সোনারে সাবমেরিন ধরেছি আমি, কমান্ডার। এখনকারটা বিশাল।'

মাইক নিল রিচার্ড। 'ব্রিজ? আমি বলার সঙ্গে সঙ্গে সব ইঞ্জিন বন্ধ করে দেবে। নোঙর ফেলবে। খুব দ্রুত। বুঝেছ?'

'বুঝেছি, স্যার,' খসখসে ধারাল একটা গলা ভেসে এল স্পীকারে।

'গভীরতা কত?' রিচার্ডকে প্রশ্ন করে বসল রানা।

'গভীরতা?' সোনার অপারেটরকে জিজ্ঞেস করল আবার রিচার্ড।

'একশো আশি ফুট।'

দীর্ঘ এক মুহূর্ত একে অন্যের দিকে তাকিয়ে রইল রিচার্ড আর রানা। কার মনে কি ভাবনা চলছে, বুঝতে পারল দু'জনই।

'রহস্যটা আরও জটিল হলো, তাই মনে হচ্ছে না?' শান্ত রানার কণ্ঠ।

'তাই,' নরম গলায় জবাব দিল রিচার্ড। 'ম্যাসনের মেসেজ যদি ভুয়াই হবে, সঠিক গভীরতা লেখা হয়েছে কেন?'

হয়তো আরও বেশি গোল পাকানোর জন্যে। বুদ্ধিমান বন্ধুটি অনুমান করে নিয়েছে, দূর সাগরে একশো আশি ফুট গভীরতার কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। কেউ বিশ্বাস না করুক, এটাই তো চায় সে। এই যে, নিজের চোখে দেখেও তো বিশ্বাস করতে পারছি না আমরা।'

'ক্যামেরা-রেঞ্জেও এসে যাচ্ছে ওটা,' ঘোষণা করল স্মিথ। 'ওই···ওই যে, সাবমেরিনটা!'

সাবমেরিন। চলন্ত পিকারিঙের তলায় শুয়ে আছে বিশাল কালো দেহটা। অন্যান্য সাধারণ আধুনিক অ্যাটমিক সাবমেরিনের চেয়ে দ্বিগুণ বড়, অনুমান করল রানা। আকৃতি কিছুটা সিগারের মত, কিন্তু পুরোপুরি নয়। কনিং টাওয়ার কিংবা সেইলও অন্যান্য সাবমেরিনের মত নয়। ডরসাল ফিনের মত না হয়ে পিঠে একটা উঁচু ঢিবির মত বেরিয়ে আছে, এটাই সেইল। আকৃতি এবং এই ধরনের সেইল

দেখলেই বোঝা যায় সাবমেরিনটার গতিবেগ খুব বেশি হবে। তবে পেছন দিকে বসানো কন্ট্রোল প্লেন এবং খোলের নিচে ব্রোঞ্জের প্রপেলার দুটো অন্যান্য সাবমেরিনের মতই। দেখে মনে হচ্ছে, প্রশান্ত ভঙ্গিতে বালিতে শুয়ে বৈকালিক-তন্দ্রা উপভোগ করছে কোন প্রাগৈতিহাসিক দানব। কেমন এক ধরনের ভীতিকর দৃশ্য, রোমের গোড়া শিরশির করে ওঠে।

'মার্কার ফেলো,' আদেশ দিল রিচার্ড।

'মার্কার?' জানতে চাইল রানা।

'লো ফ্রিকোয়েন্সী ইলেকট্রনিক বীপার,' জবাব দিল রিচার্ড। 'এক ধরনের ওয়াটার প্রুফ ট্র্যান্সমিটার। ঝড়ের জন্যে, কিংবা অন্য কোন কারণে এলাকা ছাড়তে যদি বাধ্য হই, তবু কোন ক্ষতি নেই। সাগরের তলায় বসে বসে সঙ্কেত পাঠাতে থাকবে বীপারটা। রিসিভারে সেই সঙ্কেত ধরে আবার জায়গামত ফিরে আসতে পারব।'

'সাবমেরিনের ওপর এসে গেছি, কমান্ডার,' সোনার অপারেটর জানাল।

ইন্টারকম মাইকে চেঁচিয়ে উঠল রিচার্ড, 'সব ইঞ্জিন বন্ধ করে দাও। নোঙর ফেলো।' ঘুরে রানার দিকে তাকাল। 'নাম্বারটা দেখতে পেয়েছিলেন?'

'ওয়ান জিরো সেভেন,' বলল রানা।

'তারমানে ওটা, স্করপিয়ন,' রিচার্ডের গলায় সাবমেরিনটার প্রতি শ্রদ্ধার ভাব। 'সত্যিই দেখতে পাব জাহাজটাকে, কল্পনাও করতে পারিনি!'

'জাহাজটার কতখানি অবশিষ্ট আছে, কে জানে,' বলল স্মিথ। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখ। 'ওই লোহার কফিনে আটকে থেকে মরেছে হতভাগ্য লোকগুলো, ভাবতেই গা শিউরে উঠছে!'

'ঠিক বলেছ। আমারও একই অবস্থা,' সায় দিয়ে বলল রিচার্ড। 'অবাক কাণ্ড!'

'অবাক হবার আরও ব্যাপার আছে,' রানা বলল। 'ভালমত লক্ষ করে দেখুন।'

নোঙরের দড়িকে কেন্দ্র করে আস্তে আস্তে পাক খাচ্ছে পিকারিং। পানিতে একটা অদৃশ্য বৃত্তচাপ এঁকে স্করপিয়নের ওপর থেকে ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে তার পেছন দিকটা। টিভি ক্যামেরাগুলোর অ্যাঙ্গেল ঠিক করে আবার স্করপিয়নকে নজরে আনা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হলো রিচার্ডকে। পর্দায় পরিষ্কার ছবি ফেলার জন্যে ভালমত অ্যাডজাস্ট করা হলো ক্যামেরার লেন্সগুলোকে।

'কি সুন্দরভাবে শুয়ে আছে বালিতে! হাত বাড়িয়ে ছোঁয়া যাবে যেন,' পর্দার দিকে তাকিয়ে আপনমনেই বিড় বিড় করল রিচার্ড। 'ম্যাসন লিখেছে, সামনের দিকটা বালিতে দেবে গেছে। কিন্তু কই? এছাড়া…নাহ, অস্বাভাবিক আর কিছু দেখছি না।'

'শার্লক হোমস হতে এখনও ঢের দেরি আছে আপনার,' বলল রানা। 'অস্বাভাবিক আর কিছুই চোখে পড়ছে না?'

'বো-তে কোন রকমের জখম দেখছি না,' ধীরে ধীরে বলল রিচার্ড। 'তবে তলার দিকে ফুটো হয়েছে হয়তো। না তুললে দেখা যাবে না।'

'এতবড় জাহাজকে ডোবানোর মত ছেঁদা করতে হলে রীতিমত বিরাট বিস্ফোরণ দরকার। হাজার ফুট পানির তলায় শরীরে চুলের মত একটা ফাটলই যথেষ্ট। কিন্তু পানির ওপরে বেশ বড়সড় ফাটল না হলে, সামলে নিতে কষ্ট হবে না ওটার। আর বিস্ফোরণই যদি ঘটানো হয়ে থাকে, টুকরো-টাকরা লোহা কিংবা অন্যান্য জিনিস ছড়িয়ে থাকতই। বিস্ফোরণের পর জঞ্জাল না থেকেই পারে না। কিন্তু কই? আশেপাশে লোহার একটা টুকরোও নেই। আরও একটা আশ্চর্য ব্যাপার, বালি। কোত্থেকে এল? এতক্ষণ মাইলের পর মাইল কি দেখলাম আমরা? পাথর, শেওলা, আর ঘাস জাতীয় উদ্ভিদ ছাড়া কিচ্ছু চোখে পড়েনি। অথচ কি চমৎকার বালিতে শুয়ে আছে স্করপিয়ন!'

'জমেছে হয়তো কোন কারণে, এতে অবাক হবার কি আছে?' গলা শান্ত রাখল রিচার্ড।

'মুমূর্ষু স্করপিয়নকে এনে এখানে শোয়াবেন ক্যাপ্টেন ম্যাসন, আগে থেকেই যেন জানত ওই বালি, তাই মনে হচ্ছে না? আরও একটা ব্যাপার রয়েছে,' টিভি পর্দার আরেকটু কাছে ঝুঁকে এল রানা। 'রেকর্ড বলছে, ছয় মাস আগে ডুবেছে স্করপিয়ন। এতদিন পানির তলায় পড়ে থাকলে তার গায়ে শেওলা কিংবা অন্য কোন জলজ গাছ-গাছড়া জন্মানোর কথা। কিন্তু কই? '

রানার কথা শুনে, পর্দার দিকে চোখ তুলে তাকাল ডিটেকশনরুমের প্রতিটি লোক, দু'জন ছাড়া। সোজা রানার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে রিচার্ড আর স্মিথ। বুঝতে পারছে ওরা, কথার সত্যতা যাচাইয়ের জন্যে পর্দার দিকে তাকানোর দরকার নেই।

'খোলস দেখে যা মনে হচ্ছে,' বলল রানা, 'মাত্র কয়েকদিন আগে ডুবেছে স্করপিয়ন।'

আলতো হাতে কপাল ডলল রিচার্ড। 'চলুন ওপরে যাওয়া যাক। আলোচনাটা খোলা বাতাসেই করা যাবে।'

ব্রিজের সামনের দিকে এসে দাঁড়াল ওরা। সাগরের দিকে তাকাল রিচার্ড। সূর্য ডুবতে ঘণ্টা দু'য়েক দেরি আছে। তির্যকভাবে এসে পড়া সূর্য-রশ্মিতে এখুনি কালচে হয়ে এসেছে পানির নীল রঙ। ক্লান্ত দেখাচ্ছে রিচার্ডকে। নিচু গলায় থেমে থেমে কথা বলল সে। 'আমাদের ওপর আদেশ: স্করপিয়নকে খুঁজে বের করতে হবে। করেছি। এখন তুলতে হবে ওটাকে। হনলুলু থেকে স্যালভেজ ক্রুদের নিয়ে আসতে পারেন এবার।'

'এখন যাওয়া উচিত হবে না,' শান্ত গলায় বলল রানা।

'ভয় নেই। যথেষ্ট ডিটেকশন ইকুইপমেন্ট রয়েছে পিকারিঙে। যে-কোন দিক বা যত দূর থেকেই বিপদ আসুক, ঠিক জানতে পারব।'

'অস্ত্র নেই আপনাদের কাছে। বাধা দিতে না পারলে, জেনে কি হবে? ভোরটেক্সের কবরখানা খুঁজে পেয়েছেন, ঠিক, কিন্তু কিভাবে, কেন এই কবরের সৃষ্টি হয়েছে জানেন না কিছুই।'

'ভূত-প্রেত শয়তানের দল যখন এখনও চেহারা দেখায়নি,' হাল ছাড়ল না

রিচার্ড, 'আর দেখাবে বলে মনে হয় না।'

'এই জাহাজ আর নাবিকদের দায়িত্ব আপনার ওপর, পল। আমি উড়ে চলে গেলে পালিয়ে বাঁচার শেষ সুযোগটুকুও হারাবেন আপনারা, বুঝতে পারছেন না কেন?'

'ঠিক আছে,' শ্রাগ করল রিচার্ড। 'আপনার ইচ্ছেটা কি প্রকাশ করে ফেলুন।'

'ইচ্ছেটা জানেন আপনি,' বলল রানা। 'সাবমেরিনটাকে ছুঁয়ে দেখতে চাই আমি। যন্ত্রপাতির চোখ দিয়ে সবকিছু দেখা যায় না। শিগ্‌গিরই আঁধার নামবে। কোন বিশেষ কিছু থাকলে, অন্ধকার হবার আগেই খুঁজে বের করতে চাই।'

পড়ন্ত সূর্যটা আকাশের ঠিক কোন্‌খানে আছে দেখল একবার রিচার্ড। 'সময় বেশি নেই।'

'পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় পেলেই হয়ে যাবে আমাদের।'

'আমাদের?'

'আমি, এবং আর যে-কোন একজন। দক্ষ একজন ডাইভার দরকার। আছে? সাবমেরিন সম্পর্কে আইডিয়া থাকলে ভাল হয়।'

'নেভিগেশন অফিসার, লেফটেন্যান্ট বারোজ। চার বছর নিউক্লিয়ার সাবমেরিনে কাজ করেছে। স্কুবা-ডাইভিঙে দক্ষ।'

'শুনে ভালই মনে হচ্ছে। ঠিক আছে, ওকেই নিলাম।'

চিন্তিতভাবে রানার দিকে তাকাল রিচার্ড, 'বিশেষ ভাল ঠেকছে না।'

'কি?'

'আপনাকে নামতে দেয়াটা উচিত হচ্ছে কিনা ভাবছি। কিছু ঘটে গেলে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন পাছার চামড়া তুলে নেবেন আমার।'

শ্রাগ করল রানা। 'ঘটবে না।'

'আত্মবিশ্বাস বড় বেশি আপনার।'

'না থাকার কোন কারণ নেই। মানুষের তৈরি সবচেয়ে সেনজিটিভ ডিটেকশন ইন্সট্রুমেন্ট এখন আমার সহায়। স্করপিয়নের ধারেকাছে এইমুহূর্তে বিপজ্জনক কিছু নেই, থাকলে যন্ত্রে ধরা পড়তই। ঝুঁকিটা কোথায়?'

'ঠিক আছে,' হাল ছেড়ে দিল রিচার্ড। 'আপনাকে সাহায্য করতে বলে দিচ্ছি লেফটেন্যান্ট বারোজকে। পিকারিঙের ডানদিকে মাঝামাঝি জায়গায় ওয়াটারলাইনের ঠিক ওপরে একটা ডাইভিং হ্যাচ আছে। ওখানেই আপনার সঙ্গে দেখা করবে বারোজ। তবে আমার অনুরোধ থাকছে, নিচে নেমে, যা দেখার দেখে সঙ্গে সঙ্গে ফিরে আসবেন। শুধু চোখের দেখা, আর কিচ্ছু না।' ঘুরে পাইলট হাউসে গিয়ে ঢুকল রিচার্ড।

আগের জায়গায়ই দাঁড়িয়ে রইল রানা। চেহারা স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করছে। মাথা নাড়ল আপনমনেই। টের পায়নি রিচার্ড। ওর মনের কথা জানলে কিছুতেই নামতে দিত না পানিতে।

দশ

ভয় ভয় একটা অনুভূতি রানার মনে। অ্যাকোয়ালাঙ পরে এর আগেও বহুবার সাগরে ডুবেছে সে, অনেকবার অনেক রকম লেগেছে, কিন্তু এবারের সঙ্গে সে-সবের তুলনা হয় না। আজকের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আলাদা।

নিচে চুপচাপ শুয়ে থাকা স্করপিয়নের মাঝে কোন অস্বাভাবিকতা নেই। পানির তলায়ই এর বাস, পানির তলাতেই সাবমেরিনকে মানায় ভাল। দেখে মনে হচ্ছে রানার, যে-কোন মুহূর্তে মেইন ভেন্ট দিয়ে ব্যালাস্ট ট্যাংকের বাতাস বেরোনোর ফলে বুদ্বুদ উঠবে, ঘুরতে শুরু করবে ব্রোঞ্জের বিশাল প্রপেলার দুটো, জ্যান্ত হয়ে উঠবে স্করপিয়ন, রওনা দেবে অজানা গন্তব্যের দিকে।

সাগর-তলের মাত্র কয়েক ইঞ্চি ওপরে থেকে, স্করপিয়নের খোলস বরাবর ধীরে ধীরে সাঁতরাচ্ছে রানা আর বারোজ। খোলস ঘিরে বালিতে অদ্ভুত একটা খাঁজমত দেখা যাচ্ছে। সঙ্গে নাইকোনস আন্ডারওয়াটার ক্যামেরা নিয়ে এসেছে বারোজ। শাটার টিপল সে। পানির তলায় ফ্ল্যাশারের আলোকে মেঘলা আকাশে বিদ্যুৎ চমকের মতই মনে হলো। সবকিছুই নীরব, শুধু শ্বাস ফেলার সময় ব্রীদিং রেগুলেটর থেকে বুদ্বুদ বেরোনোর শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। উপরের দিকে উঠে যাওয়া বুদ্বুদগুলোর চারপাশে খেলে বেড়াচ্ছে রঙিন মাছের দল, তাদের এলাকায় দুটো অদ্ভুত অনুপ্রবেশকারী জীবের বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ নেই যেন।

কৌতূহল সামলাতে না পেরে কাছে এগিয়ে এল একটা কালো-হলুদ অ্যাঞ্জেল ফিশ। মাথা নাড়াচ্ছে এপাশ ওপাশ—আয়নায় নিজের রূপ দেখার সময় যেমন করে মাথা নাড়ায় সুন্দরী মেয়েরা, তেমনি। অ্যাঞ্জেল ফিশের ধার দিয়ে এঁকেবেঁকে বিচিত্র ভঙ্গিতে নাচতে নাচতে চলে গেল গোটা চল্লিশেক প্যারট ফিশ। মানুষ দু'জনের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল একটা বাদামী ছয় ফুট লম্বা হাঙর, ডাইভারদেরকে পাত্তাই দিল না। আশেপাশে প্রচুর লোভনীয় খাবার ফেলে দুটো অদ্ভুত জীবকে খাবার চিন্তাটা বোধহয় ঢোকেইনি ব্যাটার মটরদানার সমান মগজে, ভাবল রানা।

চার পাশের অপূর্ব দৃশ্য দেখার মত মানসিকতা এখন নেই রানার, সময়ও নেই। হাঙরটাকে দেখে যা-ই ভাবুক, নিজের অজান্তেই অ্যালুমিনিয়মের তৈরি লম্বা দণ্ড মত জিনিসটার ওপর হাতের চাপ জোরাল হলো।

বারোজ জিনিসটার নাম দিয়েছে, বার্ফ দা ম্যাজিক ড্রাগন। সিলিন্ডার আকৃতির একটা তিন ফুট লম্বা চোখামাথা টিউব। এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হাঙর মারার সবচেয়ে মারাত্মক অস্ত্র। স্পীয়ার গান, শার্ক রিপেলেন্ট, শটগানের ছররা পুরে মারার জন্যে ব্যাং-স্টিকস, এসবই হাঙরের বিরুদ্ধে মানুষের তৈরি বিভিন্ন অস্ত্র, কিন্তু এর কোনটাই ম্যাজিক ড্রাগনের মত এতটা কার্যকরী নয়। এই অস্ত্রটার কমার্শিয়াল

মডেল দেখেছে রানা এর আগে। ইউ এস নেভির মডেলটার চেয়ে ওটার ক্ষমতা অনেক কম। দেখতে মোটা বাঁশীর মত নিরীহ চেহারা, কিন্তু হাঙরের যম এই অস্ত্র। হাঙর খুব কাছাকাছি চলে এলে ওটার খসখসে চামড়ায় ম্যাজিক ড্রাগনের চোখা মাথাটা ঠেকিয়ে ট্রিগার টিপে দিলেই কার্বন-ডাই-অক্সাইড ভরা একটা খুদে ক্যানিস্তার ঢুকে যায় হাঙরের শরীরে। ভেতরে ঢুকে বিস্ফোরিত হয়ে যায় গ্যাস, বেলুনের মত ফুলে ওঠে পাকস্থলী। হাঙরের হাঁ করা মুখ দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে আসতে চায় দেহযন্ত্রগুলো, তবু মরে না ওটা। পানির ওপর উঠে আসে গ্যাসের টানে, তারপর তলিয়ে যায়। মাছের মত এয়ার ব্লাডার কিংবা ফুলকা নেই হাঙরের। পানিতে ভেসে থাকতে পারে না এরা। জীবনের প্রতিটা মুহূর্ত চলতে হয় এদের। চললেই মুখ দিয়ে পানি ঢুকে দু'পাশের কানকোর মত জায়গা দিয়ে বেরিয়ে যায়—এটাই ওদের অক্সিজেন নেয়ার নিয়ম। চলতে না পারলে অক্সিজেনের অভাবে মারা যায় হাঙর।

আবার ক্যামেরার শাটার টিপল বারোজ। তারপর ওপর দিকে ওঠার ইশারা করল রানাকে। ডেকের ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে সাঁতরে বন্ধ মেসেঞ্জার-বয়া হ্যাচ ছাড়িয়ে এল ওরা, একে একে ব্যালাস্ট ভেন্ট এবং মূরিং ক্লীটও পেরিয়ে এল। ফেস মাস্কের ভেতরে বারোজের চেহারা দেখতে পাচ্ছে রানা। লেফটেন্যান্টের চোখে ভয়ের ছাপ। ওর মনের কথা পড়তে পারছে সে—এই মৃত্যুপুরী ছেড়ে পালিয়ে যাবার ইচ্ছেটা জোর করে দাবিয়ে রাখছে বারোজ, ওই লোহার কফিনের ভেতরে কি আছে দেখতে চায় না সে। ক্যামেরাটা দেখাল বারোজ, তারপর ওপরের দিকে আঙুল তুলে ইঙ্গিত করল। বোঝাতে চাইছে, ফিল্ম ফুরিয়ে গেছে, কাজেই জাহাজে ফিরে যাওয়া দরকার। মাথা নেড়ে নিষেধ করল রানা। কোমরের ওয়েট বেল্টের সঙ্গে ঝোলানো চৌকোনা ছোট বোর্ডটায় গ্রীজ পেন্সিল দিয়ে ইংরেজীতে দুটো শব্দ লিখল: 'এসকেপ হ্যাচ।'

মেসেজ বোর্ডের লেখাটা পড়ল বারোজ, কব্জিতে বাঁধা ঘড়ি দেখাল রানাকে। ট্যাংকের বাতাসে আর বিশ মিনিটও চলবে না, জানে রানা, কিন্তু তবু বারোজের কথায় রাজি হলো না। বোর্ডটা আবার দেখাল তাকে, তারপর চেপে ধরল লেফটেন্যান্টের বাহু। বারোজের মাংসে রানার আঙুল প্রায় বসে যাবার জোগাড় হলো। ফেস মাস্কের ভেতরে বড় বড় হয়ে গেল লেফটেন্যান্টের চোখ। চোখ তুলে ওপরে পিকারিঙের তলার দিকে একবার তাকাল। সে জানে, টেলিভিশন ক্যামেরায় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে দু'জনকে। তবু দ্বিধা করল সে, সময় নষ্ট করছে, অক্সিজেন দ্রুত ফুরিয়ে ফেলতে চাইছে।

বারোজের মতলব বুঝতে পারছে রানা। তার বাহুতে আঙুলের চাপ আরও বাড়াল। শেষ পর্যন্ত হাতের অস্ত্রটা লেফটেন্যান্টের দিকে তাক করে ধরল সে। এইবার কাজ হলো। বুঝতে পারার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল বারোজ, দ্রুত ঘুরে স্করপিয়নের সামনের দিকে এগিয়ে গেল। লেফটেন্যান্টের এগজস্ট ভালভ থেকে এক নাগাড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে বুদ্বুদ। তার পায়ের ফিনের ঠিক পেছনেই থাকছে রানা। কয়েক সেকেন্ডেই আবার স্করপিয়নের ডেকের ওপরে চলে এল দু'জনে। অনাহূত

অতিথির হঠাৎ আগমনে চমকে উঠল একটা ভাতের থালার সমান কাঁকড়া। দ্রুত কাঁকড়া-মার্চ করে ছুটে গেল সেটা সাবমেরিনের পাশের দিকে। শেষ মাথায় পৌঁছে পিছলে গিয়ে আটপায়ের ওপর ভর দিয়ে নিরাপদে নামল নিচের বালিতে। কাঁকড়াটার মতই ভয় পেয়েছে বারোজ, অনুমান করল রানা। এসকেপ হ্যাচের দিকে তাকিয়ে লেফটেন্যান্টের শিউরে ওঠা নজর এড়াল না তার।

আবার মেসেজ বোর্ডে লিখল রানা: 'হ্যাচ খোলো।'

বোর্ড থেকে রানার মুখের দিকে দৃষ্টি ফেরাল বারোজ, আরেকবার শিউরে উঠল। আস্তে করে নিচু হলো হ্যাচের ওপরে। হ্যান্ডহুইলটা চেপে ধরল, কিন্তু মনে জোর পাচ্ছে না।

হ্যাচ কভারের ওপর ম্যাজিক ড্রাগনের মাথা দিয়ে আলতো টোকা দিল রানা। পানিতে অনেক জোরাল শোনাল টোকার আওয়াজ।

হুইলে হাতের জোর বাড়াল বারোজ। জোরে, আরও জোরে চেপে ঘোরানোর চেষ্টা করল হুইলটাকে। গলার রগ ফুলে উঠেছে, কিন্তু হুইল নড়ল না। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সে, সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল রানার দিকে।

হাত তুলে তিনটে আঙুল দেখাল রানা, তারমানে, তৃতীয় বার চেষ্টা চালিয়ে যাও। বারোজের পাশে চলে এল। ম্যাজিক ড্রাগনের বাটটা লেভার হিসেবে ব্যবহারের জন্যে হুইলের ভেতরে ঢুকিয়ে দিল। ইশারা করল বারোজের দিকে তাকিয়ে।

দু'জন লোকের গায়ের জোর ঠেকাতে পারল না হুইল, ঘুরল। প্রথমে মাত্র আধ ইঞ্চি নড়ল, কিন্তু অসুবিধে নেই আর। হেরে গেছে ওটা। ইঞ্চি ইঞ্চি করে পাক খুলতে খুলতে শেষে একেবারে হাল ছেড়ে দিল হুইলের প্যাঁচ। হ্যাচ কভারটা খুলেই সোজা এয়ারলকের ভেতরে উঁকি দিল বারোজ। বাইরের চাপ আর লকের মাঝের চাপ একই সমান, খারাপ লক্ষণ। পরিকল্পনা ভেস্তে যেতে বসেছে, অনুমান করল রানা। আর মাত্র এক মিনিটের মত বাতাস আছে। এই সময়েই শেষ চেষ্টার সিদ্ধান্ত নিল সে।

বোর্ডের লেখাগুলো মুছে ফেলল রানা। নতুন করে লিখল: 'চালাতে জানো?'

মাথা ঝাঁকাল বারোজ, ভেতরে ভেতরে কেঁপে উঠল আরেকবার। নিজের বোর্ডটা টেনে নিয়ে লিখল: 'পাওয়ার না থাকলে কোন কাজই হবে না।'

রানা লিখল: 'আছে কি নেই, দেখা দরকার।'

বাধা দিয়ে কিংবা প্রতিবাদ করে কোন লাভ হবে না, ইতিমধ্যেই বুঝে গেছে বারোজ। এক মুহূর্ত দ্বিধা করল সে, মনে মনে সাহস সঞ্চয় করল, তারপর ঢুকে পড়ল এয়ারলক কম্পার্টমেন্টের ভীতিকর অন্ধকারে। গাঢ় অন্ধকার নয় ভেতরটায়, ওপরের আলো কিছুটা ঢুকতে পারছে। এয়ার ভালভের ওপর কাজ শুরু করল বারোজ।

হ্যাচের বাইরে অপেক্ষা করছে রানা। বারোজের ইশারা পেয়েই ঢুকে পড়ল ভেতরে। হ্যাচ শক্ত করে লাগাতে সাহায্য করল লেফটেন্যান্টকে।

খোলের গায়ে লাগানো টিউব-মত একটা চেম্বার এই এসকেপ কম্পার্টমেন্ট।

একবারে ছয় জন লোকের জায়গা হয় এতে। বিপদে-পড়া জাহাজ থেকে পালানোর দরকার হলে এই ঘরে এসে ঢোকে নাবিকেরা, ইনটেরিয়র হ্যাচ সীল করে দেয়, একটা এয়ার-রিলিজ ভালভ দিয়ে পানি ভরে নেয়া হয় ঘরটাতে। ধীরে ধীরে বাইরের চাপের সঙ্গে ঘরের চাপ সমান হয়ে যায়। এক্সটেরিয়র হ্যাচটা খুলে তখন সহজেই বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে নাবিকেরা। এর উল্টোটা করতে যাচ্ছে রানা আর বারোজ। ঘরটা থেকে পানি বের করে দিয়ে স্করপিয়নের ভেতরে ঢুকতে যাচ্ছে ওরা।

পাগলামি। অন্ধকার চেম্বারে বসে পুরো ব্যাপারটাকেই নিছক পাগলামি মনে হলো বারোজের। এখন হ্যাচ বন্ধ করা কিংবা খোলা নিয়ে এত সতর্কতার কোন মানে হয় না। পুরো সাবমেরিনটাই পানিতে ভরে আছে। হ্যাচ খুলে ভেতরে ঢুকে পচা কিছু লাশ পাবে বৈ তো নয়! তাহলে অযথা সময় নষ্ট করা কেন? তাড়াতাড়ি না করলে তারা দু'জনও প্রাণে মারা পড়বে। এখন থেকে যে-কোন মুহূর্তে ফুরিয়ে যেতে পারে অক্সিজেন। রবারের স্যুটের নিচে ঘামছে সে। ভালভটা ঘুরিয়ে দিল বারোজ।

বাতাসের মৃদু চাপা শব্দ উঠল চেম্বারে, ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে পানি। ব্যাপারটা অসম্ভব!—নাকি স্বপ্ন দেখছে সে? নিজেকেই জিজ্ঞেস করল বারোজ। এমনটি ঘটার কথা তো ছিল না, কিন্তু ঘটছে। টের পাচ্ছে, পানির চাপ কমে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। ওপরের দিকে হাত বাড়িয়ে বুঝল, বাতাসে বেরিয়ে গেছে হাতটা, অর্থাৎ অনেক কমে গেছে পানি। তারপরেই টের পেল মুখ পর্যন্ত নেমে এসেছে পানি। বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠতে গিয়েও দাঁতে চেপে ধরা মাউথপিসটার কথা মনে পড়ে যাওয়ায় থেমে গেল। কিন্তু পাওয়ার যখন রয়েছে, অন্ধকারে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকার কি দরকার? সে নিশ্চিত, আশেপাশেই দেয়ালের কোথাও বসানো রয়েছে সুইচ। হাতড়াতে শুরু করল বারোজ। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে ঘষা খেয়ে হাতের চামড়া ছিলে গেল তার, কিন্তু রবারে মোড়া সুইচটাও পেয়ে গেল সেই সঙ্গে। সুইচটা ওপরের দিকে ঠেলে দিতেই উজ্জ্বল আলোর বন্যায় ভেসে গেল এসকেপ কম্পার্টমেন্ট।

গাঢ় অন্ধকারের পর অকস্মাৎ উজ্জ্বল আলোয় চোখ মিটমিট করতে লাগল বারোজ। বাল্কহেডে হেলান দিয়ে আরাম করে বসে আছে রানা। মাউথপিসটা ঝুলছে বুকের ওপর। নিশ্চিন্ত ভঙ্গি। কোথায় আছে, আশেপাশে কি ঘটছে, খবরই নেই যেন তার। সত্যিই, আজব এক লোক!—ভাবল বারোজ। তার দিকেই তাকিয়ে চোখ মিটমিট করে আলোটা চোখে সইয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে রানা।

মুখ থেকে মাউথপিসটা ছেড়ে দিল বারোজ। 'ভেতরে পানি ঢোকেনি, জানলেন কি করে আপনি?'

'অনুমান,' সহজ গলায় বলল রানা। হাসল।

'আলো, বাতাস!' বিস্ময় চাপা দিতে পারছে না বারোজ, 'তারমানে এখনও চালু আছে রি-অ্যাক্টর!'

'মনে তো হচ্ছে। চলুন দেখি।'

'চলুন।' গলার স্বর স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করে ব্যথ হলো বারোজ। কোলা ব্যাঙের আওয়াজের মত বেরোল শব্দটা। চেম্বার থেকে পানি বেরিয়ে গেছে। ইনটেরিয়র হ্যাচের দিকে তাকাল সে। চেহারা দেখে মনে হয় কল্পনার চোখে ওপাশের গলা লাশগুলো দেখতে পাচ্ছে সে।

এয়ার ট্যাংক, ফেস মাস্ক, পায়ের ফিন, সব খুলে ফেলল দু'জনে। ধরেই নিয়েছে, নিচে শ্বাস নেবার জন্য পরিষ্কার বাতাস রয়েছে।

ইঞ্চিখানেকের মত পানি জমে রয়েছে ইনটেরিয়র হ্যাচের কাছে, তার ওপরই হাঁটু গেড়ে বসল বারোজ। হ্যান্ডহুইল চেপে ধরে মোচড় দিল। সহজেই ঘুরল হুইলটা। ওপাশ থেকে বাতাস আসতে শুরু করতেই ভুড়ভুড়ি উঠল ক্যাপের চারপাশের পানিতে। ঝুঁকে সাবমেরিনের ভেতরের বাতাসে শ্বাস নিল বারোজ। বলল, 'পরিষ্কার বাতাস।'

'ক্যাপটা আরও খুলুন,' বলল রানা।

হ্যান্ডহুইল ঘোরাতে থাকল বারোজ। এসকেপ কম্পার্টমেন্টের সঙ্গে নিচের বাতাসের চাপ সমান হয়ে গেল, কুল কুল করে হ্যাচের ফাঁক গলে নিচে চলে গেল জমে থাকা পানি।

বুকের ভেতর ধক ধক করে লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ডটা, টের পাচ্ছে বারোজ। ঠাণ্ডা চিকন ঘাম জমছে রোমের গোড়ায়। খুলে হ্যাচটা হিঞ্জের ওপর খাড়া করে তুলেই এক পাশে সরে দাঁড়াল সে। রানা বললেও কিছুতেই আগে নিচে নামবে না। কিন্তু বৃথাই ভয় পেয়েছে সে। হ্যাচ খোলার সঙ্গে সঙ্গেই এগিয়ে এল রানা, সিঁড়ি বেয়ে নিচে অদৃশ্য হয়ে গেল।

উজ্জ্বল আলা জ্বলছে ফরোয়ার্ড টরপেডো কম্পার্টমেন্টে। প্রতিটি জিনিস যেখানে যেভাবে থাকার কথা, তেমনি সাজানো গোছানো রয়েছে। যেন, ঘরের সবাই এই মাত্র ওয়ার্ড রুমে গেছে তাস খেলতে, কিংবা মেসে গেছে চা-পানি খেতে। টর্পেডো টিউবের গোল দরজাগুলোতে আঁটা তামার পাত পরিষ্কার ঝকঝক করছে। স্বাভাবিক গতিতে মৃদু গুঞ্জন তুলে ঘুরছে ভেন্টিলেশন ব্লোয়ার। বাল্কহেডের দেয়ালে শুধু নিজের ছায়াই নড়তে দেখল রানা, আর কেউ নেই। পিছিয়ে এসে এসকেপ হ্যাচের দিকে মুখ তুলে ডাকল, 'বাড়িতে কেউ নেই। নেমে আসুন। ম্যাজিক ড্রাগনটা সঙ্গে আনবেন।'

না ডাকলেও পারত রানা, তার বলার আগেই সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করেছে বারোজ। ক্যামেরা এবং ম্যাজিক ড্রাগন, দুটোই সঙ্গে আছে। নেমে এসে অস্ত্রটা রানার হাতে ধরিয়ে দিয়ে ভয়ে ভয়ে চারপাশে তাকাল। কেউ নেই, শুধু তারা দু'জন। ঠিকই বলেছে রানা। ভয় দূর হয়ে গেল বারোজের চেহারা থেকে, তার জায়গায় ঠাঁই নিল বিস্ময়।

'কোথায় গেল সবাই?'

'চলুন, খুঁজে দেখি,' শান্ত গলায় বলল রানা। ক্যামেরাটার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল সে।

জোর করে হাসল বারোজ। 'রোলে এখনও আটটা ছবির জায়গা আছে। কি

আবিষ্কার করলাম আমরা দেখতে চাইবেন কমান্ডার রিচার্ড। এভাবে সাবমেরিনে ঢোকায় এমনিতেই খেপে ভোম হয়ে গেছেন!'

'সব দোষ আমি নিজের কাঁধে তুলে নেব,' বলল রানা, 'আপনার কোন ভয় নেই।'

'এসকেপ হ্যাচ খুলে আমাদেরকে সাবমেরিনে ঢুকতে দেখেছে ওরা, টিভি মনিটরে,' বারোজের কণ্ঠে অস্বস্তি।

'ওসব কথা বাদ দিন তো এখন। আগের কাজ আগে। আপনার সাহায্য দরকার আমার। গাইড করতে পারবেন তো?'

'আমি কাজ করেছি অন্য ধরনের সাধারণ সাবমেরিনে। স্করপিয়নের মত এত উন্নত সাবমেরিনের কথা পাঁচ বছর আগে ভাবতেও পারেনি কেউ। বাথরুমটা খুঁজে বের করতে বললেও পারব কিনা সন্দেহ আছে আমার।'

'আরে নাহ্, পারবেন। আমি যতদূর জানি, সব সাবমেরিনেরই ভেতরের নকশা প্রায় একই রকম। তাহলে, এর পরে কি থাকতে পারে?' আফটার বাল্কহেড দরজাটা দেখাল রানা।

'সম্ভবত সরু পথ। মিসাইল টিউবের ধার ধরে ক্রুদের মেসের দিকে চলে গেছে হয়তো।'

'ঠিক আছে। চলুন, দেখা যাক।'

বাল্কহেড দরজার ল্যাচ খুলল রানা। দেড় ফুট উঁচু চৌকাঠ পেরিয়ে বিশাল এক ঘরে পা রাখল। অনেক ওপরের ছাত। হীট এক্সচেঞ্জার টিউব, ড্রাইভ সিসটেম, জেনারেটর, বয়লার এবং দৈত্যের মত দুই টারবাইন এবং অসংখ্য পাইপের জটিল এক গোলক ধাঁধা যেন ঘরটায়। এটা পাওয়ার হাউস, অনুমান করল রানা। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে সে। তার পাশ কাটিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল বারোজ, সম্মোহিতের মত হাত বোলাতে লাগল মেশিনগুলোতে।

'মাই গড!' ফিসফিসিয়ে বলল বারোজ, 'ওরা…ওরা পারল শেষ পর্যন্ত! রি-অ্যাক্টরের সঙ্গে ইঞ্জিন রুম যোগ করে দিয়েছে, বসিয়েছে জাহাজের সামনের দিকে!'

'কোন আলাদা ঘরে রি-অ্যাক্টর বসানো থাকবে ভেবেছিলাম আমি, মারাত্মক র‍্যাডিয়েশন এড়ানোর জন্যে।'

'কন্ট্রোলের উন্নতি করেছে ওরা। রি-অ্যাক্টরের কাছে থেকে কাজ করলেও এখন আর ভয়ের কিছুই নেই। র‍্যাডিয়েশনে হাসপাতালের সাধারণ এক্স-রে মেশিন অপারেটরের সাতদিনে যতটুকু ক্ষতি হয়, এখানে এক বছর কাজ করলেও রি-অ্যাক্টর অপারেটরের ততটুকু ক্ষতি হবে না।'

বিশাল বয়লারের মত বিশ ফুট উঁচু যন্ত্রদানবটার কাছে এগিয়ে গেল বারোজ, সাবধানে লক্ষ্য করতে লাগল। তার পর হীট এক্সচেঞ্জ টিউবকে অনুসরণ করে মেইন প্রপালশন টারবাইনের কাছে গিয়ে থামল।

'স্টারবোর্ড রি-অ্যাক্টর বন্ধ করে রাখা হয়েছে,' নরম গলায় বলল বারোজ। গির্জেয় বসে কথা বলছে যেন, এমনি ভাব। 'কিন্তু রডদুটো পোর্ট রি-অ্যাক্টরের সঙ্গে

যোগ করে দেয়া হয়েছে। পাওয়ার পাওয়া যাচ্ছে এজন্যেই।'

'কেউ না দেখলে, এটা এভাবে কতদিন চলতে পারে?' জানতে চাইল রানা।

'ছয় মাস, এক বছরও হতে পারে। আনকোরা নতুন সিসটেম এটা, অনেক উন্নত। কে জানে, আরও অনেক বেশিদিনও হয়তো চলতে পারে।'

'একটা জিনিস খেয়াল করেননি, ইঞ্জিনরূমটা বড় বেশি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন?'

'তারমানে কেউ পরিষ্কার রেখেছে, আমি শিওর,' বলল স্মিথ। এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। চোখে অস্বস্তি।

'চলুন, এগোই,' বলল রানা।

একটা সিঁড়ি বেয়ে আরেকটা দরজার কাছে এসে দাঁড়াল ওরা, চৌকাঠ পেরোল। ক্রুদের মেসরূমে এসে পৌঁছেছে। এটাও বেশ বড় ঘর। লাল আর কমলা রঙের ছড়াছড়ি। লম্বা-চওড়া টেবিলগুলোতে দামী নীল টেবিল-কভার। দামী কোন হোটেলের ডাইনিংরূম যেন, সাবমেরিনের বলে মনেই হয় না। এখানেও সব কিছু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। গ্যালি স্টোভের গ্রিলগুলো ঠাণ্ডা। টেবিলে নোংরা বাসন কোসন পড়ে নেই। কোথাও ময়লা নেই এক বিন্দু। বত্রিশ ইঞ্চি লেটেস্ট মডেলের রঙিন টেলিভিশন আর বিশাল এক স্টেরিও সেটের পাশ ধরে যাবার সময় আপন মনেই হাসল রানা। তারপর হঠাৎই দাঁড়িয়ে পড়ল। একটা ধাঁধা—সমাধানটা খুঁজে পাচ্ছে না। দ্রুত চিন্তা চলল মগজে, কিন্তু নেই উত্তরটা। আবার কি সেই অদ্ভুত অবস্থাটা শুরু হয়ে গেল ব্রেনে, সেই স্মৃতিভ্রংশের মত ব্যাপারটা?

'কাগজের একটা টুকরোও নেই!' বিড়বিড় করল রানা।

'কি নেই?' চোখ তুলে রানার দিকে তাকাল বারোজ।

'কোথাও কাগজের টুকরো নেই,' আবার বলল রানা। 'এখানেই সময় কাটাত নাবিকেরা, তাই না? তাহলে তাস নেই কেন? কোন ম্যাগাজিন নেই, বই নেই, লবণ-মরিচ… চিনি… কিচ্ছু নেই…' হঠাৎই কথা থামিয়ে দ্রুত এগিয়ে গেল সে। সার্ভিং লাইনের পেছনে গ্যালিতে চলে এল। ধাক্কা মেরে সাপ্লাই লকারের দরজা খুলে ফেলল। স্টোরেজ কম্পার্টমেন্টটা একদম খালি, কিচ্ছু নেই। শুধু রান্নার সরঞ্জাম আর বাসনপত্রগুলো রয়েছে। কিন্তু ময়লা বা একবিন্দু মরচে নেই কোনটাতে। সন্তুষ্ট হয়ে মাথা ঝাঁকাল সে।

সার্ভিং লাইন কাউন্টারের ওপর দিয়ে চিন্তিতভাবে রানার দিকে তাকাল বারোজ। 'বুঝতে পারছি না। আপনার কি মনে হয়?'

'পানি ভরা হয়েছিল ঘরগুলোতে,' ধীরে ধীরে বলল রানা।

'অসম্ভব,' বলে উঠল বারোজ। 'ইঞ্জিন এবং রি-অ্যাক্টর রূমে…'

'পানির চিহ্নও নেই, বলছেন তো?' বলল রানা। 'নিউক্লিয়ার রি-অ্যাক্টরকে কাপড় শুকানোর মত শুকানো যায় না, ঠিক। কিন্তু একটা স্টোররূম কিংবা রান্নাঘর শুকিয়ে আবার আগের মত জিনিসপত্র সাজানো গোছানো যায়।' সাবধানে স্টোরেজ লকার ডোর বন্ধ করে দিল সে আবার।

দ্রুত চলে একটা লম্বা করিডর পেরিয়ে অফিসারদের ওয়ার্ডরূম, তারপর লিভিং

কম্পার্টমেন্ট এবং ক্যাপ্টেনের স্টেটরুম ছাড়িয়ে এল। ডিম আকৃতির ঘরটা তন্নতন্ন করে খুঁজল রানা। কিচ্ছু নেই। ড্রয়ারগুলো খালি। এমনকি ক্যাপ্টেন ম্যাসনের কাপড়-জামাগুলো পর্যন্ত নিখোঁজ। রানার মনে হলো, হাসপাতালের একটা কেবিনে দাঁড়িয়ে আছে। এইমাত্র কোনও ছোঁয়াচে মারাত্মক রোগে মারা গেছে রোগী। তার জামা-কাপড় আর ব্যবহৃত জিনিসপত্র ঝেঁটিয়ে বিদেয় করা হয়েছে কেবিন থেকে।

দ্রুত, নীরবে, ঘর থেকে বেরিয়ে করিডর ধরে এগিয়ে চলল রানা। আরেকটা ঘরে এসে ঢুকল, এটা মেইন কন্ট্রোলরুম। নিখুঁত সারি করে বসানো হয়েছে বিচিত্র সব ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি। আধুনিকতম সাইন্স ফিকশন ছবির পরিচালকেরও মুণ্ডু ঘুরিয়ে দেবে দৃশ্যটা। ম্যাজিক ড্রাগনটার ওপর হাতের চাপ বাড়ল রানার। পা টিপে টিপে যন্ত্রপাতির সারির মাঝ দিয়ে এগিয়ে চলল। নজর খেলছে অসংখ্য প্যানেল, স্টেনলেস স্টীলের গজ, রাডার স্কোপ, আলোকিত চার্ট এবং টেলিভিশনের পর্দার মত উজ্জ্বল পর্দার ওপর। পৃথিবীর সর্বাধুনিক সাবমেরিনের জটিল কমান্ড সেন্টারে দাঁড়িয়ে আছে, নিজেরই বিশ্বাস হচ্ছে না রানার। মনে হচ্ছে, স্করপিয়ন যেন এক ঘুমন্ত দানব। মানুষের হাত ছাড়াই গুঞ্জন করছে দেহযন্ত্রগুলো। কমান্ডের অপেক্ষায় রয়েছে শুধু। আদেশ পেলেই ঘুম ভেঙে জেগে উঠবে, সাগরের পানি তোলপাড় করে ছুটতে শুরু করবে।

যা খুঁজছিল, শেষ পর্যন্ত রেডিও রুমটা খুঁজে পেল রানা। সেই একই দৃশ্য। যন্ত্রপাতিগুলোকে দেখে মনে হচ্ছে, যে-কোন মুহূর্তে ফিরে আসবে অপারেটর। এগিয়ে গিয়ে অপারেটরের চেয়ারে বসে পড়ল রানা, কাছের ড্রয়ারটা খুলল। রেডিও অপারেশনের একটা ম্যানুয়েল পেল এই ড্রয়ারেই। নিখুঁত কাজকর্ম, ভাবল রানা, কাজের জিনিসটা ঠিক হাতের কাছেই রেখেছে। সামনে ঝুঁকল সে। ম্যানুয়েল দেখে ট্রান্সমিটারের দরকারী ডায়াল এবং সুইচগুলো ঘুরিয়ে, টিপে ঠিকঠাক করে নিল। তারপর ঘুরল বারোজের দিকে। 'অ্যান্টেনা কন্ট্রোলটা খুঁজে বের করে যতটা ওঠে, তুলে দিন।'

জিনিসটা খুঁজে বের করতে মাত্র ষাটটা সেকেন্ড ব্যয় করল বারোজ। অ্যান্টেনা তুলে দিল।

কাজ শুরু করল রানা। মাইক্রোফোন তুলে নিল হাতে। কিছুক্ষণের জন্যে আশপাশটার কথা একেবারে ভুলে গেল, আবার জাহাজে ফিরে যাবার ভাবনাটাও দূর হয়ে গেল মন থেকে। মেরিটাইম ট্রান্সমিশনে সেট করল ফ্রিকোয়েন্সী—তার মেসেজ এখন পাল হারবার বন্দর থেকেও রিসিভ করা যাবে। রেডিওতে তার কণ্ঠস্বর শুনে কিছু কিছু লোক ভূতে বিশ্বাস করতে আরম্ভ করবে, ভেবে শয়তানী হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। 'ট্রান্সমিট' লেখা বোতামটা টিপে দিল সে।

'হ্যালো, হ্যালো, পিকারিং। দিস ইজ স্করপিয়ন। আই রিপিট, স্করপিয়ন। শুনতে পাচ্ছ আমার কথা? ওভার।'

চুপ করে বসে থাকেনি পল রিচার্ড। রানা আর বারোজ স্করপিয়নের ভেতর অদৃশ্য

হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও দু'জন ডাইভারকে তৈরি হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে সে। এরা দু'জনেই ডুবুরী হিসেবে পিকারিঙের সেরা। দুটো বাড়তি এয়ার ট্যাংক নেবে ওরা সঙ্গে, রানা আর বারোজের জন্যে।

অসহায়ের মত চার্ট টেবিলে কিল মারছে রিচার্ড। স্করপিয়নে ঢুকে অনেক বেশি দেরি করে ফেলছে রানা আর বারোজ, ভাবছে সে। এসকেপ কম্পার্টমেন্টে আটকে গেল? 'ওই মাসুদ রানাই,' মনে মনে চেঁচিয়ে উঠল রিচার্ড। 'ওই ব্যাটাই সর্বনাশটা করল। এখন বারোজের জান নিয়েও টানাটানি! লাশ দুটো পেলে হয়!'

ইন্টারকমের মাইকটা চেপে ধরল রিচার্ড। 'ডাইভ প্ল্যাটফর্মেই রয়েছ তো তোমরা? পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সাবমেরিন থেকে বের করে নিয়ে আসতে হবে ওদের। জলদি যাও।'

খটাস করে আবার ক্রাডলে মাইক্রোফোন নামিয়ে রাখল রিচার্ড। টিভি মনিটরের দিকে ফিরল। চোখের দৃষ্টি ঠাণ্ডা। 'আর কতক্ষণ?'

এই নিয়ে পঞ্চাশতম বার ঘড়ির দিকে তাকাল লেফটেন্যান্ট স্মিথ। 'যদি বেশি নড়াচড়া না করে, তাহলে আর বড়জোর তিন মিনিট টিকবে। তারপর...'

থমথমে ভারী উত্তেজনা বিরাজ করছে ঘরটাতে। সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে। প্রতিটি লোকের চোখ মনিটরের পর্দায়। প্রত্যেকে জানে রানা ও বারোজের এয়ার ট্যাংক আর কয়মিনিটের বাতাস আছে।

বেরিয়ে এল ডাইভার দু'জন। মনিটরের পর্দায় দেখা যাচ্ছে, দ্রুত সাবমেরিনের কাছে নেমে যাচ্ছে ওরা। হঠাৎই ঘরের বাইরে প্যাসেজওয়েতে দৌড়ানোর আওয়াজ উঠল। ডিটেকশনরুমে যেন ছিটকে এসে ঢুকল বোসান। আরেকটু জোরে ধাক্কা দিলে হিঞ্জ থেকেই খুলে আসত দরজাটা।

'পেয়েছি ওদের।' চেঁচিয়ে উঠল বোসান। 'রেডিওতে পেয়েছি ওদের!'

'কি বলছ?' রিচার্ডও চেঁচিয়ে উঠল।

'স্করপিয়নের সঙ্গে রেডিও যোগাযোগ হয়েছে,' গলার স্বর একটু নামাল বোসান। 'ভয়েস কন্ট্যাক্ট স্যার।'

রেডিও অপারেটরের মনে হলো, বোসান রেডিওরুম থেকে বেরিয়ে যাবার পরক্ষণেই উড়ে চলে এসেছে কমান্ডার রিচার্ড। কাঁধের ওপরে লোকের সাড়া পেয়ে ফিরে চাইল রেডিওম্যান।

'বিশ্বাস করুন আর না-ই করুন, স্যার, সাবমেরিনের ভেতর থেকে মেজর রানা কথা বলছেন!'

ছোঁ মেরে রেডিওর মাইক্রোফোন তুলে নিল রিচার্ড। উত্তেজনা সামলাতে পারছে না কিছুতেই। মাইক্রোফোন তুলে কথা বলতে যেটুকু সময় ব্যয় হচ্ছে, সেটুকু সময় দেবারও ধৈর্য নেই যেন। 'স্করপিয়ন। পিকারিং বলছি। ওভার।'

অদ্ভুত চোখে স্পীকারের দিকে তাকাল রিচার্ড। তার মনে হচ্ছে, শব্দ যন্ত্রটার ভেতর দিয়ে বেরিয়ে আসবে জলজ্যান্ত রানা।

'পিকারিং, দিস ইজ স্করপিয়ন। ওভার।'

'সত্যিই আপনি মাসুদ রানা তো? ওভার।'

'কোন সন্দেহ নেই। মাসুদ রানা।'

'কেমন আছেন আপনারা?' এছাড়া আর কোন কথা খুঁজে পেল না যেন রিচার্ড, যদিও বুঝতে পারছে প্রশ্নটা বোকার মত হলো।

'বহাল তবিয়তে। বারোজ আপনাকে ভালবাসা জানাচ্ছে,' থামল ওপাশের কণ্ঠ। তারপর আবার শোনা গেল। এবার আরেকটু জোরে। 'স্করপিয়নের ভেতরে পানি নেই। আবার বলছি, স্করপিয়নের ভেতরে পানি নেই। দশজন উপযুক্ত লোক পেলেই সাবমেরিনটাকে চালিয়ে নিয়ে বাড়ি ফেরা যায়।'

'সাবমেরিনের নাবিকেরা?'

'নিখোঁজ। কোন পাত্তাই নেই ওদের। যেন ছিলই না কখনও।'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতে পারল না রিচার্ড। রানার কথাগুলোর অর্থ বোঝার, হজম করার চেষ্টা করছে। ফেলে যাওয়া একটা ভূতুড়ে জাহাজের ছবি ফোটাবার চেষ্টা করছে কল্পনায়। কোথায় রয়েছে, আশেপাশে কি ঘটছে, কিচ্ছু খেয়াল করছে না সে এখন। দরজার ওপর হুমড়ি খেয়ে আছে পিকারিঙের অর্ধেক লোক, সেদিকেও নজর নেই। অবিশ্বাসের ভাবটা কাটিয়ে উঠেই নিষ্ঠুর মর্মান্তিক সত্যটা অনুভব করতে পারল রিচার্ড।

'প্লীজ রিপিট!'

'কেউ নেই সাবমেরিনে। ফরোয়ার্ড টর্পেডো রূম থেকে মেইন কন্ট্রোল রূম পর্যন্ত ঘুরেছি। এখন অবধি কাউকে পাইনি। আফটার কম্পার্টমেন্টে এখনও খুঁজে দেখিনি। ভেতরে আলো বাতাস সব ঠিক আছে। পোর্ট-রি-অ্যাক্টর থেকে পাওয়ার সাপ্লাই হচ্ছে।'

হাঁটু কাঁপছে রিচার্ডের। দ্বিধা করল, কেশে গলা পরিষ্কার করল, তারপর বলল, 'বারোজ এবং আপনার কাজ শেষ। এসকেপ হ্যাচ দিয়ে বেরিয়ে পিকারিঙে ফিরে আসুন। এক্সট্রা এয়ারট্যাংক সহ লোক অপেক্ষা করছে আপনাদের জন্যে। লেফটেন্যান্ট বারোজ কাছাকাছি আছে?'

'না। অদেখা ঘরগুলো খুঁজে দেখতে গেছে। হাইপারিয়ন মিসাইলগুলো এখনও ঠিকমতই ক্রাডলে আছে কিনা, তা-ও দেখবে।'

'আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে, আশপাশে এক হাজার মাইলের ভেতরে সবাই আপনার কথা শুনতে পাচ্ছে?'

'শুনলেই বা কি? হাসবে ঠাট্টা মনে করে। ছয় মাস আগে হারিয়ে যাওয়া সাবমেরিন থেকে কথা বলছি, শুনলে বিশ্বাস করবে কেউ?'

'রাশানরা করবে,' থামল রিচার্ড। রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছল। 'আজকের মত আমাদের কাজ শেষ। বারোজ ফিরলেই দেরি না করে রওনা দিন। বুঝতে পেরেছেন?'

'লাউড অ্যান্ড ক্লিয়ার! আমরা...' আচমকা বন্ধ হয়ে গেল কথা। স্পীকারের মৃদু ইশ্ শ্ শ্ শ্ শ্ শ্ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই।

ঠোঁটের কাছে মাইক তুলে নিল আবার রিচার্ড। অজানা আতঙ্ক এসে ভর করেছে চোখের তারায়।

'শুনতে পাচ্ছি না, স্করপিয়ন! প্লীজ রিপিট।'
উত্তরে স্পীকারের সেই একঘেয়ে ইশ্ শ্ শ্ শ্ শ্। আর কোন আওয়াজ নেই।
'রানা-আ-আ···কি হলো? জবাব দিচ্ছেন না কেন! জবাব দিন, প্লীজ!'
সাড়া পাবার আশায় অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে রইল রিচার্ড।
কোন জবাব এল না।

আরেক বারমুডা-২

প্রথম প্রকাশ: নভেম্বর, ১৯৮৩

এক

অনড় বসে আছে রানা, নির্বাক। হাঁ করে তাকিয়ে আছে লোকটার দিকে। মুখভরা দাড়ি, চোখে বুনো দৃষ্টি, রেডিও রুমের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে আগন্তুক। গায়ে দুর্গন্ধ। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না রানা। চোখের ভুল? নাকি মগজে আবার সেই গোলমালটা শুরু হয়েছে? চোখ বন্ধ করে খুলল। কই, নাতো! আগের মত একই জায়গায় দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে লোকটা। চোখের ভুল নয়।

ঠোঁট নড়ে উঠল লোকটার। ভাঙা গলায় ফিসফিসিয়ে বলল, 'কে···কে তুমি?···ওদেরই কেউ?'

'কি বলছ?' গলার স্বর শান্ত, স্বাভাবিক রাখল রানা।

'রেডিও ব্যবহার করছ, ওরা দেখলে খুন করে ফেলবে!' বহু-দূর থেকে কথা বলছে যেন লোকটা।

'ওরা?' ধীরে ধীরে সরে গেল রানার হাত, ম্যাজিক ড্রাগনের হ্যান্ডগ্রিপে চেপে বসল। কিন্তু খেয়াল করল না আগন্তুক।

'এখানকার কেউ নও তুমি,' বলল লোকটা। 'কাপড়-চোপড়ও ওদের মত না।'

লোকটার পরনের কাপড় ছিঁড়ে ময়লা ন্যাকড়া হয়ে গেছে। দেখে অনুমান করল রানা, এককালে পোশাকটা আমেরিকান নেভির ইউনিফর্ম ছিল। কাঁধে যেখানটায় পদবীর চিহ্ন থাকার কথা, কিচ্ছু নেই সেখানে, ফাঁকা। চোখ ঘোলাটে, ক্ষয় হতে হতে একেবারে কৃশ হয়ে গেছে শরীর। মধ্যযুগের ভূগর্ভ কারাগার থেকে উঠে এসেছে যেন কোন বন্দী।

'কম্যান্ডার ম্যাসন?' অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ল রানা।

'ম্যাসন?' রানার কথার প্রতিধ্বনি করল যেন লোকটা। 'না, না। ডিক্সন। সীম্যান ফার্স্ট ক্লাস, ডিক্সন।'

'অন্যেরা কোথায়, ডিক্সন? কম্যান্ডার ম্যাসন, অন্যান্য অফিসার, তোমার সঙ্গী সীম্যানেরা, কোথায়?'

'জানি না। তবে ওরা শাসায়, আমি রেডিওটা ছুঁলে আমার সঙ্গীদেরকে মেরে ফেলবে।'

'এই জাহাজে আর কেউ আছে?'

'দু'জন গার্ড সব সময়েই থাকে।'

'কোথায় ওরা?'

'যে-কোনখানে হতে পারে।'

'ইয়াল্লা!' আঁতকে উঠল রানা। হঠাৎই শক্ত হয়ে গেছে শরীর। বারোজ! লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। ডিক্সনকে ধরে এনে রেডিও অপারেটরের চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে বলল, 'এখানে থাকো। কি বলছি, বুঝতে পারছ তো? এখানে চুপ করে বসে থাকো। কোথাও যাবে না।'

নিষ্প্রাণ ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল ডিক্সন। 'ইয়েস, স্যার।'

বারোজকে খুঁজতে লাগল রানা। প্রত্যেক ঘরে দেখছে, দ্রুত, সামনে বাড়িয়ে ধরে রেখেছে ম্যাজিক ড্রাগন। একটু পর পরই কয়েক সেকেন্ডের জন্যে থামছে, কান পেতে সন্দেহজনক শব্দ শোনার চেষ্টা করছে। কিন্তু ডাক্ট ফ্যান চলার মৃদু গুঞ্জন ছাড়া আর কোন শব্দই নেই। কোন চিহ্ন নেই লেফটেন্যান্ট বারোজের।

সিক বে-তে পা রেখেই থমকে দাঁড়াল রানা। একটা অপারেটিং টেবিল, কেবিনেট ভরা নিখুঁত লেবেল লাগানো ওষুধের বোতল, সার্জিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট, একটা এক্স-রে মেশিন, এমনকি একটা ডেন্টিস্ট-চেয়ারও রয়েছে। ঘরের অন্য প্রান্তের দেয়ালের কাছে মেঝেতে বসানো রয়েছে ছ'টা বেড, রোগীদের জন্যে। দুটো বেডের মাঝে ধাতব মেঝেতে পড়ে আছে দেহটা।

এগিয়ে এসে দেহটার কাছে দাঁড়াল রানা। এমনি একটা কিছু দেখতে হতে পারে, আশঙ্কা আগেই করেছিল তবু বারোজের পরিণতি দেখে ধাক্কাটা সামলাতে ওর বেগ পেতে হলো। ম্যাজিক ড্রাগনে হাতের চাপ বাড়ল আরও।

কাত হয়ে পড়ে আছে বারোজ। বেকায়দা ভঙ্গিতে বেঁকে রয়েছে হাত-পা। শরীরের চারপাশে রক্ত। দেখে বুঝতে কষ্ট হয় না, কি করে মারা গেছে সে। এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে গেছে বুক-পিঠ, শরীরের দু'পাশের ছোট্ট গোল ছিদ্র দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। নিতান্ত অবহেলায়, জানোয়ারের মত ফেলে রাখা হয়েছে লাশটা। নিষ্প্রাণ খোলা চোখের মণি দুটো তাকিয়ে রয়েছে নিজের শিরা থেকে বেরোনো রক্তের দিকে।

উবু হয়ে হাত বাড়িয়ে আলতো করে লাশের চোখের পাতা-দুটো বুজিয়ে দিলো রানা। পরমুহূর্তে আচমকা স্প্রিঙের মত একটা লাফে সরে গেল সে। পাঁই করে আধপাক ঘুরেই ম্যাজিক ড্রাগনের চোখা মাথাটা তাক করল পেছনে এসে দাঁড়ানো লোকটার পেটে। ট্রিগার টিপল সঙ্গে সঙ্গেই।

মেঝে এবং দেয়ালের আবছা ছায়া দেখে লোকটার উপস্থিতি টের পেয়েছে রানা। হাতে কিছু একটা রয়েছে তার, এটাও বুঝেছে। আর এক মুহূর্ত দেরি করলেই বারোজের অবস্থা হত তারও। লম্বা, পিপার মত, রোমশদেহী লোকটার কোমরে শুধু এক টুকরো সবুজ কাপড় জড়ানো। সুন্দর চেহারায় বুদ্ধির ছাপ। নীল চোখ, মাথায় কোঁকড়ানো সোনালী চুলের বোঝা। কিন্তু রানা ট্রিগার টেপার সঙ্গে সঙ্গেই লোকটার চেহারা আর শরীরের গঠন পাল্টে গেল। চোখের সামনে লোকটাকে বীভৎস রূপ ধারণ করতে দেখে শিউরে উঠল রানা।

তীক্ষ্ণ শব্দ তুলে নরম মাংসে ঢুকে গেছে কার্বন-ডাই-অক্সাইড। প্রায় সঙ্গে

সঙ্গেই কুৎসিতভাবে ফুলে উঠল লোকটার শরীর। পেট ফুলে ঢোল হয়ে গেল। পাঁজরার বাইরের মাংস-চামড়া ছোট ছোট বেলুনের মত ফুলে উঠল। লোকটার চোখে মুখে আতঙ্ক ফুটেছিল, কিন্তু আধ সেকেন্ডের বেশি সে ভাব বজায় থাকল না, তার আগেই চেহারার বিচ্ছিরি পরিবর্তন ঘটে গেল। পিচকারি থেকে বেরোনোর মত গল গল করে নাক-মুখ-কান দিয়ে বেরিয়ে এল ধূসর সবুজ তরল পদার্থ। কান দিয়ে বেরোনো তরল পদার্থ দু'দিকে ছয় ফুট দূরে গিয়ে ছিটকে পড়ল। ফুলে দ্বিগুণ হয়ে গেল মুখের আকৃতি। নাড়িভুঁড়ি, কলজে, ফুসফুস আর অন্যান্য দেহযন্ত্রের ছোট ছোট টুকরো রক্তের সঙ্গে মিশে দমকে দমকে বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে। চোখ দুটো ছিটকে বেরিয়ে এল কোটর থেকে, কিন্তু খসে পড়ে গেল না। চিকন শিরায় আটকে ঝুলে রইল দুই গালের ওপর। ঝটকা মেরে দু'পাশে খাড়া হয়ে গেছে বেকায়দা রকম ফুলে যাওয়া দুই হাত। চিৎ হয়ে পড়ে গেল বীভৎস মূর্তিটা। শরীর থেকে গ্যাস বেরিয়ে যেতেই আবার আগের আকৃতি ফিরে পাচ্ছে ধীরে ধীরে।

বমির ভাবটা জোর করে ঠেকাল রানা। বীভৎস দৃশ্যটা আর দেখতে পারছে না। ঘুরে, উবু হয়ে বারোজের লাশটা তুলে নিল। শুইয়ে দিলো পাশের একটা বেডে। একটা কম্বল দিয়ে ঢেকে দিল তরুণ লেফটেন্যান্টের শরীরটা। বিষণ্ণ দৃষ্টি রানার চোখে। নিজেকে ক্ষমা করতে পারছে না। বারোজের মৃত্যুর জন্যে সে-ই দায়ী, কিছুতেই ভাবনাটা সরাতে পারছে না মন থেকে।

বারোজের বিছানার পাশ থেকে সরে এল রানা। সোজা হলো। একটু একটু কাঁপছে সারা শরীর। কিছুক্ষণ আগেও ক্ষীণ আশা ছিল মনে, স্করপিয়নের নাবিক-অফিসারেরা বেঁচে আছে। কিন্তু এখন নিশ্চিত সে, ডিক্সন ছাড়া সাবমেরিনের কেউ বেঁচে নেই আর। ঘুরে আবার মেঝেতে পড়ে থাকা লোকটার দিকে তাকাল রানা। অপার্থিব কোন জীব নয় ওটা। তারই মত মানুষ—দুটো হাত, দুটো পা, তারই মত রক্ত মাংসের শরীর।

এখানে দেখার আর কিছু নেই। দেরি করার কোন মানেই হয় না। ডিক্সনের কথামত একজন পাহারাদারের দেখা পেয়েছে রানা, অন্য একজন অদেখা রয়ে গেছে এখনও। কোথায় আছে সে, কে জানে। নিরস্ত্র এখন রানা। ম্যাজিক ড্রাগনের ক্ষমতা শেষ। একটা গ্যাস-ক্যানিস্তার পোরা ছিল ভেতরে, খরচ হয়ে গেছে। অন্য লোকটা এখন আক্রমণ করে বসলে বাধা দিতে পারবে না রানা।

অসহায় বোধ করছে, এই সময়ই মনে এল কথাটা। বারোজকে খুন করেছে যে অস্ত্রটা···। সার্জিক্যাল টেবিলের তলায় জিনিসটাকে পড়ে থাকতে দেখল সে। দ্রুতপায়ে কাছে গিয়ে টেবিলের তলা থেকে অস্ত্রটা কুড়িয়ে নিল।

অদ্ভুত জিনিস। পিস্তলের স্ট্যান্ডার্ড মাপের চেয়ে ছোট, তর্জনী উঁচানো দস্তানার মত অনেকটা। বাঁটটায় ধরার সুবিধের জন্যে খাঁজকাটা—হাতের পাঁচ আঙুল খাপে খাপে বসে যায়। বুড়ো আঙুলের ওপর রয়েছে দুই ইঞ্চি ফায়ারিং চেম্বার। ট্রিগার নেই, তার জায়গায় ছোট একটা বোতাম। আঙুলের সামান্য চাপেই ছুটবে গুলি।

অস্ত্রটা তুলে এক পলক দেখল রানা, বেশি পরীক্ষা করার সময় নেই। দ্রুত ছুটে এসে ঢুকল রেডিও রূমে। ডিক্সনের বাহু চেপে ধরে টেনে দাঁড় করাল।

প্রতিবাদে কান দিল না। টেনে নিয়ে চলল এসকেপ হ্যাচের দিকে।

প্রায় পৌঁছে গেছে ওরা। ইঞ্জিন আর রি-অ্যাকটর রুমের পাশ দিয়ে আর দশ কদম এগোলেই টর্পেডো রুমের দরজার কাছে পৌঁছে যাবে। হঠাৎই ব্রেক কষে থমকে দাঁড়াল রানা। দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে এক মানুষরূপী পাহাড়। কোমরে সবুজ কাপড় জড়ানো। হাতে সেই বিচিত্র অস্ত্র।

লোকটার দেখা পেয়ে যাবে, এই আশঙ্কাটা বরাবরই রয়েছে রানার মনে, তাই সে চমকাল না। কিন্তু রানাকে দেখে ভয়ানক ভাবে চমকে গেল লোকটা। এবং গুলি করতে দেরি করে ফেলল সামান্য। এই সময়টুকুতেই নির্ধারিত হয়ে গেল জয়-পরাজয়। নির্দ্বিধায় হাতের অস্ত্রটা লোকটার দিকে তাক করে বোতাম টিপে দিল রানা। ছোবল হানার আগে বিষাক্ত গোক্ষুর যেমন ফোঁশ করে ওঠে, তেমনি একটা আওয়াজ উঠল।

জ্বলন্ত কি একটা বেরিয়ে গেল অস্ত্রটার মুখ দিয়ে—কি জিনিস বুঝতে পারল না রানা, সোজা সেটা লাগল গিয়ে লোকটার কপালে। প্রচণ্ড ধাক্কায় পেছনে বাঁকা হয়ে গেল লোকটার শরীর, টারবাইনে বাড়ি খেয়ে আবার সামনের দিকে ঝুঁকল, দু'পাশে হাত ছড়িয়ে দড়াম করে আছড়ে পড়ল, কপাল-বুক জোরে বাড়ি খেল মেঝেতে। লোকটার হাত পায়ের নড়াচড়া বন্ধ হওয়ার আগেই, ডিক্সনকে তার পাশ কাটিয়ে সামনে ঠেলে দিল রানা। ঠেলে নিয়ে এল দরজার কাছে।

চৌকাঠে হোঁচট খেল ডিক্সন, হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। তাকে ধরে রেখেছিল রানা, টাল সামলাতে না পেরে সে-ও পড়ে গেল। বেশ জোরে বাড়ি খেল হাঁটু চৌকাঠে। হাত থেকে অস্ত্র খসে পড়ে গেল।

হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠতে গিয়ে স্থির হয়ে গেল রানা। আরও দু'জন লোক এসে দাঁড়িয়েছে সামনে। পাগলের মত হাত বাড়াল রানা, অস্ত্রটা তুলে নিতে চাইল। কিন্তু জানে, দেরি হয়ে গেছে। আজব পিস্তলটা তুলে গুলি করার আগেই শেষ হয়ে যাবে সে ওদের গুলিতে। একজনকে যদিও বা মারতে পারে, অন্যজনকে গুলি করার সময় পাবে না কিছুতেই।

'মিস্টার রানা?' দু'জনের মাঝে খাটো লোকটা বলে উঠল।

ভুল শুনল না তো! নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না। ধীরে ধীরে চোখ তুলে তাকাল। পিকারিঙের লোক—চিনতে পারল সে।

'আমাদের অনুসরণ করে এসেছেন?' রানার মুখ ফসকে যেন বেরিয়ে গেল কথাটা।

'কমান্ডার রিচার্ডের ধারণা, আপনার আর বারোজের বাতাস ফুরিয়ে গেছে,' জবাব দিল হেল্‌ম্‌স্‌ম্যান। 'তাই দুটো ট্যাংক পাঠিয়ে দিয়েছেন আমাদেরকে দিয়ে। এসকেপ কম্পার্টমেন্ট দিয়ে ঢুকেছি আমরা। ভেতরটা শুকনো দেখব, কল্পনাও করিনি!'

এতক্ষণে ধাতস্থ হয়ে এসেছে রানা। বলল, 'হাতে সময় নেই। এই কম্পার্টমেন্টটা পানিতে ভরে দিতে পারবেন?'

রানার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকাল হেল্‌ম্‌স্‌ম্যানের সঙ্গী—সহকারী গোছের কিছু

হবে। সরাসরি রানার দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল হেল্‌ম্‌স্‌ম্যান, 'পানিতে ভরে দিতে বলছেন?' রানার কথা বুঝতে পারছে না যেন লোকটা।

'হ্যাঁ। আমি চাই না, আর কেউ তুলে নিয়ে যাক সাবমেরিনটাকে। কমপক্ষে একমাস ঠেকিয়ে রাখতে হবে ওদের।'

'আ-আমি পারব না…' দ্বিধা করছে লোকটা।

'নষ্ট করার মত সময় নেই হাতে,' মোলায়েম গলায় বলল রানা। 'বারোজ মারা গেছে। তাড়াতাড়ি না করলে আমরাও যাব।'

'কি বললেন? লেফটেন্যান্ট বারোজ মারা গেছে!…বলছেন কি!…পানিতে ভরে দেব…'

'যদি এটা দোষের কিছু হয়,' লোকটার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল রানা, 'সব দোষ নিজের কাঁধে তুলে নেব। আপনার ভয় নেই।' পুরো বাক্যটা শেষ হওয়ার আগেই কলজেতে খচ্‌ করে ছুরি বিঁধল রানার। এই একই আশ্বাস দিয়েছিল ও বারোজকেও।

চৌকাঠের কাছে বসে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে ডিক্সন। তার চোখ আগন্তুক দু'জনের ওপর, কিন্তু কারও প্রতি কোন আগ্রহ আছে বলে মনে হলো না। ডিক্সনকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল হেল্‌ম্‌স্‌ম্যানের সহকারী, 'কে ও?'

'স্করপিয়নের নাবিক,' জবাবে বলল রানা। 'ওকে পিকারিঙে নিয়ে যেতে হবে। জরুরী চিকিৎসা দরকার ওর।'

কয়েক মাস আগেই যার মরে যাবার কথা, তাকে জ্যান্ত দেখে অবাক হলেও বুঝতে দিল না সহকারী। আস্তে করে মাথা ঝাঁকাল শুধু। এই সময়ই রানার রক্তাক্ত পায়ের দিকে নজর পড়ল তার। হাঁটুর চামড়া ছিলে রক্ত বেরিয়ে এসেছে। 'চিকিৎসা আপনারও দরকার।'

আহত পায়ে কোন অনুভূতি নেই, অবশ হয়ে গেছে যেন পাটা। কিন্তু হাড়-টাড় ভাঙেনি দেখে স্বস্তি বোধ করল রানা। সহকারীর উৎকণ্ঠিত চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ভয় নেই, মরব না।' হেল্‌ম্‌স্‌ম্যানের দিকে নজর ফেরাল রানা। 'ঘরটা পানিতে ভরে দিন।'

'বেশি চাপাচাপি করলে অবশ্য মানা করতে পারব না…' হেল্‌ম্‌স্‌ম্যানের গলাটা যান্ত্রিক শোনাল।

'বেশি চাপাচাপিই করছি,' অস্থির হয়ে উঠেছে রানা। 'পারবেন তো?'

'সাবমেরিনটাকে পানিতে ভরতে যে-কোন স্যালভেজ ক্রু-র এক ঘণ্টার বেশি লাগবে না। বাইরে থেকে এখন সাবমেরিনে ঢুকতে হলে এসকেপ হ্যাচ ছাড়া আর কোন পথ নেই। সবচেয়ে ভাল বুদ্ধি, ইমার্জেন্সী ভালভগুলো বন্ধ করে দিয়ে টর্পেডো টিউবের দরজা খুলে দেয়া, ওই পথে পানি ঢুকবে। তারপর এক্সট্রাকশন পাম্পগুলো ডিসকানেক্ট করে দিলেই হলো। বাইরে থেকে আর সাবমেরিনের পানি বের করা যাবে না। আমরা কি করে রেখে গেছি, বুঝতেই এক-দেড়দিন সময় লেগে যাবে অন্যলোকের। তারপর ভেতরে ঢুকে পানি বের করে দিয়ে, ঘরটা প্রেশারাইজ করে নিতে লাগবে আরও ঘণ্টা দু'য়েক।'

'বেশ। কাজ শুরু করে দিন তাহলে। ইঞ্জিন রুমের দরজা বন্ধ করুন আগে।'

'একটা কাজ করলে আরও কয়েক ঘণ্টা দেরি করিয়ে দেয়া যায় ওদের,' বলল হেল্‌ম্‌স্‌ম্যান।

'কি কাজ?'

'রি-অ্যাকটর বন্ধ করে দিলে।'

'না না,' বাধা দিল রানা। 'পরে অসুবিধে হবে আপনাদেরই। সাবমেরিনটাকে তোলার সময় রি-অ্যাকটর আবার চালু করার মত সময় পাওয়া যাবে কিনা ঠিক নেই।'

রানার দিকে তাকাল হেল্‌ম্‌স্‌ম্যান, কোনরকম ভাবান্তর নেই চেহারায়। 'কি করছেন আপনিই জানেন!' ঘুরে সহকারীর দিকে তাকাল সে। 'ইনার টর্পেডো টিউব ডোর খুলে দাও, পাম্প ডিসকানেক্ট করে দাও। বাইরে থেকে ভেন্ট আর এক্সটেরিয়র টিউব ডোর খুলছি আমি।' আবার রানার দিকে তাকাল লোকটা। 'মিস্টার রানা, আপনার কথামতই কাজ করছি। ঠিকবেঠিক কি করছেন, আপনি জানেন। তবে আপনার ভুল হলে আমাদের ক্যারিয়ার খতম। নেভি থেকে লাথি মেরে বের করে দেবে আমাদের।'

হাসল রানা। 'কিংবা কে জানে, কপাল ভাল হলে একটা মেডালও পেয়ে যেতে পারেন।'

মুখ বাঁকাল হেল্‌ম্‌স্‌ম্যান। 'মেডাল-ফেডালের দরকার নেই আমার। সাজা এড়াতে পারলেই ভাগ্যবান মনে করব নিজেকে।'

কাজের লোক বাছাই করার ক্ষমতা আছে রিচার্ডের, মনে মনে প্রশংসা না করে পারল না রানা। নির্বিকার, নিখুঁত দক্ষতায় যন্ত্রের মত কাজ করে চলল লোক দু'জন। মসৃণভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সবকিছু। এসকেপ হ্যাচ দিয়ে বেরিয়ে গেল হেল্‌ম্‌স্‌ম্যান আউটার টর্পেডো টিউব ডোর খুলে দেবে, এগজস্ট ভেন্ট বন্ধ করে দেবে। একটা বাংক থেকে কম্বল ছিঁড়ে হাঁটু বাঁধতে রানার যেটুকু সময় লাগাল, তাতেই কাজ শেষ করে ফেলল ওরা। হ্যাচে টোকা দিয়ে সংকেত জানাল।

ঠেলে ডিক্সনকে এসকেপ টিউবে তুলে দিল রানা। ভালভগুলো একে একে খুলে দিল সহকারী। নিচের কম্পার্টমেন্টে পানি ঢুকতে শুরু করল। সিলিঙ ছুঁতে পানির আর ফুট দুয়েক বাকি থাকতে ডুব দিল সে। হুড়কো সরিয়ে ইনার টিউব ডোর খুলে দিল। অবাক হয়ে দেখল, টিউব দিয়ে ভেতরে এসে ঢুকল একটা প্যারট ফিশ, ধীরে সুস্থে সাঁতরে বেড়াতে লাগল ঘরের পানিতে।

জোর করে এয়ার ট্যাংক আর রেগুলেটর পরতে বাধ্য করল রানা ডিক্সনকে। মাথা গলিয়ে জায়গামত বসিয়ে দিল ফেসমাস্ক। কি ঘটছে কিছুই বুঝছে না যেন লোকটা, এমনি ভাবে দাঁড়িয়ে রইল।

'ওকে ওপরে তোলার ভার আমি নিচ্ছি, স্যার,' পাশে এসে দাঁড়িয়েছে হেল্‌ম্‌স্‌ম্যানের সহকারী। শক্ত হাতে কোমর জড়িয়ে ধরল ডিক্সনের।

দায়িত্ব থেকে রেহাই পেয়ে খুশিই হলো রানা। মাথা ঝাঁকিয়ে ধন্যবাদ জানাল সহকারীকে। তাড়াতাড়ি নিজের ডাইভিং গিয়ার পরে নিল। তাজা বাতাস ভরা

নতুন এয়ার ট্যাংকটা বাঁধল পিঠে।

ছুরির বাট দিয়ে হ্যাচের এপাশে ঠোকা দিল সহকারী। বাইরে থেকে হ্যাচ কভার খুলে দিল হেল্‌ম্‌সম্যান।

ভেতরে জমে থাকা বাতাস বড় বড় বুদ্বুদ তুলে বাইরে বেরিয়ে গেল। এই বুদ্বুদের ভেতর দিয়ে ডিক্সনকে নিয়ে বেরিয়ে গেল সহকারী। তারপরে বেরোল রানা। কিন্তু আগের দু'জনের মত নির্বিঘ্নে বেরোতে পারল না। এসকেপ হ্যাচের ধারে আটকে গেল ওর এয়ার ভালভ। বাতাসের ধাক্কায় বাইরে বেরিয়ে এসেছে রানা, আটকে গেছে, নিচে থেকে ঠেলা মারছে বাতাস। এক মিনিটের মত ঝুলে রইল সে, ওপরে উঠতে থাকা সঙ্গীদের দিকে অসহায় ভাবে তাকাচ্ছে বার বার। কিন্তু ওর দিকে কারও খেয়াল নেই।

বাতাসের ঠেলা কমে গেলে নিচের দিকে বসে পড়ে সহজেই হ্যাচের ধার থেকে ভালভটা ছাড়িয়ে নিল রানা। উঠতে গিয়েই আবার থেমে যেতে হলো। আচমকা কোত্থেকে এসে হাজির হয়েছে আরেক বিপদ। একটা স্ফিরনা লেভিনি—মানে, আঠারো ফুট লম্বা ভয়ঙ্কর এক হাতুড়ি-মাথা হাঙর। রানা ভাবল, তাকে লক্ষ্য করবে না বিশাল ধূসর দানবটা, মাথার ওপর দিয়ে চলে যাবে, কিন্তু এক মুহূর্ত পরেই ভুল ভাঙল তার। মাথা নিচু করে ডাইভ দিয়ে এগিয়ে আসছে হাঙরটা। হাঁ হয়ে গেছে মুখ। মারাত্মক, ধারাল দাঁতের সারি দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার।

চিন্তার ঝড় বইছে রানার মনে। চেম্বারে গ্যাস ক্যানিস্তার নেই, কোন কাজে আসবে না আপাতত, তাই ম্যাজিক ড্রাগনটাকে সাবমেরিনেই ফেলে এসেছে। তার কাছে এখন একমাত্র অস্ত্র বলতে সেই অদ্ভুত পিস্তলটা, যেটা দিয়ে খুন করা হয়েছে বারোজকে। কিন্তু এই অস্ত্র ওই দু'শো পাউন্ড ওজনের ভয়ঙ্কর মানুষখেকোর বিরুদ্ধে খেলনা বৈ কিছুই নয়।

এগিয়ে আসছে হাঙরটা। বুঝতে পারছে রানা, তার রক্তাক্ত হাঁটুর প্রতিই দানবটার আগ্রহ ও নজর। একটু কাত হয়ে সাবলীল ভঙ্গিতে নিচে নেমে আসছে হাঙর। হাতুড়ির এক মাথার একটা চোখ চেয়ে আছে এদিকে। সম্মোহিতের মত সেদিকে তাকিয়ে রইল রানা।

রানার কাছাকাছি এসে গেছে হাঙরটা। পাক খাচ্ছে ওকে ঘিরে। ধীরে ধীরে ছোট করে আনছে বৃত্ত। আরও কাছে এসে যেতেই হাঙরের কানকো লক্ষ্য করে বাঁ হাতে গায়ের জোরে ঘুসি চালাল রানা। নিজের কাছেই হাস্যকর ঠেকল ব্যাপারটা। পাত্তাই দিল না ব্যাটা। পাশ কাটিয়ে যাবার সময় ওটার লেজের ঝাপটায় ছিটকে পড়তে পড়তে কোনমতে সামলে নিল রানা। ইংরেজী ইউ অক্ষরের মত বাঁক নিয়ে আবার ফিরে আসছে ধেয়ে।

হাঙরের মুখোমুখি হলো রানা। পায়ে বাঁধা ফিন নাড়িয়ে জায়গামত রেখেছে নিজেকে। ওপরের দিকে একবার তাকাল। তিরিশ ফুট ওপরে উঠতে পারলেই হত, কিন্তু এইটুকু দূরত্ব পেরোবারই সময় পাবে না। এসে যাচ্ছে হাঙর। হাতের বিচিত্র পিস্তলটা তুলে তাক করল রানা।

রানা জানে, সময়ের হিসেবে একটু গোলমাল করে ফেললেই তার হাতটা

ঢুকে যাবে হাঙরের হাঁ করা মুখে। আলগোছে কুচ করে কনুয়ের ওপর থেকে কেটে নেবে মানুষখেকো।

শান্তভাবে, যেন কোন তাড়া নেই এমনি ভঙ্গিতে এগিয়ে এল হাঙর। বাঁ পাশটা রানার দিকে ফেরানো। কাছে এসে যেতেই বোতাম টিপল রানা, গুলি করল হাঙরের বাঁ চোখে।

তীব্র গতিতে মোচড় খেয়ে ঘুরে গেল হাঙর, লেজের ঝাপটায় ঝড় তুলল পানিতে। পানির ধাক্কায় পেছনে বাঁকা হয়ে গেল রানা। কোনমতে সোজা হয়ে জোরে পা চালাল। ওপরের দিকে উঠতে উঠতে সতর্ক দৃষ্টি রাখল হাঙরের দিকে। মাঝে মাঝেই চোখ ফিরিয়ে পিকারিঙের দিকে চাইতে হচ্ছে, নইলে আবার মাথা ঠুকে যাবে জাহাজের খোলে।

হাঙরটার দিকেই বেশির ভাগ নজর রানার, মাথার ওপর ছায়া পড়তেই ওপর দিকে তাকাল। বিশ ফুট ওপর থেকে তার দিকেই তাকিয়ে আছে হেল্‌ম্‌স্‌ম্যান। আঙুলের ইশারায় তাড়াতাড়ি উঠে যেতে বলছে। দশ সেকেন্ডেই লোকটার কাছাকাছি পৌঁছে গেল রানা। ফিরে চাইল। আবার এগিয়ে আসছে হাঙর। বিচিত্র ভঙ্গিতে মাথা ঝাড়তে ঝাড়তে আসছে। বাঁ চোখ গেছে, ভাল ডান চোখটা দিয়ে দেখছে এখন রানাকে। দ্বিতীয়বার আঘাত করার জন্যে তৈরি হলো রানা। পিস্তল তাক করল।

রানার কাছ থেকে বেশ কিছুটা দূরে থাকতেই হঠাৎ থমকে দাঁড়াল হাঙর। রানাকে দেখছে। কি ভাবল কে জানে, আক্রমণ করল না আর। আচমকা মোচড় খেয়ে ঘুরে গেল। দ্রুত ছুটে অদৃশ্য হয়ে গেল দূরের নীলাভ-কালো অন্ধকারে।

উত্তেজনা দূর হয়ে যেতেই কতখানি ক্লান্ত হয়েছে টের পেল রানা। থর থর করে কাঁপছে। কোনমতে শরীরটা টেনে তুলল ডাইভিং প্ল্যাটফরমে। তাকে সাহায্য করার জন্যে লোক অপেক্ষা করছিল, এগিয়ে এল তারা। ডাইভিং গিয়ার খুলতে সাহায্য করল।

ঘাড় ফেরাতেই রিচার্ডের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল রানার।

'বারোজ কোথায়?' বরফের মত শীতল রিচার্ডের গলা।

'মারা গেছে,' অনেক কষ্টে যেন উচ্চারণ করল রানা শব্দদুটো।

'হুঁ,' আর কিছু বলল না রিচার্ড। ঘুরে চলে গেল।

দীর্ঘ এক মুহূর্ত হাতের গেলাসের দিকে তাকিয়ে রইল রানা। চেহারায় কোন ভাবান্তর নেই, তবে চোখে ক্লান্তির ছাপ। লাল চোখের কোণে কালি। পোর্টহোল দিয়ে শেষ সূর্যের সোনালী রশ্মি এসে পড়েছে গেলাসের ওপর, উজ্জ্বল দ্যুতিতে ঝিকিয়ে উঠছে বরফের টুকরো। গেলাসটা কপালে চেপে ধরল রানা। গেলাসের বাইরে ফুটে ওঠা পানির বিন্দু আর কপালের ঘামের বিন্দু মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল। একটুও না বাড়িয়ে কিংবা না কমিয়ে বিস্তারিত সব রিচার্ডকে জানিয়েছে রানা। একটাও কথা না বলে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত চুপচাপ সব শুনে গেছে রিচার্ড।

'বারোজের মৃত্যুর জন্যে শুধু শুধু অপরাধী ভাবছেন নিজেকে,' মন থেকেই কথাটা বলল রিচার্ড। 'তবে হ্যাঁ, এসকেপ চেম্বারে যদি আটকে যেতেন আপনারা, যদি দম বন্ধ হয়ে ওখানে মারা যেত বারোজ, তাহলে আপনাকেই দায়ী করতাম। কিন্তু যা ঘটেছে, তাতে আপনার কোন হাত ছিল না। একজোড়া খুনী স্করপিয়নে লুকিয়ে ছিল, সেটা আপনার জানার কথা নয়। তাছাড়া একই সমান ঝুঁকি আপনি নিজেও নিয়েছিলেন, বারোজ না হয়ে মারা আপনিও পড়তে পারতেন।'

'যত যা-ই বলুন,' রানার গলায় অনুশোচনা, 'ওকে সাবমেরিনে ঢুকতে আমিই বাধ্য করেছিলাম। আমি তাকে তার মত চলতে দিলে এখন জ্যান্ত থাকত বারোজ।'

'হয়তো। কিংবা মারা পড়ত হাঙরের আক্রমণে, অথবা অন্য কোনভাবে। কেউ কি বলতে পারে কখন হাজির হবে মৃত্যু? যা আবিষ্কার করেছেন, একটা জীবন তার তুলনায় কিছুই না। অযথা মন খারাপ করছেন। স্করপিয়নকে পার্ল হারবারে নিরাপদে ফিরিয়ে নিতে হবে, এটাই আসল কথা। এজন্য বারোজ কেন, দরকার হলে পিকারিঙের প্রত্যেকটি নাবিক জীবন দিতে পিছপা হবে না। যদি আমাকেও প্রাণের ঝুঁকি নিতে হয়, কুছ পরোয়া নেই।' নিজের গেলাসে আরেকটু মদ ঢেলে নিল রিচার্ড।

'কোন সন্দেহ নেই,' বলল রানা, 'কাজের প্রতি আপনি নিবেদিতপ্রাণ। যদিও প্রশংসার মত শোনাচ্ছে, কথাটা সত্য।'

রিচার্ড হাসল। 'নিজের কাজ আপনিও খুব ভাল বোঝেন। তা ফরোয়ার্ড টর্পেডো কম্পার্টমেন্ট পানিতে ভরে দিলেন কেন? নিশ্চয় এর কোন বিশেষ কারণ আছে, না?'

'আছে,' বলল রানা। 'কয়েকদিনের জন্যে ওখানেই আটকে রাখতে চাই স্করপিয়নকে।'

'কেন?' হাসি মিলিয়ে গেছে রিচার্ডের চেহারা থেকে।

গেলাসে চুমুক দিতে দ্বিধা করছে রানা। 'দু'জন গার্ড ছিল স্করপিয়নে, আর ছিল সীম্যান ডিক্সন। তার জন্যে ওটা ছিল একটা জেলখানা। এতদিন বাইরে বেরোতে পারেনি সে, যাবারও কোন জায়গা ছিল না। পালা করে এসে পাহারা দিত গার্ডেরা, দু'জন করে আসত। কোত্থেকে আসে ওরা, জানি না। একটা ব্যাপারে শিওর আমি, সাবমেরিনে থাকে না ওরা।'

'কি করে অত শিওর হচ্ছেন?'

'গ্যালি ক্রুদের মেস, অফিসারদের ওয়ার্ডরুম, সব খুঁজে দেখেছি আমি। খাবার দাবার কিচ্ছু নেই। গার্ডদের খেতে হয়। খাবার ছাড়া ডিক্সনও ছয় মাস বাঁচতে পারত না। এর মানে কি? বাইরে থেকে খাবার আসত তাদের জন্যে, নয়তো খাবারের জন্যে বাড়ি যেত গার্ডেরা। বাড়িটা কোথায়? কাছে পিঠেই হবে নিশ্চয়। এবং তা-ই যদি হয়, তাহলে পিকারিংকে কায়দামত পাওয়ার সুযোগ খুঁজছে ওরা এখন। ভাবছে, আর সব জাহাজের মত পিকারিংও যদি হারিয়ে যায়, স্করপিয়নকে খুঁজে পাবার আশা বাদ দিতে হবে নেভিকে। তাই টর্পেডো কম্পার্টমেন্ট পানিতে

ভরে দেবার নির্দেশ দিয়েছি। এখন আমরা নিখোঁজ হয়ে গেলেও, স্করপিয়নকে সহজে সরাতে পারবে না ওরা, তার আগেই পৌঁছে যাবে নেভি।'

'তিন ঘণ্টার মধ্যেই হেলিকপ্টারে করে স্যালভেজ ক্রু নিয়ে আসা যায়।'

'কিন্তু ফিরে এসে আর পিকারিংকে পানির ওপরে দেখব, এমন আশা খুবই কম।'

রিচার্ডের চোখে অবিশ্বাস। 'তাই কি? রাডার জানাচ্ছে, আশেপাশে পাঁচশো মাইলের মধ্যে কোন জাহাজ নেই। সোনারে অন্য কোন সাবমেরিনের অস্তিত্বও নেই। কোত্থেকে আসবে ওরা?'

'সেটা জানলে তো হতই...এত মাথা ঘামানোর দরকার পড়ত না।'

'মেনে নেবার মত কোন যুক্তি যতক্ষণ দেখাতে না পারছেন, নোঙর তুলছি না আমি,' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রানার চোখের দিকে তাকাল রিচার্ড। 'রাতটা এখানেই কাটাব। ভোরে উঠেই স্করপিয়নকে তোলার কাজে হাত দেব।'

'তাহলে ভোর পর্যন্ত টিকে থাকতে হবে আপনাকে,' বলল রানা। 'কিন্তু পারছেন না। ভোরের আগেই স্করপিয়নের পাশে গিয়ে ঠাঁই নেবে পিকারিং।'

'একটা কথা ভুলে গেছেন,' শান্তকণ্ঠে বলল রিচার্ড, 'রেডিওতে পার্ল হারবারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি আমরা। অন্ধকার হবার আগেই মাথার ওপরে চক্কর মারবে জঙ্গী বিমান। আমাদেরকে সাপোর্ট দেবে।'

'যোগাযোগ করতে পারবেন?'

রানার কথার ধরনে একটু যেন চমকে গেল রিচার্ড। ভুরু কুঁচকে তাকাল।

'একটু আগে তো রেডিওতে কথা বলেছেন,' আবার বলল রানা। 'আপনার কথায় সাড়া দিয়েছেন অ্যাডমিরাল ম্যাকডেভিড?'

'সত্যিই তো! ম্যারিটাইম ফ্রিকোয়েন্সীতে কথা বলেছি, সাবমেরিন থেকে আপনিও একই ফ্রিকোয়েন্সী ব্যবহার করেছেন।'

'করেছি। স্করপিয়নকে খুঁজে পেয়েছি বলেছি, অথচ কোন সাড়া দিলেন না অ্যাডমিরাল, ব্যাপারটা অদ্ভুত ঠেকেনি আপনার কাছে? আপনিই বলেছেন, আমার কথা আশেপাশে হাজার মাইল দূর থেকেও শোনা যাবে। কিন্তু কই? কোন রেডিওইতো কোন সাড়া দিল না। তাছাড়া অ্যাডমিরাল কিংবা তাঁর কোন সহকারীও তো স্করপিয়নের ব্যাপারে আর কিছু জানতে চাইল না। একেবারে খাপছাড়া ব্যাপার না? আসলে, আমার মনে হয়, আমাদের কথা শুনতেই পায়নি ওরা। শুনতে দেয়া হচ্ছে না।'

একটা ভুরু সামান্য ওপরে উঠল রিচার্ডের। শান্তভাবে হাত বাড়িয়ে অনেকগুলো ইন্টারকম সুইচের একটা টিপল। বলল, 'কমান্ডার রিচার্ড বলছি। কোড ওভারল্যান্ড সিক্রে পার্ল হারবারে যোগাযোগ করো। ওরা সাড়া দেবার সঙ্গে সঙ্গে জানাবে আমাকে।'

'ঠিক আছে, স্যার,' স্পীকারে একটা খসখসে কণ্ঠ ভেসে এল।

'আমাদের কথা শুনতে পায়নি ওরা, এই কথাটা আপনার মাথায় এল কেন?' রানার দিকে চেয়ে বলল রিচার্ড।

'শুধু আমরাই নয়, আটলান্টা ছাড়া আর কারও রেডিও মেসেজই বাইরের দুনিয়াকে শুনতে দেয়নি ওরা। শুনতে দিতে চায় না।'

'আপনার কি ধারণা, ট্রান্সমিশন জ্যাম করে দিয়েছে?'

'অবশ্যই,' জোর দিয়ে বলল রানা। 'আর এই কারণেই জাহাজগুলোর মে-ডে সিগন্যাল শুনতে পাওয়া যায়নি। মে-ডে সিগন্যাল নিশ্চয় পাঠানো হয়েছে, কিন্তু ধরতে পারেনি ওয়াহুর ম্যারিটাইম স্টেশন। কোথাও শক্তিশালী একটা রেডিও ট্রান্সমিটার বসিয়েছে আমাদের চালাক বন্ধুটি। হাওয়াইয়েরই কোন একটা দ্বীপে হবে হয়তো। একটা ল্যান্ড বেস দরকার আছে তার। লম্বা অ্যান্টেনা বসাতে হয়েছে, যেটার সাহায্যে জাহাজের সিগন্যালগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।'

'কমান্ডার রিচার্ড?' স্পীকারে খসখসে কণ্ঠটা ভেসে এল।

'বলছি। বলো।'

'না, স্যার, হচ্ছে না। ধরতে পারছে ওরা, কিন্তু মনে হয় কোড ওভারল্যান্ড সিক্স বুঝতে পারছে না। কয়েকবার রিপিট করেছি আমি, কাজ হয়নি। বার বার মেসেজ পাঠাতে অনুরোধ করছে। ম্যারিটাইম চ্যানেলে আমাদের কাছে কথা আসছে পরিষ্কার। কিছু একটা গোলমাল হয়ে যাচ্ছে, স্যার।'

ইন্টারকমের সুইচ অফ করে দিল রিচার্ড। কারও মুখে কথা নেই। ভুল লোকের সঙ্গে রেডিও যোগাযাগ হয়ে যাচ্ছে, বুঝতে কোন অসুবিধে নেই আর।

'অবস্থা ভাল ঠেকছে না,' কথা বলল রিচার্ড।

'যাক, বুঝেছেন।...কিন্তু আমি ভাবছি, স্করপিয়নের কথা, তার নাবিকদের কথা। সাবমেরিনটার তো কোথাও কোন গোলমাল নেই, তাহলে ওভাবে ফেলে রাখা হয়েছে কেন? চালাতে তো পারত।'

'কি জানি!' মাথা চুলকাল রিচার্ড। 'রাশিয়ান কিংবা অন্য কোন দেশের ঘাড়ে দোষ চাপাতে পারছি না আমি। এমন একটা ব্যাপার, এতদিন এভাবে গোপন রাখা সম্ভব না কোন দেশের পক্ষেই।'

'কেমন যেন উদ্ভট ব্যাপার স্যাপার, না?' বলল রানা। 'কোন দেশের ষড়যন্ত্র হতে পারে না, ঠিকই বলেছেন।'

'কোন কারণ ছাড়া একটা নিউক্লিয়ার সাবমেরিনকে মাঝ সাগরে ধরে রাখবে কেউ, এটাও উদ্ভট। আর কাজটাও ছেলেখেলা নয়। ভেবে অবাক হচ্ছি, সাবমেরিনটাকে থামাল কি করে ওরা...উঠল কি করে?'

'খোলসের বাইরে ভেতরে কোথাও জখমের কোন চিহ্ন দেখিনি।'

'দেখার কথাও নয়। বাইরে থেকে ওই খোলস ভাঙা চাট্টিখানি কথা নয়। তাছাড়া কাছে ঘেঁষার আগেই বিপদ-সংকেত জানাবে ডিটেকশন গিয়ার। বাইরে থেকে জোর করে হ্যাচ কিংবা ভেন্টিলেটর খুলতে গেলে ভেতরের মড়া পর্যন্ত জাগিয়ে দেবে অ্যালার্ম বেল। শত্রুর হাত এড়িয়ে সহজেই পালিয়ে যেতে পারবে ক্যাপ্টেন। একমাত্র মাছের পক্ষেই সাবমেরিনটার কাছে ঘেঁষা সম্ভব কারও কোন সন্দেহের উদ্রেক না করে।'

'কিন্তু তবু বাইরের লোক ঢুকতে পারল ওটাতে।'

কিছু বলতে যাচ্ছিল রিচার্ড, কিন্তু ইন্টারকম স্পীকার বাধা দিল। 'স্কিপার?'

'বলো।'

'একবার ব্রিজে আসবেন, স্যার?'

'কেন?'

'ব্যাপারটা…স্যার…'

'এমন করছ কেন? বলে ফেলো না কি হয়েছে?' গলা চড়িয়ে বলল রিচার্ড।

দ্বিধা করছে ব্রিজের লোকটা। 'কুয়াশা, স্যার। পানি থেকে কুয়াশা উঠছে। ছড়িয়ে পড়ছে দ্রুত। এমন কাণ্ড জীবনে দেখিনি। অবিশ্বাস্য।'

'এখুনি আসছি,' রানার দিকে তাকাল রিচার্ড। 'কিছু বুঝতে পারছেন?'

'পারছি,' থমথমে শোনাল রানার গলা। 'আসছে ওরা!'

দুই

সাদা ঘন কুয়াশা। হালকা বাতাসে পাক খেয়ে খেয়ে উঠে যাচ্ছে। ব্রিজে দাঁড়িয়ে দেখার চেষ্টা করছে ওরা, কিন্তু কুয়াশার ভেতরে কি আছে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কেমন ভয় ভয় একটা অনুভূতি ওদের মনে, ধরা-ছোঁয়া-বোঝার বাইরের কোন কিছুর প্রতি যেমন থাকে মানুষের, তেমনি। ধোঁয়াটে আর্দ্র কুয়াশার প্রাথমিক হালকা স্তর ইতিমধ্যে উঠে এসেছে জাহাজের ওপর। তাতে ডুবন্ত সূর্যের রশ্মি পড়ে ধূসর-কমলায় মেশানো এক অদ্ভুত আলো ছড়িয়ে দিয়েছে চারদিকে।

বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটেছে রিচার্ডের কপালে। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে মুছে নিয়ে আবার তাকাল হুইল হাউসের জানালা দিয়ে। বলল, 'সাধারণ কুয়াশার মতই মনে হচ্ছে। তবে ঘনত্ব একটু বেশি, এই যা।'

'মোটেই সাধারণ নয় ওই কুয়াশা, শুধু রঙটা ছাড়া,' বলল রানা। সামনের দিকে তাকিয়ে দেখছে। কুয়াশার জন্যে পিকারিঙের বো-এর ওপাশে আর নজর চলছে না এখন। 'আবহাওয়া গরম। দিন এখনও শেষ হয়নি। বাতাসের গতি তিন নট। এর কোনটাই সাধারণ কুয়াশা সৃষ্টির উপযোগী নয়।' রিচার্ডের পাশে দাঁড়িয়ে রাডারের ওপর ঝুঁকল রানা। প্রায় এক মিনিট তাকিয়ে থাকল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে মনে মনে কি হিসেব করে নিল। 'বেশি নড়াচড়া করতে চাইছে না যেন বাতাস, দেখে মনে হচ্ছে কুয়াশার সঙ্গে পেরে উঠছে না। নাহ্, স্বাভাবিক কুয়াশা বলে মানতে পারছি না।'

পোর্ট ব্রিজ উইংএ বেরিয়ে এল দু'জনে। অদ্ভুত আলোর পটভূমিকায় দুটো ছায়ামূর্তির মত দেখাচ্ছে ওদেরকে। হালকা বাতাসে ছোট ছোট ঢেউ উঠেছে সাগরে, অল্প অল্প দুলছে জাহাজ।

রানার মনে হলো, সময় যেন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে হঠাৎ। নাক কুঁচকে

বাতাসে গন্ধ শুঁকছে সে। চেনা চেনা একটা গন্ধ, কিন্তু ঠিক চিনতে পারছে না। কিসের গন্ধ, মনে করার চেষ্টা করছে। পারছে না…পারছে না…তারপর মনে পড়ে গেল। মুখ ফসকেই যেন বেরোল শব্দটা, চাপা উত্তেজনা গলায়। 'ইউক্যালিপটাস!'

'কি বললেন?' জানতে চাইল রিচার্ড।

'ইউক্যালিপটাস,' আবার বলল রানা। 'কেন, গন্ধ পাচ্ছেন না?'

'গন্ধ পাচ্ছি, কিন্তু কিসের, বুঝতে পারছি না।'

'কিছু মনে করবেন না, বাড়ি কোথায় আপনার, জানতে পারি?' পরিষ্কার কণ্ঠ রানার।

অবাক হয়ে রানার দিকে তাকাল রিচার্ড। 'মিনেসোটা। কেন?'

'এইজন্যেই চিনতে পারছেন না,' বলল রানা। 'সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া আর অস্ট্রেলিয়ায় জন্মায় ইউক্যালিপটাস গাছ। অদ্ভুত একটা সুগন্ধ আছে। এক ধরনের তেল বের করা হয় এই গাছ থেকে, শ্বাসরোগের ওষুধ।'

'বুঝলাম। কিন্তু এই কুয়াশার সঙ্গে এর সম্পর্ক কি?'

'এখনও জানি না। তবে ইউক্যালিপটাসেরই যে গন্ধ, এতে কোন সন্দেহ নেই।'

রিচার্ডের দুই হাতের আটটা আঙুলের নখ তালুতে চেপে বসেছে। রানার দিক থেকে মুখ ফেরাল। 'কি ভাবছেন? কি করা উচিত এখন আমাদের?'

'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে কেটে পড়া।'

'আমিও ঠিক এই কথাটাই ভাবছি।' ফিরে গিয়ে আবার হুইল হাউসে ঢুকল রিচার্ড। ইন্টারকমের ওপর ঝুঁকে বলল, 'এঞ্জিন রুম? কত তাড়াতাড়ি রওনা হতে পারব আমরা?'

'যখন বলবেন, কমান্ডার,' যান্ত্রিক গলা শোনা গেল স্পীকারে।

'তাহলে এখুনি!' ফিরে অল্প বয়েসী একজন লেফটেন্যান্টের দিকে তাকাল রিচার্ড। 'লেফটেন্যান্ট জলদি নোঙর তোল।'

'ইয়েস, কমান্ডার,' জানাল লেফটেন্যান্ট।

আবার ইন্টারকমে ঝুঁকল রিচার্ড। 'ডিটেকশন রুম? কমান্ডার রিচার্ড। কোন রীডিং?'

'স্মিথ বলছি, স্যার। সব শান্ত। সামনের দিকে একশো গজ দূরে শুধু একটা মাছের ঝাঁক…আর কিছু না।'

'কতগুলো মাছ, এবং কত বড়, জিজ্ঞেস করুন,' রিচার্ডকে বলল রানা। থমথমে হয়ে উঠেছে ওর চেহারা।

নীরবে মাথা ঝাঁকাল রিচার্ড। ডিটেকশন রুমের কাছে জানতে চাইল।

'আনুমানিক…দু'শোর ওপরে!…তিন ফ্যাদম নিচে রয়েছে পানির।' ডিটেকশন রুম থেকে জবাব এল।

'কত বড়, জানতে চেয়েছি আমি!'

'লম্বায় পাঁচ থেকে সাত ফুটের ভেতরে।'

স্পীকারের দিক থেকে রিচার্ডের দিকে চোখ ঘুরে গেল রানার। 'মাছ নয়। মানুষ।'

হাঁ, করে রানার দিকে তাকিয়ে রইল রিচার্ড। 'মানুষ?'

'হ্যাঁ, মানুষ। জাহাজগুলোকে ওরাই আক্রমণ করে।'

'কিন্তু জাহাজে ওঠে কি করে? পানি থেকে ডেক তো অনেক উঁচুতে। এই যে, পিকারিঙের ডেকই তো বিশ ফুট ওপরে।'

'কি করে জানি না, তবে ওঠে ওরা। পিকারিঙেও উঠবে।'

'হা-রা-ম-জাদারা!' কঠিন কর্কশ গলা রিচার্ডের। ছোঁ মেরে মাইক্রোফোন তুলে নিল। সারা জাহাজে গম গম করে উঠল তার গলা। 'লেফটেন্যান্ট হ্যামিশ, সবাইকে সাইডআর্মস দিয়ে দাও। মেহমান আসছে, ওদেরকে আমরা চাই না।'

'বিশাল একটা দলের বিরুদ্ধে কয়েকটা সাইডআর্মস কিছুই না,' বলল রানা। 'রেলিঙ টপকাতে পারলে হাতে টিপেই আমাদের মেরে ফেলবে। দু'শো বনাম পনেরো...উঁহুঁ!'

'ওদেরকে থামাবই আমরা,' জোর গলায় বলল রিচার্ড।

'জাহাজ ছাড়ার-জন্যে তৈরি হোন বরং।'

'না,' শান্ত গলায় বলল রিচার্ড। 'এত সহজে নেভির একটা জাহাজ দখল করতে দেব না আমি। কিছুটা লোকসান দিতেই হবে ওদের।' চেহারার কঠিন ভাবটা আচমকা ঝেড়ে ফেলে হাত বাড়াল রিচার্ড। 'এখানে কি কি ঘটেছে অ্যাডমিরাল ম্যাকডেভিডকে জানাবেন...।'

রিচার্ডের বাড়ানো হাতটা অগ্রাহ্য করল রানা। 'আপনিই জানাতে পারবেন। পিকারিঙের একজন নাবিককেও ফেলে যাচ্ছি না আমি। পালালে সবাই একসঙ্গে পালাব। নইলে থাকছি আমিও।'

বাঁকা একচিলতে হাসি ফুটল রিচার্ডের ঠোঁটে। 'গুড লাক! কপ্টারে উঠতে বলে দিচ্ছি সবাইকে।'

'ফ্লাইট প্যাডে আপনার সঙ্গে দেখা হচ্ছে,' বলেই ঘুরে দাঁড়াল রানা। বেরিয়ে গেল দ্রুতপায়ে।

জাহাজটাকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছে কুয়াশা। ধূসর রঙের বিশাল এক চাদর যেন ধীরে ধীরে নেমে আসছে পিকারিঙের ওপর, নিঃশব্দে। বেজায় ভারী আবহাওয়া, আলো ক্ষীণ। পাইলটের সীটে বসে সাগর দেখতে পাচ্ছে না রানা, আকাশ দেখতে পাচ্ছে না। ককপিটের জানালা দিয়ে আশপাশে মাত্র দু'শো বর্গফুট পর্যন্ত দৃষ্টি চলছে, তা-ও আবছাভাবে। প্রি-ফ্লাইট চেকলিস্টে মন দিল সে।

স্টার্টার সুইচ টিপল রানা। বিচিত্র আওয়াজ তুলে মাথার ওপরে ঘুরতে শুরু করল রোটর ব্লেডগুলো। ককপিট উইনডো দিয়ে বাইরে তাকাল সে, সূর্যের শেষ চিহ্নও হারিয়ে গেছে।

ইনস্ট্রুমেন্টস প্যানেলের গজগুলোর কাঁটা নরমাল অপারেটিং পজিশনে এসে গেল। কো-পাইলটের সীটের ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে তোয়ালে-মোড়ানো

মাউজারটা তুলে নিল রানা। পুঁটুলি থেকে পিস্তলটা বের করে শোল্ডার স্টক লাগাল। রিসিভারে ঢুকিয়ে দিল পঞ্চাশ গুলির ক্লিপটা। তারপর অস্ত্রটা হাতে নিয়ে নেমে এল ককপিট থেকে। ভূতুড়ে আলো ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। পরিষ্কারভাবে কিছুই দেখার উপায় নেই। বসে পড়ল রানা, ল্যান্ডিং স্কিডের আড়ালে রয়েছে। সামনের আবছা অন্ধকারের দিকে পিস্তল তাক করে রাখল।

নব্বই সেকেন্ড অপেক্ষা করতে হলো রানাকে। তারপর এল ওরা। জাহাজের পেছন দিকের রেলিঙ টপকে ডেকে এসে নামল দুটো ছায়ামূর্তি। থর থর করে কাঁপছে হেলিকপ্টার, এদিকে তাকাল মূর্তিদুটো। সামান্য কুঁজো হয়ে এগিয়ে আসতে লাগল।

অপেক্ষা করতে লাগল রানা। মূর্তিদুটো আরও কাছিয়ে এলে নিশ্চিত হয়ে নিল, ওরা পিকারিঙের কেউ নয়। গর্জে উঠল রানার হাতের পিস্তল। প্রায় একই সঙ্গে ডেকে গড়িয়ে পড়ল দুটো অর্ধনগ্ন মূর্তি, টুঁ শব্দটি করল না। হাতের প্রোজেকটাইল গান ছিটকে পড়ল ইস্পাতের ডেকে, ধাতব আওয়াজ উঠল।

খাড়া হয়ে উঠল রানা। পুরো তিনশো ষাট ডিগ্রী ঘুরে দেখে নিশ্চিত হয়ে নিল—আশেপাশে আর কেউ নেই। তারপর এগিয়ে গিয়ে পড়ে থাকা লোক দুটোকে ভাল করে দেখল।

বেকায়দা ভঙ্গিতে হাত-পা ছড়িয়ে পাশাপাশি পড়ে আছে লোক দু'জন। দু'জনেরই বুকে লেগেছে গুলি। কোমরে জড়ানো এক টুকরো করে সবুজ কাপড়। একই পোশাক দেখেছে রানা স্করপিয়নে গার্ড দু'জনের পরনে। একই জাতের অস্ত্র নিয়ে এসেছে। এদের দু'জনের কাছে বাড়তি আরেকটা জিনিস দেখতে পেল রানা। হয়তো এই একই জিনিস স্করপিয়নে দেখা গার্ড দু'জনের কাছেও ছিল, কিন্তু তাড়াহুড়ো আর উত্তেজনার মাঝে খেয়াল করেনি সে। বগলের নিচে একটা করে ছোট্ট প্লাস্টিকের বাক্স চামড়ার সঙ্গে আটকে দেয়া হয়েছে।

জিনিসগুলো কি, আরও ভাল করে দেখার জন্যে ঝুঁকল রানা। এই সময়ই চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল, হ্যান্ডরেইলের ওপরে ধীরে ধীরে মাথা তুলছে আরেকটা মূর্তি। পিস্তল তুলেই গুলি করল রানা। রোটর ব্লেডের আওয়াজকে ছাড়িয়ে আরেকবার গর্জে উঠল মাউজার। রেলিঙের ওপাশে আচমকা অদৃশ্য হয়ে গেল মূর্তিটা।

কুঁজো হয়ে হয়ে অতি সাবধানে এগিয়ে হ্যান্ডরেইলের কাছে পৌঁছে গেল রানা। রেলিঙে আটকানো অবস্থায়ই পেল জিনিসটা। একটা গ্র্যাপলিং হুক, নোঙরের মত বাঁকানো ছয়টা চোখা কাঁটা, রাবারের মোটা ফোম দিয়ে ঢাকা। হুকের গোড়ায় বাঁধা দড়ি নেমে গেছে নিচে পানি পর্যন্ত। কি করে ওই আজব মানুষেরা সাগর থেকে জাহাজে উঠে আসে, বোঝা গেল।

প্রচণ্ড শব্দে হঠাৎ গর্জে উঠল পয়েন্ট ফোর ফাইভ অটোমেটিক পিস্তল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শোনা গেল থারটি ক্যালিবার কারবাইনের কর্কশ তীক্ষ্ণ চিৎকার। কুয়াশার ভেতর থেকে ভেসে এল আহত মানুষের আর্তনাদ। সবই শুনতে পাচ্ছে, কিন্তু কিছুই দেখতে পাচ্ছে না রানা।

তীক্ষ্ণ আওয়াজ তুলে হেলিকপ্টারের পাশ দিয়ে গিয়ে সাগরে পড়ল একটা বুলেট। চমকে উঠল রানা। একটা বুলেটই অনেক ক্ষতি করে দিতে পারে এখন, অকেজো করে দিতে পারে হেলিকপ্টারকে। তাহলে পিকারিঙের পনেরোজন লোকের একজনও প্রাণে বাঁচতে পারবে না আর।

কুয়াশার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল তিনজন লোক, প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল ফ্লাইট প্যাডের ওপর। তিনজন নাবিক। দর দর করে ঘামছে, আতঙ্কে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে চোখ। পোশাক দেখে ওদের পিকারিঙের লোক বলে চিনতে পারল রানা। গম গম করে উঠল তার গলা, 'জলদি, জলদি কপ্টারে উঠে পড়ো!'

নাবিকেরা কপ্টারে উঠল কিনা, দেখছে না রানা। ওদেরকে পেছন করে আছে, ওপাশে কুয়াশার ভেতরে কি ঘটছে বোঝার চেষ্টা করছে।

এক মিনিট পরে কুয়াশার ভেতর থেকে আরও একটা মূর্তি বেরোল। ছুটতে ছুটতে এসে আছাড় খেলো পিচ্ছিল ডেকে। চিত হয়ে পড়ল। পিছলে রেলিঙের দিকে চলে যাচ্ছে তার দেহটা। হাত দুটো শূন্যে তুলে বাতাস খামচে ধরে নিজেকে ঠেকাবার ব্যর্থ চেষ্টা করল। পায়ের কাছ দিয়ে চলে যাবার সময় থাবা মারল রানা। লোকটার একটা হাত জোরে চেপে ধরল।

'আস্তে,' লোকটাকে টেনে খাড়া করে দিল রানা, 'বাড়ি অনেক দূর। সাঁতরে যেতে পারবে না।'

'সরি, স্যার,' লজ্জিত কণ্ঠে বলল তরুণ নাবিক। 'ওই হারামজাদারা দারুণ ভয় পাইয়ে দিয়েছে। কি করব!...কিছু বুঝে ওঠার আগেই খতম করে দিচ্ছে ব্যাটারা!'

ঠেলে লোকটাকে হেলিকপ্টারে তুলে দিল রানা। ধূসর অন্ধকারের ভেতর থেকে ছুটে এসে হাজির হলো আরও চারজন। তাঁদের একজন হেল্‌ম্‌স্‌ম্যান, প্রায় টেনে হিঁচড়ে নিয়ে এসেছে ডিক্সনকে। আশেপাশের কোন কিছুর দিকেই যেন খেয়াল নেই সীম্যানের। মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছে, সন্দেহ নেই। ঘোলাটে চোখে রানার দিকে তাকাল ডিক্সন।

'কো-পাইলটের সীটে বসিয়ে দাও,' হেল্‌ম্‌স্‌ম্যানকে নির্দেশ দিল রানা। 'কষে সীটবেল্ট বেঁধে দিও।' বলেই জাহাজের সামনের দিকে ঘুরল সে। কান পেতে কিছু শোনার চেষ্টা করছে। অনিয়মিত ভারী পায়ের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

'রানা, আপনি ওখানে?' চেঁচিয়ে ডাকল কেউ।

'চলে আসুন,' চেঁচিয়েই জবাব দিল রানা। 'আস্তে হাঁটুন। চমকে দেবেন না আমাকে।'

'আস্তেই হাঁটছি,' কুয়াশার ভেতর থেকে আবার কথা শোনা গেল। 'আহত একজনকে বয়ে আনতে হচ্ছে।'

কুয়াশার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল লেফটেন্যান্ট মরিস, এঞ্জিনিয়ারিং অফিসার। বিশালদেহী, ওজন সোয়া তিন মনের কম হবে না। কাঁধে বয়ে আনছে আঠারো উনিশ বছরের একটা ছেলেকে। ছেলেটার মুখের রঙ ছাইয়ের মত হয়ে

গেছে, ডান পা থেকে সমানে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। হাত বাড়িয়ে ছেলেটার একটা বাহু চেপে ধরল রানা। মরিসকে সাহায্য করল। দু'জনে মিলে ফ্লাইট প্যাডে নামিয়ে রাখল ছেলেটাকে।

'আর ক'জন আছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আমরাই শেষ,' জবাব দিল মরিস।

'কমান্ডার?'

'একদল ন্যাংটো শুয়োর ঝাঁপিয়ে পড়েছে তাঁর ওপর। লেফটেন্যান্ট স্মিথও তাঁর সঙ্গেই রয়েছে, ব্রিজে।' লজ্জিত শোনাল মরিসের কণ্ঠ, 'দুজনেই হয়তো শেষ হয়ে গেছে এতক্ষণে।'

'ছেলেটাকে হেলিকপ্টারে তুলুন। রক্তপড়া বন্ধ করা যায় কিনা দেখুন চেষ্টা করে,' নির্দেশ দিল রানা। 'আপনাদের অস্ত্রপাতি যা আছে তাই দিয়ে আক্রমণ এলে হেলিকপ্টারটাকে বাঁচাবেন। আমি আসছি।'

'সাবধানে থাকবেন, স্যার! আপনিই আমাদের একমাত্র পাইলট। ওরা অনেক লোক।'

কোন কথা বলল না আর রানা। প্যাড থেকে লাফিয়ে নেমে অন্ধের মত ছুটল কুয়াশার ভেতর দিয়ে। পিচ্ছিল ডেকে পা পিছলে যাচ্ছে। শ্বাস-প্রশ্বাস ভারী। কুয়াশার ভেতরে আবছা নগ্ন মূর্তি দেখা গেলেই গুলি করে শেষ করে দিচ্ছে। পর পর তিনটে লোককে শুইয়ে দিল রানা। আর কেউ আসছে কিনা দেখতে দেখতে ছুটল। নিচের দিকে নজর না থাকায় দড়ির বান্ডিলটা দেখতে পেল না। হোঁচট খেয়ে উড়ে গিয়ে পড়ল দড়াম করে। বেরিয়ে থাকা কয়েকটা বল্টুর মাথায় বাড়ি খেল বুক। ব্যথায় দম বন্ধ হয়ে যাবার জোগাড় হলো। চোট খাওয়া হাঁটুটা সাংঘাতিক জোরে বাড়ি খেয়েছে ডেকের সঙ্গে। রানার মনে হলো, হাতুড়ি দিয়ে পেটাচ্ছে কেউ হাঁটুতে। চারদিক শান্ত, নীরব। গুলির শব্দ নেই, আহতের আর্তনাদ নেই।

কোনমতে নিজেকে টেনে তুলল রানা। হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চলল। খানিকটা এগিয়েই পিচ্ছিল ভেজা তরল পদার্থ ঠেকল হাতে। কি জিনিস, না দেখেই বুঝতে পারল। রক্ত ধরে ধরে এগিয়ে চলল সে। কোথাও ফোঁটা ফোঁটা, কোথাও বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে রক্ত পড়ে আছে।

লেফটেন্যান্ট স্মিথের কাছে এসে শেষ হলো রক্ত। রক্তের খুদে হ্রদ সৃষ্টি করে তাতে পড়ে আছে ডিটেকশন রুম অফিসার। মৃত।

দাঁতে দাঁত চাপল রানা। মৃত স্মিথের জন্যে আর কিছুই করার নেই; তাই এক সেকেন্ডের বেশি থামল না এখানে। রিচার্ডের কি অবস্থা, কে জানে! এগোতে গিয়েই থমকে গেল রানা। ঠিক সামনে থেকেই একটা চাপা গোঙানি ভেসে এল। চোখ তুলে তাকাল সে, কিন্তু কুয়াশার জন্যে কিছুই দেখতে পেল না। সাবধানে সামনে এগোল আবার।

ওদের গায়ের ওপর প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে সামলে নিল রানা। রিচার্ডকে নিয়ে এত ব্যস্ত ওরা, রানাকে দেখতে পেল না। উপুড় হয়ে আছে রিচার্ড,

ক্রল করে এগোনোর ব্যর্থ চেষ্টা করছে। কাঁধ এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিয়েছে একটা চার ফুট লম্বা মাছ-মারা বল্লম। কমান্ডারের মাথাটা ঝুলে আছে ডেকের ওপর, হাত মুষ্টিবদ্ধ, রক্তে লাল হয়ে গেছে টি-শার্ট। তার অসহায় দেহটাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে তিনজন অর্ধনগ্ন লোক। রিচার্ড সামনে এগোনোর চেষ্টা করলেই তার তলপেটে লাথি মারছে দুজনে। অন্য একজন লাথি মারছে পিঠে বিঁধে থাকা বল্লমটার মাঝামাঝি জায়গায়। গোঙানি বেরিয়ে আসছে রিচার্ডের চেপে রাখা দাঁতের ফাঁক দিয়ে। মজা পেয়ে হাসছে লোকগুলো।

খুন চড়ে গেল রানার মাথায়। কুয়াশার ভেতর থেকে দুঃস্বপ্নের মত ওদের মাঝে এসে হাজির হলো সে। মুখ থেকে হাসি মিলানোর আগেই বাঁ চোখটা অদৃশ্য হয়ে গেল একজনের। অন্য দু'জন অবাক হয়ে তাকাল টলে ওঠা সঙ্গীর দিকে। বড় বড় হয়ে গেল চোখ। শেষ বীটটা পুরো শেষ করতে পারল না তাদের হৃৎপিণ্ড, তার আগেই থেমে গেল জন্মের মত। মাউজারের আওয়াজ মিলানোর আগেই কুয়াশার ভেতর থেকে এসে হাজির হলো চতুর্থ একজন। চলার গতি থামানোর আগেই নাড়িভুঁড়ির ছেঁড়া টুকরো ছিটকে বেরোল মেরুদণ্ড বরাবর বিশাল গর্ত দিয়ে। উল্টে পড়ে গেল লোকটা।

ঘোলাটে চোখে রানার দিকে তাকিয়ে আছে রিচার্ড। ব্যথায় মুখ বিকৃত। রানা ফিরে চাইতেই বলল, 'আপনি আবার এসেছেন কেন?'

'ভুল হয়ে গেছে, মাফ করে দেবেন, কমান্ডার,' হাসল রানা। 'নিজেকে শক্ত করুন, বল্লমটা খুলতে হবে।' মাউজারটা বেল্টে গুঁজল। তারপর রিচার্ডকে টেনে একটা বাল্কহেডের কাছে নিয়ে এল। সতর্ক চোখ রেখেছে চারদিকে, আরও এক-আধটা জল্লাদ এসে পড়ে কিনা দেখছে। কিন্তু আর কেউ এল না। বল্লমের ডান্ডাটা দুই হাতে চেপে ধরল রানা। বলল, 'এক থেকে তিন পর্যন্ত গুণব। তারপরেই টান মারব।'

প্রচণ্ড ব্যথার ছাপ রিচার্ডের চোখে, তবু ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটল তার। পরিষ্কার গলায় বলল, 'দ্রুত···খুব দ্রুত কাজ সারবেন, বলে দিচ্ছি। নইলে ব্যথাতেই হার্টফেল করব।'

বল্লমের ডাণ্ডায় হাতের চাপ বাড়াল রানা। শান্ত গলায় গুণল, 'এ-ক।' জুতোসুদ্ধ একটা পা তুলে দিল রিচার্ডের পিঠে। 'দু-ই···!' বলার সঙ্গে সঙ্গেই হ্যাঁচকা টান মারল। রিচার্ডের পিঠ থেকে খসে এল রক্তে লাল হয়ে যাওয়া বল্লমের মাথাটা।

জোরে গুঙিয়ে উঠল রিচার্ড, ডেকের ওপর শরীরের ভার ছেড়ে দিল। ধীরে ধীরে চিৎ হয়ে গেল। ঝকঝকে চোখ মেলে তাকাল রানার দিকে, 'মস্ত হারামী লোক তুমি, রানা! তিন বলোনি···!' চোখের মণি উল্টে কপালের দিকে উঠে গেল। জ্ঞান হারাল রিচার্ড।

বল্লমটা ছুঁড়ে ফেলে দিল রানা। অনেক কায়দা-কসরৎ করে রিচার্ডের ভারী দেহটা কাঁধে তুলে নিল। এক হাঁটুতে জখম, পিঠে ভারী বোঝা নিয়ে ছোটা তো দূরের কথা, হাঁটতেই কষ্ট হচ্ছে। কোনমতে টলতে টলতে এগোল।

চলতে চলতে দুইবার থমকে দাঁড়াতে হয়েছে। কুয়াশার ভেতর থেকে ভেসে আসা সন্দেহজনক শব্দ কানে যাওয়ায় স্থির হয়ে থেমে গেছে। ওই দুইবারই, তারপর আর কোন শব্দ কানে এল না রানার।

গায়ে জোর পাচ্ছে না রানা। এগারোজন লোকের জীবন নির্ভর করছে তার ওপর, শুধু এই চিন্তাটাই ঠেলে নিয়ে চলেছে তাকে। পা উঠতে চাইছে না। কয়েক মন সীসে যেন বেঁধে দেয়া হয়েছে পায়ে, এমনি ভারী লাগছে। ঘড়ঘড় শব্দ হচ্ছে গলায়, বুকের খাঁচা থেকে বেরোতে চেষ্টা করছে যেন হৃৎপিণ্ডটা।

অনেক কষ্টে শেষ পর্যন্ত ফ্লাইট প্যাডের কাছে এসে দাঁড়াল রানা। 'আ-আ-আমি এসেছি...' হাঁপানোর ফাঁকে তার মুখ থেকে কোনমতে শব্দদুটো বেরিয়ে এল।

রানার কাঁধ থেকে অনায়াসে রিচার্ডের দেহটা তুলে নিল মরিস, বাচ্চা খোকার কাছ থেকে একটা পুতুল নিয়ে নিল যেন। কমান্ডারের অজ্ঞান দেহটা বয়ে নিয়ে গিয়ে হেলিকপ্টারে তুলল।

কোমরের বেল্ট থেকে মাউজারটা টেনে খুলে নিল রানা। জাহাজের বো-এর দিকে নিশানা করে একটানা গুলি করে গেল। সবক'টা বুলেট শেষ করার আগে থামল না। বুলেটের শেষ খোসাটা ডেকে ছিটকে পড়ার শব্দ শুনে তারপর ককপিটে উঠে এল রানা। পাইলটের সীটে বসে পড়ল।

সেফটি বেল্ট বাঁধার জন্যে সময় নষ্ট করল না সে। থ্রটলে হাত দিল। রোটর ব্লেডের গুঞ্জন বাড়তে লাগল। ফ্লাইট প্যাড থেকে ধীরে ধীরে শূন্যে উঠতে শুরু করল ল্যান্ডিং স্কিড। কয়েক ফুট ওঠার পর হেলিকপ্টারকে সামনে ছোটাল রানা।

জাহাজের ওপর থেকে সরে এসেছে হেলিকপ্টার। জানালার বাইরে তাকাল রানা। কিন্তু আকাশ কোথায়? চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করছে তার মন: কোথায়? কোথায়? চারদিকে, ওপরে, নিচে গাঢ় ধূসর অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই নেই।

কয়েক মিনিট পর আচমকাই কুয়াশার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল হেলিকপ্টার, আকাশ দেখতে পেল রানা। অন্ধকার নেই, তার বদলে চাঁদের পরিষ্কার আলো।

হেলিকপ্টারের নাক ঘোরাল রানা। নিচে সামনের দিকে সাগরের পানিতে বিশাল ছায়া পড়েছে। চাঁদের আলোয় তার নিজের ছায়াকেই তাড়া করে ছুটে চলল যান্ত্রিক ফড়িংটা। দূরে...বহুদূরে হাওয়াইয়ের সবুজ নারকেল বীথি...

আবার কিছুক্ষণের জন্যে চিন্তাশক্তি লোপ পেল রানার।

বারবার কী হচ্ছে এটা?

তিন

পরদিন সকাল দশটা নাগাদ হোটেলে নিজের ঘরে এসে ঢুকল রানা। ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে শরীর। চোখ লাল, জ্বালা করছে। সামান্য খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে

হচ্ছে। হাঁটুতে ভাল করে ব্যান্ডেজ বাঁধা হয়েছে। শক্ত হয়ে আছে জায়গাটা, কিন্তু ব্যথা নেই। ঘুমে জড়িয়ে আসছে চোখ। শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে কোনমতে মাথা খাড়া রেখেছে। গরম পানি দিয়ে গা-টা ধোয়া শেষ হলেই গিয়ে পড়বে বিছানায়, তারপর চব্বিশ ঘণ্টার জন্যে একটানা ঘুম।

পার্ল হারবারে যায়নি রানা, কিংবা হিকাম ফিল্ডের হেলিপোর্টেও কপ্টার নামায়নি। সোজা উড়ে এসেছে ট্রিপলার মিলিটারি হাসপাতালে, ইমার্জেন্সীর দু'শো ফুট দূরে নিখুঁতভাবে ল্যান্ড করিয়েছে হেলিকপ্টার। কংক্রিটের বাড়িটা তৈরি করা হয়েছে একটা পাহাড়ের মাথায়, ওয়াহুর দক্ষিণ উপকূলের দিকে মুখ করে রিচার্ড আর তরুণ নাবিকটিকে তাড়াতাড়ি অপারেটিং টেবিলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। রানার হাঁটুর কাটাটা সেলাই করে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়েছে একজন আর্মি ডাক্তার। রানাকেও হাসপাতালে ভর্তি করে নেবার তাল তুলেছিল, নিঃশব্দে সবার অলক্ষ্যে এক পাশের দরজা দিয়ে কেটে পড়েছে সে। একটা ট্যাক্সি ডেকে উঠে পড়েছে চট করে। গাড়িতে বসে বসে ঝিমিয়েছে। ওয়াইকিকি বীচে এসে তাকে জাগিয়ে দিয়েছে ড্রাইভার।

হোটেলে ঢোকার মুখেই দেখা হয়ে গেছে গিলটি মিঞার সঙ্গে। সরল নিষ্পাপ দুই চোখ মেলে রানার দিকে তাকিয়ে থেকেছে গিলটি মিঞা, রানার অবস্থা দেখে অবাক হয়েছে। প্রথমে কোন কথা বলেনি, আগের কথামত অচেনার ভান করে থেকেছে। কিন্তু হাত তুলে ডেকেছে ওকে রানা, গোপনীয়তার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। গিলটি মিঞার বেডিংপত্র নিয়ে তাড়াতাড়ি তার হোটেলে চলে আসার নির্দেশ দিয়েছে। কিছু একটা জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিল গিলটি মিয়া, কিন্তু সুযোগ দেয়নি রানা। ঘুরেই হাঁটতে শুরু করেছে।

বিছানায় শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল রানা। কিন্তু আধ ঘণ্টা পরেই ঘুম ভেঙে গেল তার। দরজায় থাবা মারছে কেউ। জোর করে চোখ মেলল রানা। একরাশ বিরক্তি নিয়ে আস্তে আস্তে নামল বিছানা থেকে। এগিয়ে গিয়ে খুলে দিল দরজা।

হাসলে অনেক মেয়েরই সৌন্দর্য বেড়ে যায়, কাউকে আরও বেশি সুন্দরী মনে হয় কাঁদার সময়, কিন্তু আতঙ্কিত হয়ে পড়লেও রূপ বেড়ে যায় কারও কারও। দরজায় দাঁড়ানো মেয়েটা এই শেষের দলেরই একজন। লাল-হলুদ ফুল ছাপা কাপড়ের খাটো এক ধরনের গাউন পরেছে সে, নিতম্বও ঢাকা পড়েনি ভালমত—এতই মিনি। বড় বড় চোখ আতঙ্কে বিশাল দেখাচ্ছে।

এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে দেখল রানা, তারপর সরে ঢোকার জায়গা করে দিল কোরিনকে। ঘরে ঢুকল কোরিন, সোজা এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল রানার বুকে। থর থর করে কাঁপছে, শ্বাস নিচ্ছে ঘন ঘন।

'কোরিন···কি হয়েছে, কোরিন?'

'ও-ওরা···ওকে মেরে ফেলেছে···' কান্নায় জড়িয়ে গেল কোরিনের গলা।

কোরিনকে ঠেলে এক পা পেছনে সরাল রানা। ভেজা ভেজা ফোলা চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কি বলছ?'

ফোঁপানোর ফাঁকে ফাঁকে বেরিয়ে এল কোরিনের কথাগুলো। 'আমি…আমি বিছানায় শুয়ে ছিলাম…একজন বন্ধুর সঙ্গে। ছাদ থেকে জানালা গলে এসে ঘরে ঢুকল ওরা…তিনজন…এতই নিঃশব্দে, টেরই পাইনি প্রথমে। যখন পেলাম, অনেক দেরি হয়ে গেছে। ওদেরকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করেছে ও, কিন্তু পারেনি। হাতে ওদের অদ্ভুত পিস্তল, গুলি করলে আওয়াজ হয় না। অন্তত দশ-বারো বার গুলি করেছে ওরা। সারা ঘর রক্তে একেবারে…ওফ্…' শিউরে উঠল কোরিন।

ধরে ধরে কোরিনকে একটা কাউচের কাছে নিয়ে এল রানা। ধরে রাখল।

'চেঁচিয়ে উঠেই ছুটলাম,' আবার বলল কোরিন। 'আলমারিটার ভেতরে ঢুকেই লক আটকে দিলাম। হেসে উঠল ওরা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসতে লাগল। ওরা ভেবেছে ফাঁদে পড়ে গেছি আমি, কিন্তু জানত না আলমারিটা টু-ওয়ে। অন্য দরজাটা গেস্ট বেডরূমের দিকে খোলে। হুক থেকে এই মুমুটা নিয়ে পরেই জানালা গলে পালালাম। ভয় পেয়েছি, কিন্তু মাথা গরম করিনি। পুলিসকে ডাকিনি। বাবাকে ফোন করেছি পাইনি। অফিস থেকে জানিয়েছে, ওকে পাওয়া যাবে না। আরও ভয় পেলাম। কোথায় যাব…কোথায় যাব, ভাবতে গিয়ে তোমার কথা মনে পড়ে গেল। সোজা চলে এলাম।'

হাত দিয়ে ডলে ভেজা চোখ মুছল কোরিন। খেয়াল করল রানা, খাটো মুমু-র তলায় আর কোন কাপড় পরেনি মেয়েটা।

'দুঃস্বপ্ন!' ফিসফিসিয়ে বলল কোরিন, 'নোংরা, ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন! কেন কাজটা করল ওরা? কেন?'

'পরে জানা যাবে। আগের কাজ আগে করো,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'বাথরূমে ঢুকে চোখমুখে পানি দিয়ে এসো। চোখের মেকাপ তো গালে নেমেছে। যাও, জলদি যাও। বেরিয়ে এসে বলবে আমাকে, কারা কাকে খুন করল। যাও।'

এক পা সরে এল কোরিন। অসহায় ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল এপাশ ওপাশ।

'যাও তো, পাগলামি কোরো না,' গলার স্বর সামান্য চড়াল রানা। 'তোমার বাসায় একটা লাশ পড়ে আছে। ব্যাপারটা কতক্ষণ গোপন রাখতে পারবে?'

'আমি…আমি জানি না…'

'লাশটাকে সনাক্ত করতে হনলুলু পুলিসের বিশ মিনিটের বেশি লাগবে না। খামোকা দেরি করছ। আসলে কে লোকটা? বিবাহিত? বাচ্চাকাচ্চা আছে?'

'তারচেয়েও খারাপ। বাবার বন্ধু।' কাতর চোখে রানার দিকে তাকাল কোরিন।

'নাম?'

চেহারায় কালিমা পড়ল কোরিনের। 'ক্যাপ্টেন হেই ম্যাকেঞ্জী,' নিচু গলায় বিড়বিড় করে বলল সে। 'বাবার ফ্লীট অফিসারদের একজন।'

জোর করে চেহারা ভাবলেশহীন রাখল রানা। যা ভেবেছিল, অবস্থা তার চেয়েও খারাপ। আঙুল তুলে বাথরূমের দরজাটা দেখিয়ে একটা শব্দ উচ্চারণ করল, 'যা-ও!'

আর প্রতিবাদ করল না কোরিন, লক্ষ্মী মেয়ের মত আস্তে গিয়ে দাঁড়াল

বাথরুমের কাছে। দরজা খুলে ফিরে চাইল। অসহায় বোকাটে এক চিলতে হাসি ফুটল মুখে। তারপর ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

বাথরুমে পানির শব্দ উঠতেই টেলিফোনের কাছে চলে এল রানা। কোরিনের চাইতে তার কপাল ভাল। পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যেই কথা বললেন অ্যাডমিরাল ম্যাকডেভিড। তার বেয়ে ছুটে এল অ্যাডমিরালের ঠাস্ ঠাস্ কথা।

'হাসপাতালে পৌঁছে আমাকে রিপোর্ট করেননি কেন?' অভিযোগ করলেন অ্যাডমিরাল।

'রিপোর্ট করার মত অবস্থা ছিল না আমার, স্যার,' বলল রানা। 'সাংঘাতিক কাহিল হয়ে পড়েছিলাম। ঘুমের জন্যে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলাম না। ফিরে এসে গা-টা ধুয়ে নিয়েই বিছানায় গিয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু আপনার মেয়ের জন্যে থাকতে পারলাম না।'

পুরোপুরি বদলে গেল ম্যাকডেভিডের গলা। 'আমার মেয়ে? কোরিন? আপনার ওখানে?'

'ওর বাসায় একটা লাশ পড়ে আছে। আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেনি, তাই এখানে চলে এসেছে।'

পুরো দুই সেকেন্ড স্তব্ধ হয়ে রইলেন অ্যাডমিরাল। তারপর শোনা গেল কথা, পরিষ্কার গলা। 'খুলে বলুন সব।'

'আমিও বেশি জানি না। বেশি কিছু এখনও বলেনি আমাকে কোরিন। আমার যা মনে হচ্ছে, ভোরটেক্স থেকে এসে বাসার ছাতে উঠেছিল আমাদের বন্ধুরা। জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকে লোকটাকে মেরেছে। আলমারির ডবল দরজা থাকায় বেঁচে বেরিয়ে আসতে পেরেছে কোরিন।'

'ব্যথা-ট্যথা পেয়েছে?'

'না।'

'পুলিস জানে তো?'

'কোরিন পুলিসকে জানায়নি। এখনও তার বাসায়ই পড়ে আছে লাশটা, বলল।'

'থ্যাংক গড! এক্ষুণি আমাদের সিকিউরিটির লোক পাঠাচ্ছি ওখানে।'

রিসিভারে চাপা গলায় কমান্ড শুনল রানা। অনুমান করতে পারছে শ্রুতিসীমার ভেতরে অ্যাটেনশন হয়ে গেছে প্রতিটি লোক ম্যাকডেভিডের কমান্ড শুনে।

'কার লাশ চিনতে পেরেছে কোরিন?' জিজ্ঞেস করলেন, ম্যাকডেভিড।

লম্বা করে শ্বাস নিল রানা। 'ক্যাপ্টেন হেই ম্যাকেঞ্জী।'

চমক হজম করার আশ্চর্য ক্ষমতা রয়েছে অ্যাডমিরালের। নিমেষে সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কত তাড়াতাড়ি আমার অফিসে পৌঁছতে পারবেন আপনারা?'

'আধ ঘণ্টা তো লাগবেই। আমার গাড়ি এখনও হনলুলু ডকে পার্ক করা আছে। ট্যাক্সি নিতে হবে।'

'যেখানে আছেন, থাকুন। হোটেলটার ওপর খুনীরা চোখ রাখলেও অবাক হব না। এখুনি গার্ড পাঠাচ্ছি আমি।'

'ঠিক আছে। ঘরেই থাকব আমরা।'

'আরেকটা কথা। কতদিন থেকে চেনেন আপনি আমার মেয়েকে?'

'বেশ অল্পদিনই। একটা পার্টিতে দেখা হয়েছিল।' মেয়ে মানুষের কাছে মিছে কথা বলা এক কথা, ভাবল রানা, কিন্তু একজন পুরুষকে মিথ্যে কথা বলে বোঝানো অন্য কথা। যা-ই বলুক, ম্যাকডেভিড কি ভাবছেন, জানে সে। কিন্তু বলে গেল রানা, 'কথায় কথায় জানিয়েছিলাম, এই হোটেলে উঠেছি আমি। কথাটা নিশ্চয় মনে ছিল কোরিনের, দিশেমিশে না পেয়ে শেষে আমার এখানেই এসে উঠেছে।'

'কোরিন কি করে না করে আমি জানি না,' অ্যাডমিরাল বললেন। 'তবে খুব ভাল মেয়ে ও।'

চুপ করে রইল রানা। একজন বাপকে কি করে বলবে, তাঁর মেয়ে একটা সেক্স ম্যানিয়াক, চব্বিশ ঘণ্টার আঠারো ঘণ্টাই মদ খেয়ে মাতাল হয়ে থাকে। 'গার্ড এসে গেলেই পার্ল হারবারে রওনা দেব আমরা,' বলল সে। রিসিভার রেখে দিল।

বোতল থেকে গেলাসে স্কচ ঢেলে নিল রানা। চুমুক দিয়েই মুখ বিকৃত করল। বিস্বাদ লাগছে। ঠিক দশ মিনিট পর এল ওরা। রানা আর কোরিনকে পাহারা দিয়ে নিতে নয়, খুন করার জন্যে। দু'দিকে চোখ রেখেছিল রানা: কাউচে শুয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে থাকা কোরিনের দিকে, এবং দরজার দিকে। ওরা এল সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে। কিছুই করার নেই। উঠে গিয়ে যে ফোন ব্যবহার করবে, সে সুযোগ নেই। ছাত থেকে দড়ির সাহায্যে ব্যালকনিতে নেমেছে ওরা, ঘরে ঢুকেছে পাঁচজন। হাতে রানার পরিচিত সেই অদ্ভুত প্রোজেক্টাইল গান। রানার দিকে নয়, ওদের পিস্তলের মুখ তাকিয়ে আছে ঘুমন্ত কোরিনের কপালের দিকে। অনুভব করল রানা, ঘাড়ের কাছে ছোট ছোট চুলগুলো খাড়া হয়ে যাচ্ছে সড়সড় করে।

'আপনি নড়বেন, মেয়েটা মরবে,' মাঝখানের লোকটা বলল। বিশালদেহী যেন এক দৈত্য, চোখ দুটো সোনালী।

প্রথম কয়েকটা সেকেন্ড একটা ঘোরের মধ্যে রইল যেন রানা। কোন অনুভূতি নেই, চিন্তার ক্ষমতাও যেন হারিয়ে ফেলেছে। তারপর লোকটার চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে হঠাৎ করেই বাস্তবে ফিরে এল। ঠিক সোনালী নয় চোখের রং, তবে গাঢ় হলুদ, উজ্জ্বল গাঢ় হলুদ। এই লোকের কথাই বলেছে হিরাম মাতসুনাগা, সন্দেহ নেই রানার। অনেক বছর আগে কানোলির রহস্য জানার জন্যে এই লোকই গিয়েছিল বিশপ মিউজিয়মে।

কাছে এগিয়ে এল দানব। দেখে অনুমানই করা যায় না, লোকটার বয়স সত্তরের কাছাকাছি, অন্তত ত্রিশ বছর ছেঁটে দিলে তবে গিয়ে মানায়। আঁটসাঁট যুবকের মত কর্মক্ষম রয়েছে শরীর। বয়সের ভাঁজ নেই চামড়ায়, ঢিল হয়ে যায়নি মাংসপেশী। পরনে সুইমিং ট্রাংকস, কাঁধে তোয়ালে, যেন বীচের পানিতে সাঁতার শেষ করে সবে উঠে এসেছে। লম্বা, শীর্ণ মুখ, মাথায় রূপালি চুলের বোঝা। দেহটা দানবের মত, কিন্তু ভিনগ্রহ থেকে আসা কেউ যে নয়, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

মেঝের ঠিক ছয় ফুট আট ইঞ্চি ওপর থেকে রানার দিকে তাকাল হলুদ চোখ

জোড়া, কেমন যেন সম্মোহন করা দৃষ্টি। হাসল। হাসি দেখে ভয়ঙ্কর ব্যারাকুডার মুখ-ব্যাদানের কথা মনে পড়ে গেল রানার। বাউ করার ভঙ্গিতে মাথাটা সামান্য একটু নোয়াল একবার লোকটা।

'ন্যাশনাল আন্ডারওয়াটার ম্যারিন এজেন্সীর মাসুদ রানা।' শান্ত, গম্ভীর কণ্ঠ; শয়তানী কিংবা ভয়াবহতা নেই। 'নিজেকে সম্মানিত ভাবছি। অনেক আগেই আপনার নাম শুনেছি, সাগরের প্রতি আপনার দুর্বলতার কথাও জানা আছে আমার। সাগরের রহস্য নিয়ে মাথা ঘামাতে ভালবাসেন। দু'য়েকটা রহস্যের সমাধানও করেছেন আপনি। তখন থেকেই আপনার ওপর আমার নজর ছিল।'

'আ-হা-হা, আর বেশি বলবেন না, আত্মগর্বে ফুলে ঢোল হয়ে যাব তাহলে।'

'সত্যিকারের সাহসী লোকের মত কথা। এমনই আশা করেছিলাম আমি।' ফিরে সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল দানব।

দু'দিক থেকে এসে চেয়ারের সঙ্গে রানাকে শক্ত করে চেপে ধরল ওরা। বাধা দেয়ার কোন সুযোগই পেল না রানা।

'বাধ্য হয়েই এসব করতে হচ্ছে, মিস্টার রানা, মাফ চাইছি,' বলল দানব। 'বড় নোংরা কাজকারবার...তবে নোংরামি ছাড়া এ খেলা চলেও না। আপনার ওপর আমার চোখ পড়েছে, আপনার কপাল খারাপই বলতে হবে। আসলে একজন মেসেঞ্জার হিসেবে কাজ করাতে চেয়েছিলাম আপনাকে দিয়ে। কিন্তু এভাবে জড়িয়ে যাবেন পুরোপুরি, ভাবিনি।'

'স্টেজ সাজিয়েছেন বড় সুন্দর,' ধীরে ধীরে বলল রানা। 'তা কতদিন ধরে চোখ রাখছেন আমার ওপর?...স্করপিয়নের মেসেজ ক্যাপসুল আমার হাতে তুলে দেবার জন্যে কতদিন অপেক্ষা করতে হয়েছে? আমাকেই বা কেন দরকার হলো আপনার? কাজটা একটা দশ বছরের বাচ্চা ছেলেই করতে পারত। মানে, অন্য কাউকে দিয়েও তো অ্যাডমিরাল ম্যাকডেভিডের হাতে পাঠাতে পারতেন ক্যাপসুলটা। আমি কেন?'

'আপনার একটা গুরুত্ব আছে, মেজর। আমি চেয়েছিলাম লোকে বিশ্বাস করুক। ওয়াশিংটনের উঁচু মহলে বন্ধুত্ব, এমনকি কিছুটা প্রভাবও রয়েছে আপনার। আর নুমায় আপনার রেকর্ড তো রীতিমত চমৎকার। আমি জানতাম, মেসেজটা অনেকের মনেই সন্দেহ জাগাবে, বিশ্বাস করতে চাইবে না ওরা, কিন্তু আপনার খ্যাতি শেষ পর্যন্ত সন্দেহমুক্ত করবে ওদেরকে।' লোকটার ঠোঁটে মৃদু হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। রূপালি চুলে আঙুল চালাল সে। 'অথচ হলো ঠিক উল্টো। লোক বাছাইয়ে ভুল করে বসলাম আমি। সন্দেহমুক্ত করা তো দূরের কথা, যেটুকু বিশ্বাস ওদের ছিল, তা-ও নষ্ট করে দিলেন আপনি। আপনিই অ্যাডমিরাল ম্যাকডেভিডকে বোঝালেন, কমান্ডার ম্যাসনের মেসেজে গোলমাল রয়েছে।'

'এভাবে ভণ্ডুল করে দিলাম আপনার প্ল্যান, দুঃখই লাগছে,' ঠাট্টা করল রানা। তারপর কথা আদায়ের চেষ্টা করল। 'ইনফর্মার বেশ ভালই পেয়েছেন মনে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ। মাঝে মাঝে খবর বেশ ভালই দিত লোকটা।'

দীর্ঘ এক মুহূর্ত নীরবতা। ফিরে চাইল রানা, এখনও কাউচে কুকুর-কুণ্ডলী পাকিয়ে নিশ্চিন্তে নিদ্রা দিচ্ছে কোরিন। ঘরে এত কিছু ঘটে যাচ্ছে, খবরই নেই। আবার দানবের দিকে নজর ফেরাল রানা। 'আপনার নামটাই জানা হয়নি এখনও। জানানোর কোন ইচ্ছে আছে?'

'নাম জেনে আর কি করবেন?...এখন জানা না-জানা সমান কথা।'

'মেরে ফেলবেন, এই তো? মরার আগে জেনে যেতে চাই আর কি কার হাতে মরলাম। নইলে ওপারে কেউ জিজ্ঞেস করলে কি উত্তর দেব?' হাসল রানা। 'সাধারণ কৌতূহল, আর কিচ্ছু না।'

দ্বিধা করছে বিশাল লোকটা। কি ভাবল। তারপর মাথা ঝাঁকাল। 'ভেরোনি।'

'শুধু এই-ই?'

'ভেরোনিতেই তো চলে, নাকি?'

'দেখতে কিন্তু গ্রীক মনে হচ্ছে না আপনাকে।' রানার হাতদুটো চেয়ারের পেছনে নিয়ে শক্ত করে বাঁধা হয়ে গেছে। কোরিনের দিকে এখনও পিস্তল তাক করে আছে দু'জন লোক। ভেরোনির সঙ্গীদের সাধারণ চেহারা, মাঝারি উচ্চতা, রোদেপোড়া চামড়া, পায়ে চপ্পল, গায়ে শার্ট—দ্বীপের আর দশজন সাধারণ অধিবাসীদের মধ্যে সহজেই মিশে যেতে পারবে। ভাবলেশশূন্য চেহারা, নীরবে, বিনাপ্রশ্নে ভেরোনির আদেশ মানতে অভ্যস্ত। বুঝতে পারছে রানা, হলুদ-চোখোর আঙুলের সামান্য ইশারাতেই নির্দ্বিধায় খুন করবে ওরা।

'নিষ্ঠুর, দক্ষ এক সংগঠন গড়ে তুলেছেন আপনি, ভেরোনি। বছরের পর বছর ধরে এক অদ্ভুত রহস্য সৃষ্টি করে রেখেছেন। হাজার হাজার নাবিক খুন হয়েছে আপনার নির্দেশে...কিন্তু কেন?'

'দুঃখিত, মিস্টার রানা। আপনার সব প্রশ্নের উত্তর দেবার সময় আমার হাতে নেই। তাছাড়া গ্রাহাম বা প্রাইসের চেয়ে নিচুমানের কারও সঙ্গে এসব ব্যাপার নিয়ে আলোচনার মানসিকতাও নেই আমার। আসলে, বললেও বুঝবেন না কিছু। পাগল ঠাউরাবেন।'

'অ। তা আমাকে কি দিয়ে কিভাবে মারা হবে সেটুকু বলতে আপত্তি আছে? বুঝব?'

'দুর্ঘটনা। পানি ভালবাসেন আপনি, জানি, তাই পানিতেই মৃত্যু ঘটবে আপনার। বাথটাবে ডুবে মরবেন।'

'অবিশ্বাস্য দেখাবে না?'

'না। যাতে বিশ্বাস্য হয় তার সব রকম চেষ্টা করা হবে। সহজ সিদ্ধান্তে পৌঁছবে পুলিস, গোসলের আগে ইলেকট্রিক রেজরে শেভ করছিলেন আপনি, বাথটাবে বসে। কাজটা অবশ্যই আপনার বোকামি। হাত ফস্কে বাথটাবে পড়ে গিয়েছিল রেজরটা, পানিতে কারেন্ট চলে এসেছিল। প্রচণ্ড শক খেয়ে অজ্ঞান হয়ে যান, মাথা-নাক পানিতে ডুবে গিয়েছিল। ফলে দম আটকে মারা গিয়েছেন আপনি। ইনভেস্টিগেটররা তদন্ত করে রিপোর্ট দেবে "দুর্ঘটনাজনিত কারণে মৃত্যু"। সংবাদপত্রের কলামে আপনার নাম উঠবে, কিংবা হয়তো উঠবে না, ধামাচাপা

দিয়ে দেবে কোন বিশেষ মহল। তারপর শিগ্‌গিরই মাসুদ রানার নাম ভুলে যাবে সবাই।'

সবাই নয়, মনে মনে ভাবল রানা। কোনদিনই ভুলবেন না এক কঠোর চেহারার কোমল মনের বৃদ্ধ, ভুলবে না তার কিছু সহকর্মী। দরকার হলে ঝাঁক বেঁধে আসবে ওরা, ওর মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবে, এবং তারপরেও কোনদিন ভুলবে না। মুখে বলল, 'বাহ্ আমার জন্যে এত কষ্ট করবেন? গর্বই লাগছে।'

'অনেক মাথা খাটিয়ে, অনেক কষ্ট করে, একটা চমৎকার সংগঠন তৈরি করেছি আমি, গত তিরিশ বছর ধরে নিখুঁতভাবে কাজ করে যাচ্ছে তারা। কোত্থেকে হঠাৎ উড়ে এসে সবকিছু ভেঙেচুরে তছনছ করে দিয়ে যাবেন আপনি, তা তো হতে দিতে পারি না।'

'তা তো বটেই, তা তো বটেই,' হালকা গলায় বলল রানা। 'তা কোরিনের কি হবে? দু'জন এক বাথটাবে ডুবে মরলে লোকে খারাপ ভাববে না? মেয়েটার বদনাম হয়ে যাবে না?'

'হবে, কিন্তু সে সুযোগ দিচ্ছি না লোককে। মিস ম্যাকডেভিডকে খুন করার কোন প্ল্যান আপাতত নেই আমার। জামিন হিসেবে নিয়ে যাব ওকে। হাওয়াইয়ান ভোরটেক্সে হামলা করতে হলে এরপর ভাবনাচিন্তা করে সিদ্ধান্ত নেবে অ্যাডমিরাল ম্যাকডেভিড।'

'মোটেও না। এখানটায় মস্ত ভুল হয়ে যাচ্ছে আপনার। তাঁর কাছে কর্তব্য অনেক বড়। খামোকা কষ্ট করবেন ওকে নিয়ে। কোরিনকে যেতে দিন বরং। ওকে নিয়ে গিয়ে কোন লাভ হবে না আপনার।'

'ডিসিপ্লিনে বিশ্বাসী আমি, মেজর,' বলল ভেরোনি, 'একবার কোন প্ল্যান করলে, অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলি সেটা। লক্ষ্যে পৌঁছানোর আগে থামি না। কারও কথায় না। নিজের মতে চলি আমি। কম্যুনিস্টদের অকেজো মতবাদে বিশ্বাসী নই, এড়িয়ে চলি পুঁজিপতিদের প্রচণ্ড অর্থলোভকে। আসলে, রাশিয়া আর আমেরিকা মিলে সভ্যতাকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। আমার সংগ্রাম বেঁচে থাকার সংগ্রাম।'

ভেরোনির বক্তৃতা শুনে বাংলাদেশের রাজনীতিবিদদের কথা মনে পড়ে গেল রানার। ব্যাটা ঢাকায় গিয়ে শিখে আসেনি তো এসব!...সময়, সময় ব্যয় করাতে হবে। একটাই উপায় আছে, দানবটাকে কথায় ব্যস্ত রাখা। আর কয়েক মিনিট টিকে থাকতে পারলেই এসে পড়বে অ্যাডমিরালের লোকেরা।

'আপনি পাগল,' ঠাণ্ডা শোনাল রানার গলা। 'ধ্বংস এড়ানোর কথা বলছেন, বাঁচার কথা বলছেন, অথচ বছরের পর বছর ধরে পাইকারী হারে মানুষ মারছেন। কম্যুনিজম চান না, পুঁজিপতিদের দেখতে পারেন না, ভাল কথা; কিন্তু এসব তো আজকের তর্ক নয়। এসব চিন্তা তো আজকের মানুষকে পীড়িত করে না। আপনি জানেন না আপনি কি। একে বলে অ্যানাক্রোনিজম। অর্ধশতাব্দী কবরে বাস করে হঠাৎ উঠে এসেছেন, এবং বুঝতে পারছেন না সেটা।'

এই প্রথম নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারাল ভেরোনি। তার ঠাণ্ডা অবিচলতায়

সামান্য একটু ফাটল ধরেই আবার ঠিক হয়ে গেল। চোয়ালের চওড়া হাড়ের ওপরে মাংসপেশী একটু কঠিন হলো। পরক্ষণেই আবার সামলে নিল নিজেকে।

'অবুঝ লোকের সঙ্গে দর্শন আলোচনা অর্থহীন, মেজর। আর কয়েক মিনিট পরেই আপনি আর আমার বিরক্তির কারণ হয়ে থাকবেন না।' মাথা ঝাঁকাল ভেরোনি। বাথরুমে চলে গেল একজন লোক।

শিগ্গিরই বাথটাবে পানি আসার শব্দ উঠবে। হাত নাড়ানোর চেষ্টা করল রানা। দড়ি দিয়ে নিপুণভাবে বেঁধেছে দুই কব্জি। বাঁধনের ভেতর দিয়ে হাতদুটো বের করে আনা যাবে, এত ঢিল করে বাঁধা হয়নি; আবার কব্জির চামড়ায় দাগ পড়বে, এত কষেও নয়।

ঠিক এই সময় একটা গন্ধ ঢুকল রানার নাকে। সজাগ হয়ে উঠল তার চেতনা। অদৃশ্য কুয়াশার মত যেন তাকে ঘিরে নিয়েছে পুমেরিয়ার মিষ্টি হালকা গন্ধ। একটা অসম্ভব স্বপ্ন যেন দেখছে সে, ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় জানান দিল, কাছেই আছে মেয়েটা। ডায়না।

আঙুল তুলে নীরবে কোরিনের দিকে ইঙ্গিত করল ভেরোনি। রানাকে বেঁধেছিল যে লোকটা, পকেট থেকে ছোট বাক্স বের করল। বাক্স থেকে সিরিঞ্জ বের করে সুচ পরাল, ওষুধ ভরল, এগিয়ে গেল কোরিনের দিকে। মুমুর নিচের দিকটা টেনে সামান্য একটু ওপরে তুলে দিল। তারপর নির্দ্বিধায় সুচ ঢোকাল সুগঠিত নিতম্বে। নড়েচড়ে উঠল কোরিন, কিন্তু কোন আওয়াজ বেরোল না মুখ দিয়ে। কয়েক সেকেন্ড জেগে ওঠার চেষ্টা করেই আবার ঢলে পড়ল গভীর ঘুমে। তাড়াতাড়ি সিরিঞ্জসহ বাক্সটা পকেটে রেখে দিল ভেরোনির সহকারী। পাঁজাকোলা করে তুলে নিল কোরিনকে। মনিবের পরবর্তী নির্দেশের জন্যে নীরবে অপেক্ষা করছে।

'গুডবাই, মেজর,' বলল ভেরোনি।

'খেলার শেষটা দেখার আগেই চলে যাবেন?'

'কি হবে সে তা জানাই আছে, দেখার আগ্রহ নেই।'

'কোরিনকে কিছুতেই এই বিল্ডিঙের বাইরে নিয়ে যেতে পারবেন না আপনি,' কথা বাড়াচ্ছে রানা।

'বেসমেন্ট গ্যারেজে একটা গাড়ি অপেক্ষা করছে,' আত্মতুষ্টির ঝিলিক দেখা গেল ভেরোনির সোনালী-হলুদ চোখে। 'আপনি তো জানেনই, ওই পথ দিয়ে বোঝা নিয়ে ঢোকা যেমন সহজ, বেরোনোও তেমনিই সহজ।' দরজার কাছে এগিয়ে গেল ভেরোনি। খুলল, হলরুমে উঁকি দিল একবার। তারপর ফিরে চেয়ে ইশারা করল।

একজন লোক আগে আগে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। তার পেছনে বেরোল কোরিনকে কোলে নেয়া লোকটা। তারপরেই বেরিয়ে যাচ্ছিল ভেরোনি, ডেকে ফেরাল ওকে রানা।

'আরেকটা প্রশ্ন, ভেরোনি। না করতে পারবেন না।'

দ্বিধা করল দানব, ফিরল, তাকাল রানার দিকে।

'ডায়না কি হয় আপনার?'

শয়তানী হাসি হাসল ভেরোনি। 'এখনও কিছু হয় না, তবে শিগ্‌গিরই হবে।' স্যালুটের ভঙ্গিতে হাতটা একটু তুলল দানব। 'গুডবাই, মেজর।'

ভেরোনিকে খোঁচা মেরে আটকানোর শেষ চেষ্টা করল রানা। 'কানোলির খুনীদের জন্যে অভিনন্দন রইল।'

জ্বলে উঠল ভেরোনির সোনালী চোখ। পরক্ষণেই চোখের আগুন নিভিয়ে ফেলল সন্দেহের মেঘ। কিন্তু তা-ও ক্ষণিকের জন্যে। রানার চোখের দিকে তাকাল একবার। কিছু বলল না। ঘুরে চলতে শুরু করল। ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ছায়ার মত নিঃশব্দে।

ভেরোনিকে দেরি করাতে ব্যর্থ হয়েছে রানা। কোরিনকে নিয়ে যাওয়াও থামাতে পারেনি। আর কিছুই করার নেই তার, কিচ্ছু না। হতাশায় ভরে গেছে রানার মন, বিরক্ত হয়ে উঠেছে নিজের ওপর।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল লোকটা, সঙ্গীর দিকে চেয়ে মাথা ঝোঁকাল, তারপর আবার গিয়ে ঢুকল বাথরুমে। অন্য লোকটা হাতের পিস্তল একটা চেয়ারের ওপর নামিয়ে রাখল। এগোল রানার দিকে। গোবেচারা চেহারায় কোন বিকার নেই।

ঘুসিটা আসতে দেখল রানা, কিন্তু একটু দেরিতে। মাথাটা সরিয়ে নেবার চেষ্টা করল, কিন্তু পুরোপুরি পারল না। মুগুরের মত এসে কপালে আঘাত করল কঠিন মুঠি। চেয়ার থেকে ছিটকে পড়ে গেল রানা মেঝেতে, ব্যালকনিতে যাবার দরজার পর্দার কাছে।

আঁধার নামছে দু'চোখে, জোর করে দূরে সরিয়ে রাখল রানা কালো পর্দাটা। ঝিমঝিম করছে মাথার ভেতর। চোখ মেলে তাকিয়ে আছে বোকার মত। লোকটাকে দেখছে। কে লোকটা?...কোথা থেকে এল?...ওভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে কেন তার ঘরে?...কি হচ্ছে এসব?...বার দুই মাথা ঝাড়া দিল রানা, টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল। পনেরো বিশ সেকেন্ড, তারপরই আবার পরিষ্কার হয়ে গেল মাথার ভেতরটা, বুঝতে পারল, সে-ই অদ্ভুত ব্যাপার—আবার কয়েক মুহূর্তের জন্যে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল তার মগজ। সেই সাথে মনে পড়ল, কি ছিল সেই সিরিঞ্জে জানা হয়নি এখনও।

কার্পেটের ওপর বসে পড়েছে লোকটা। বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতের কব্জি চেপে ধরে আছে। ব্যথায় বিকৃত হয়ে গেছে চোখ-মুখ। মার খাওয়া কুত্তার মত গোঁ গোঁ আওয়াজ বেরোচ্ছে গলা দিয়ে।

'কব্জি ভেঙে ফেলেছে শালা!' মনে মনে বলল রানা। হাসি ফুটল ঠোঁটে। ভাঙা কব্জির ব্যথার তুলনায় তার কপালের ব্যথা কিছুই না।

অনড় হয়ে গেল রানা হঠাৎই। পেছনে তার নিজের কব্জিতে অন্য একটা হাতের স্পর্শ পেয়েছে। টের পাচ্ছে, ধারাল অস্ত্রের পোঁচে আস্তে আস্তে কেটে যাচ্ছে দড়ি। আবার তাকে ঘিরে নিয়েছে প্লুমেরিয়ার মিষ্টি গন্ধ, এবারে আরও ঘন।

বাঁধন কেটে গেছে। হাতের তালুতে ছুরির আলতো স্পর্শ পেল। মুঠো করে ধরল রানা ছুরির বাট। তৈরি সে এখন।

গোঙানি থেমে গেছে লোকটার। পিস্তল তুলে নিয়েছে চেয়ার থেকে। রানার কাছ থেকে বেশ অনেকটা দূরে। প্রোজেক্টাইল গানের বিরুদ্ধে ছুরি নিয়ে লড়তে হলে খুব কাছে থেকে হঠাৎ আক্রমণ করা দরকার।

বাম হাত বাড়িয়ে পিস্তল তুলে নিয়েই উঠে দাঁড়াল লোকটা। কব্জি থেকে নিচের দিকে বেকায়দা ভঙ্গিতে ঝুলে আছে ডান হাত। চোখে তীব্র ঘৃণা। চেহারাটা আর নিরীহ দেখাচ্ছে না, রাগে কালো বিকৃত হয়ে গেছে। পিস্তল তাক করে রানার দিকে পা বাড়াল সে, ভেরোনির 'দুর্ঘটনাজনিত কারণে মৃত্যু'র বারোটা বাজাতে আসছে। তার সহকারী এসবের কিছুই জানে না হয়তো, বাথরুমের দরজা খুলে উঁকি দেয়নি, পানির আওয়াজ আগের মতই শোনা যাচ্ছে।

রানার প্রতিটা রোমের গোড়ায় ঘাম ফুটেছে। এখনও দূরে রয়েছে লোকটা। লাফ দিয়ে এগিয়ে যেতে পারে রানা, কিন্তু অর্ধেক পথ পৌঁছানোর আগেই ছেঁদা হয়ে যাবে বুক।

এগোচ্ছে লোকটা। পাঁচ ফুটের ভেতরে এসে গেল, কিন্তু তা-ও দূরে।

দুরদুর করছে রানার বুক। লোকটার উদ্দেশ্য ঠিক বুঝতে পারছে না। পিস্তলের বাটের দিকে তাকাল। ট্রিগার নেই, বোতামে আঙুলের চাপ বাড়ল কি বাড়ল না বোঝার উপায় নেই। 'শুয়োরের বাচ্চার মতলবটা কি?' মনে মনে নিজেকে প্রশ্ন করল রানা। অনুমান করল, হয়তো কাছে এসে আবার আঘাত করে দুর্বল করতে চায় রানাকে। তারপর ওরা দু'জনে মিলে তুলে নিয়ে গিয়ে বাথটাবে শুইয়ে দেবে তাকে। ধীরে ধীরে এগোচ্ছে সেজন্যেই। তবে রানা বেফাঁস কিছু করতে গেলে গুলি করবে লোকটা, এতে কোন সন্দেহ নেই।

তিন ফুট, লোকটাকে তিন ফুটের মধ্যে চায় রানা। সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে লোকটার নাগাল পেতে হবে। নইলে মিস হয়ে যেতে পারে।

আরও ধীরে দু'জনের মাঝে দূরত্ব কমিয়ে আনল লোকটা। রানার বুকের দিকে পিস্তলের নল, আস্তে করে তুলে আনল কপাল বরাবর। বাড়ি মারবে নাকি মাথায়! আবার আস্তে আস্তে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে নলের মুখ। রানার জননেন্দ্রিয় বরাবর সোজা হলো। এক সেকেন্ড সেদিকে তাকিয়ে স্থির রইল লোকটা। বোতামটা টিপেই দেবে নাকি!—আঁতকে উঠল রানা।

ধৈর্য, ধৈর্য ধরো, বার বার নিজেকে বোঝাল রানা। ধৈর্য ধরো, এবং আশা ছেড়ো না, সুযোগ পেয়েও যেতে পারো। রানার নাগালের মাঝে এসে গেছে লোকটা। অপেক্ষা করছে রানা। এখন না, মনকে বলল সে, এখন নড়াচড়া করলেই বোতামটা টিপে দেবে লোকটা। তাহলে? কি করবে সে? সুযোগ তো দিচ্ছে না ব্যাটা!

আস্তে করে লোকটার পিস্তল ধরা হাত ওপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। হ্যাঁ, ঠিকই অনুমান করছে রানা। বাধ্য না হলে গুলি করার ইচ্ছে নেই লোকটার। তাকে আঘাত করে কাবু করতে চায়। মাথায় বাড়ি মারবে।

লোকটার পিস্তল ধরা হাতটা মাথার ওপরে উঠে গেছে। নেমে আসার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে বিদ্যুৎ খেলে গেল রানার শরীরে। পেছন থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল ছুরি ধরা

হাত। ছুরির ফলাটা সামনের দিকে বাগিয়ে ওর বাঁ থেকে ডানে চালাল সাঁই করে। দাঁড়ানো অবস্থাতেই জবাই হয়ে গেল লোকটা। দু'ফাঁক হয়ে গেছে গলা। লোকটার বুকের ভেতর থেকে একটা চিৎকার উঠেছিল, মাঝপথে কাটা গলা দিয়ে বিচ্ছিরি শব্দ করে বেরিয়ে গেল। রক্তনালী দিয়ে তীব্র বেগে রক্ত বেরিয়ে নিজের বুক, রানার হাত, কার্পেট ভিজিয়ে দিল। পিস্তল ধরা বাঁ হাতটা আচমকা ঝুলে পড়ল নিচের দিকে। স্লো মোশন ছায়াছবির মত আস্তে করে পেছনে বাঁকা হয়ে গেল লোকটার শরীর, ছিটকে বেরোনো রক্তের ফোয়ারায় ভিজে গেল রানার চোখ-মুখ। কাটা কলাগাছের মত দড়াম করে মেঝেতে আছড়ে পড়ল লোকটা।

এক মুহূর্তের জন্যে নিথর হয়ে গিয়েছিল রানা। লোকটা পড়ে যেতেই উবু হলো। লাশের হাতের কাছে পড়ে থাকা পিস্তলটা সবে ছুঁয়েছে, এমনি সময় আদেশ শোনা গেল বাথরুমের দরজার কাছ থেকে, 'খবরদার, ছোঁবে না!'

উবু অবস্থাতেই পাথরের মূর্তি হয়ে গেল রানা।

'সোজা হয়ে দাঁড়াও।' আবার আদেশ শোনা গেল।

সোজা হয়ে দাঁড়াল রানা। ফিরে চাইল। বাথরুমে যে লোকটা ছিল, সঙ্গীর পতনের শব্দ শুনে বেরিয়ে এসেছে। পিস্তলের নল এদিকে তাক করা। একবার কার্পেটের ওপর পড়ে থাকা রক্তাক্ত সঙ্গীর দিকে তাকাচ্ছে, আবার মুখ তুলে চাইছে রানার দিকে, তার হাতের ছুরিটার দিকে, চোখে বিস্ময়।

'যা ভেবেছিলাম তারচেয়ে অনেক বেশি ভয়ঙ্কর লোক তুমি, রানা!' বলল লোকটা। 'বুঝতে পারছি, প্ল্যানমাফিক কাজ করা আর গেল না। গুলি করেই মারতে হবে তোমাকে। বলতে লজ্জা নেই, তোমাকে এখন একা সামলানো আমার সাধ্যের বাইরে।' পিস্তল ধরা হাতটা টান টান করল লোকটা। বোতাম টিপবে যে-কোন মুহূর্তে। বুঝতে পারছে রানা, শেষ রক্ষা হলো না। মরতে তাকে হবেই। এত দূর থেকে লোকটার প্রোজেক্টাইল-গানের বিরুদ্ধে ছুরি দিয়ে কিছুই করার নেই তার।

দরজার দিকে পেছন করে আছে রানা। নজর লোকটার চোখের দিকে। লোকটা পিস্তলের বোতাম টিপতে গেলেই ঝাঁপ দেবে সে। টান টান হয়ে রয়েছে তার শরীরের সমস্ত স্নায়ু।

রানা ঝাঁপ দিতে যাবে, ঠিক এই সময় দরজার দিকে দৃষ্টি ঘুরে গেল লোকটার। চোখে অবিশ্বাস, দ্রুত রানার দিক থেকে পিস্তলের নলের মুখ ঘুরে যেতে লাগল।

একই সঙ্গে ঘটল কয়েকটা ঘটনা। দুপ করে দরজার কাছ থেকে চাপা একটা শব্দ শোনা গেল। কব্জিতে প্রচণ্ড আঘাত খেলো লোকটা। আর্তনাদ করে উঠল। হাত থেকে খসে পড়ে গেল পিস্তল। কিন্তু তার আগেই বোতামে আঙুলের চাপ লেগে গেছে, গুলি বেরিয়ে গেছে নলের মুখ দিয়ে। ঝাঁপ দিয়েছে রানা, তার কাঁধের ওপর দিয়ে চলে গেল গুলি। কব্জি চেপে ধরল লোকটা, ব্যথায় বিকৃত মুখচোখ, কিন্তু মুহূর্তের জন্যে। রানাকে আসতে দেখেই দ্রুত উবু হয়ে অন্য হাতে পিস্তলটা তুলে নিল আবার। সোজা হবার আগেই ছুরি খেলো পিঠে, ফুসফুস ভেদ করে গেল

ছুরির ফলা, হৃৎপিণ্ডে গিয়ে ঢুকল চোখা মাথা। তীক্ষ্ণ একটা আর্তনাদ বেরিয়ে এল লোকটার গলা চিরে। হাত থেকে আবার খসে গেল পিস্তল। উপুড় হয়ে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ল লোকটা।

'ঠিক সোমায় মত পৌচে গেচি, স্যার। আরাকটু হলেই…'

পেছনে কথা শুনে ফিরে চাইল রানা। নিষ্পাপ সরল দুটো চোখ তাকিয়ে আছে তার দিকে। হাতে ভয়ঙ্কর চেহারার সেই পিস্তলটা, মারবেল ছোঁড়ে।

'হ্যাঁ, সময়মত পৌঁছেচ, গিলটি মিঞা,' মাথা ঝাঁকাল রানা।

'কিন্তুক, এ কেমন পেস্তল, স্যার? গুলি করল স্না, দেয়ালের চুনবালি খসে পড়ল, অতচ কোন রা নেই পেস্তলের মুকে ! এ তো দেকছি…'

গিলটি মিঞার কথা শেষ হওয়ার আগেই ঘুরে দাঁড়িয়েছে রানা। মেয়েটার কথা ভুলেই গিয়েছিল এতক্ষণ। ডায়না।

পর্দা তুলে ব্যালকনিতে তাকাল রানা। শূন্য। কেউ নেই। নিশ্চয় ভেরোনি আর তার লোকদের মত ছাত থেকে দড়ি বেয়েই নেমে এসেছিল ডায়না অনুমান করল রানা। রেলিঙে একটা দড়ি বাঁধা। দড়ির অন্য মাথা নিচের অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে শেষ হয়েছে। আগের বারের মত একই পথে পালিয়েছে ডায়না।

হঠাৎই চোখে পড়ল ওটা। লাউঞ্জ চেয়ারে পড়ে আছে ছোট্ট একটা ফুল। এগিয়ে গিয়ে ফুলটা তুলে নিল রানা। প্লুমেরিয়া—সাদা পাপড়ির ভেতর দিকটা উজ্জ্বল হলুদ। সুন্দর ফুল। তীক্ষ্ণ চোখে দেখছে রানা, যেন দুষ্প্রাপ্য কোন জিনিস। ছোট্ট একফালি হাসি ফুটল তার ঠোঁটে। ঝকঝকে নীল সাগরের দিকে চোখ তুলে তাকাল।

ঠিক এই সময় ঘরে অনেক লোক ঢোকার আওয়াজ শোনা গেল। এসে গেছে অ্যাডমিরাল ম্যাকডেভিডের সিকিউরিটি পুলিস।

চার

'মিস্টার রানা…' সুন্দরী লেফটেন্যান্ট-এর গলায় দ্বিধা। 'অ্যাডমিরাল আপনার অপেক্ষা করছেন।'

মহিলা অফিসারের দিকে চোখ তুলে তাকাল রানা। অপারেশন বাংকারে নিজের নিজের ডেস্কের সামনে চুপচাপ বসে আছে আরও কয়েকজন মহিলা। সবাই তাকিয়ে আছে তার দিকে, হলিউডের বিশিষ্ট কোন নায়ক যেন সে। গর্ব হলো রানার।

'হান্ড্রেড অ্যান্ড ফার্স্টে আপনাকে পেয়ে আমরা গর্বিত,' আবার বলল লেফটেন্যান্ট। চোখ নামিয়ে নিল। 'পিকারিঙে যা যা করেছেন, সব শুনেছি আমরা।'

'তা মেয়ের কিডন্যাপিঙের ব্যাপারটা কিভাবে নিয়েছেন অ্যাডমিরাল?'

সামনাসামনি প্রশংসা হচ্ছে, বেরসিকের মতই অন্য কথায় চলে এল রানা।

'সহ্য ক্ষমতা তাঁর অপরিসীম,' জবাব দিল মেয়েটা।

'অফিসেই আছেন তো?'

'না। কনফারেন্স রুমে অপেক্ষা করছেন সবাই।' উঠে, ঘুরে ডেস্কের ওপাশ থেকে বেরিয়ে এল। 'এই যে, এদিক দিয়ে আসুন।'

মেয়েটাকে অনুসরণ করে একটা করিডর ধরে এগোল রানা। ডানের একটা দরজার সামনে এসে দাঁড়াল মেয়েটা। টোকা দিল, ঠেলে পাল্লা খুলল, রানা এসেছে জানাল, তারপর সরে জায়গা করে দিল। রানা ভেতরে ঢুকতেই পেছনে নিঃশব্দে বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

ঘরে চারজন লোক। দু'জনকে চেনে রানা, অন্য দু'জন অচেনা। উঠে এসে রানার সঙ্গে হাত মেলালেন অ্যাডমিরাল ম্যাকডেভিড। মাত্র চারদিন আগে শেষবার দেখা হয়েছে, অথচ এই কয়েকদিনেই যেন অনেক বেশি বৃদ্ধ হয়ে গেছেন অ্যাডমিরাল।

'আপনি বেঁচে গেছেন, থ্যাংক গড,' অ্যাডমিরালের গলার গভীর আন্তরিকতা অবাক করল রানাকে। 'পা-টা কেমন?'

'ভাল,' সোজাসুজি জবাব দিল রানা। বৃদ্ধের চোখের দিকে তাকাল। 'ক্যাপ্টেন ম্যাকেঞ্জীর জন্যে দুঃখ প্রকাশ ছাড়া কিছু করার নেই···তবে কোরিন···আমারই দোষ। আরেকটু যদি সতর্ক হতাম···'

'দূর, কি বলছেন!' জোর করে মুখে হাসি ফোটালেন অ্যাডমিরাল। 'আপনার কিছুই করার ছিল না। তাও তো দুটো বাদমাশকে খতম করেছেন।'

রানা কিছু বলার আগেই চেয়ার ছেড়ে উঠে এল জন টার্নার। রানার পিঠে আলতো করে হাত রাখল। 'আপনাকে আবার দেখে খুশি হয়েছি। তবে চেহারা আর শরীরের অবস্থা তো দেখছি কাহিল।'

'ক্লান্তি, আর কিছু না। চব্বিশ ঘণ্টা নরক গুলজার করে এসে মাত্র তিরিশ মিনিট ঘুম···অবস্থা তো কাহিল দেখাবেই।'

'হ্যাঁ, সত্যিই বলছেন,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'সাংঘাতিক ধকল গেছে···তা সময় তো হাতে বেশি নেই আমাদের। শিগ্‌গির স্করপিয়নকে তুলে আনতে না পারলে হয়তো আবার হারাব ওটাকে।' অ্যাডমিরালের চোখের চারপাশে ক্লান্তির ছাপ, বোঝাই যাচ্ছে, জোর করে ধরে রেখেছেন নিজেকে। 'যেটুকু সময় পেয়েছি, তা-ও আপনার জন্যেই। ফরোয়ার্ড টর্পেডো কম্পার্টমেন্টে পানি ভরে দিয়ে একটা কাজের কাজ করেছেন আপনি, রানা। রীতিমত বুদ্ধিমানের কাজ।'

লজ্জা পেয়ে হাসল রানা। 'পিকারিঙের হেল্‌ম্‌স্‌ম্যানের কিন্তু অন্য ধারণা। সে তো এই কাজের জন্যে শাস্তি পাবে ধরে নিয়ে বসে আছে।'

ঠোঁটের কোণে সূক্ষ্ম এক চিলতে হাসি ফুটতে দিলেন অ্যাডমিরাল। 'আসুন, বসিগে। পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি···ডক্টর ড্যান শারম্যান, ট্রিপলার হাসপাতালের রিসার্চ-চীফ।'

বেঁটেখাট একজন লোকের সঙ্গে হাত মেলাল রানা। শীর্ণদেহ, কামানো মাথা,

চোখে ভারী পাওয়ারের বিশাল চশমা। চশমার কাচের ওপারের বাদামী চোখদুটো বার বার উঠছে নামছে। চেহারাটা খারাপ হলেও হাসিটা আন্তরিক।

'আর ইনি ডক্টর উইলিয়াম আরন। ইটন স্কুল অভ ওশেনোগ্রাফির মেরিন জিওলজি বিভাগের প্রধান।' অপরজনের সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দিলেন অ্যাডমিরাল।

আরনকে মোটেই জিওলজিস্ট-এর মত মনে হলো না রানার কাছে, বরং ট্রাক ড্রাইভার হলেই যেন ভাল মানাত। লম্বা—ছয় ফুটের কাছাকাছি, চাওড়া কাঁধ। হাত বাড়াল আরন। সাগরকলা সাইজের পাঁচটা আঙুলে দলিতমথিত হচ্ছে রানার হাত, অনেক কষ্টে মুখের ভাব ঠিক রাখল সে।

রানাকে একটা চেয়ারের কাছে নিয়ে এলেন অ্যাডমিরাল। বললেন, 'পিকারিঙে কি কি ঘটেছে, আপনার মুখ থেকে সব শুনতে চাই। হোটেলে মারামারির ব্যাপারটাও।'

হেলান দিয়ে আরাম করে বসল রানা। কোন্‌খান থেকে শুরু করবে, ভাবছে। তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সবাই, প্রতিটি কথা গেলার জন্যে তৈরি।

রানার মনের অবস্থাটা বুঝল টার্নার। মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'তাড়াহুড়োর দরকার নেই, আস্তে আস্তেই বলুন। আগেই বলে নিচ্ছি, প্রশ্ন করলে মাফ করে দেবেন।'

কথা শুরু করল রানা। 'ব্যাপারটা শুরু হয়েছে, যখন দেখলাম সীফ্লোর উঠে আসছে। আন্ডারওয়াটার টপোগ্রাফিক্যাল ম্যাপে এর উল্লেখ দেখিনি।'

বলে গেল রানা। নোট নিচ্ছেন দু'জন বিজ্ঞানী। টেপ রেকর্ডারের দিকে নজর রাখছে টার্নার। মাঝেমধ্যে হাত তুলে রানাকে থামাচ্ছে একেকজন, নরম গলায় প্রশ্ন করছে; যত নিখুঁতভাবে সম্ভব, জবাব দিচ্ছে রানা। সবই বিস্তারিত জানাল ওদেরকে সে, শুধু ডায়নার কথাটা বেমালুম চেপে গেল। জানাল, ছুরিটা তার বাহুতে স্ট্র্যাপে আটকানো ছিল। হাত বাঁধা থাকলেও কৌশলে বের করে নেয়া যায়।

টেনে সিগারেটের প্যাকেটের ওপরের সেলোফেন ছিঁড়ে দুমড়ে অ্যাশট্রেতে ফেলে দিলেন অ্যাডমিরাল। 'এই ভেরোনি লোকটাকে ঠিক বুঝতে পারছি না···ভোরটেক্সের লোকের সঙ্গে এই প্রথম প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটল···' থেমে গেলেন ম্যাকডেভিড।

সামনের দিকে ঝুঁকলেন ডক্টর শারম্যান। রানাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'লোকটার দৈহিক গঠন কেমন? চেহারা?'

'লম্বায় পৌনে সাত ফুটের কাছাকাছি। সেই তুলনায় চওড়া। মুখের চামড়া খসখসে, চুল রূপালি। তবে সবচেয়ে আশ্চর্য ওর চোখ···হলুদ।'

ভুরু কুঁচকে গেল শারম্যানের। 'হলুদ?'

'হ্যাঁ। গিনি সোনার মত।'

'অস্বাভাবিক,' বললেন শারম্যান। 'অ্যালবিনো হলে চোখের তারার রঙ ইঁটরঙা হবে, তার মাঝে হালকা কমলার ছোঁয়া থাকতে পারে। এক ধরনের বিশেষ রোগ হলে হালকা ধূসর-হলুদ হতে পারে। কিন্তু উজ্জ্বল সোনালী? মোটেও না।

মানুষের চোখের আইরিসে ওই রঙ হবার মত কোন পিগমেন্টই নেই।'

পকেট থেকে পাইপ বের করলেন ডক্টর আরন। হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বললেন, 'আশ্চর্য! হলুদচোখো, বিশালদেহী একটা লোক কিন্তু সত্যিই ছিল।'

নরম গলায় বললেন শারম্যান। 'হ্যাঁ, ছিল। ডক্টর ফ্রেডরিক মরগান।'

'শতাব্দীর সবচে বড় নৃতত্ত্ববিদ ছিলেন ফ্রেডরিক মরগান,' বললেন শারম্যান।

মাথা ঝাঁকালেন আবার। 'হ্যাঁ, অসাধারণ প্রতিভাশালী এক লোক। প্রায় তিরিশ বছর আগে হারিয়ে গেছেন সাগরে।'

'আবার ফিরে এসেছেন হয়তো,' আপনমনেই বলল রানা।

'অসম্ভব,' বললেন শারম্যান। 'তিনি মারা গেছেন।'

'তাই কি?' বলল রানা। 'কে জানে, কানোলিকে খুঁজে পেয়েছেন হয়তো ডক্টর মরগান।'

'নৃতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, আরও কত রয়েছে এরমধ্যে কে জানে!' বিড়বিড় করল টার্নার।

'ভোরটেক্স তত্ত্বের সঙ্গে এসব তত্ত্বের নিগূঢ় যোগাযোগ আছে, মনে হচ্ছে,' বলল রানা। বিশপ মিউজিয়মে হিরাম মাতসুনাগার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা যা হয়েছে, বিস্তারিত বলে গেল সে।

'বিশ্বাস করতে পারছি না আমি কিছুতেই,' রানার কথা শেষ হলে বললেন আরন। 'ডক্টর মরগানের মত একজন বিজ্ঞানী তিরিশ বছর পর ফিরে এলেন, খুনী, ছিনতাইকারী হয়ে!'

'এই ভেরোনি লোকটা মরগানের সমসাময়িক কোন বিজ্ঞানীর নামটাম বলেছে কিছু?' কি ভেবে রানাকে জিজ্ঞেস করলেন শারম্যান।

ভাবল একটু রানা, হাসল। 'বিজ্ঞানী কিনা জানি না, তবে দু'জন লোকের সঙ্গে ভেরোনি নিজের বুদ্ধির তুলনা করেছে। গ্র্যাহাম এবং প্রাইস।'

দৃষ্টি বিনিময় করলেন ডক্টর শারম্যান আর আরন।

'আশ্চর্য!' শব্দটা আবার ব্যবহার করলেন আরন। 'প্রাইস একজন ফিজিসিস্ট ছিলেন, হাইড্রলজি বিশেষজ্ঞ।'

'আর গ্র্যাহাম ছিলেন একজন বিখ্যাত সার্জন,' চোখ বড় বড় করে বললেন শারম্যান। রানার দিকে তাকিয়ে আছেন। 'মাছের কানকো নিয়ে দীর্ঘদিন গবেষণা করেছেন। যান্ত্রিক এক ধরনের কানকো আবিষ্কার করেছিলেন তিনি। পানি থেকে মানুষও যাতে সরাসরি মাছের মত অক্সিজেন গ্রহণ করতে পারে, এর জন্যেই তাঁর এই প্রচেষ্টা।'

উঠে, ঘরের কোণে রাখা একটা ওয়াটার কুলারের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন শারম্যান। একটা পেপার কাপ ভরে ঠাণ্ডা পানি নিয়ে এসে বসলেন আগের চেয়ারে। ঢক ঢক করে গিলে নিয়ে আবার শুরু করলেন, 'কমবেশি সবারই জানা আছে, ফুসফুস বাতাস টেনে নেয়, প্রয়োজনীয় অক্সিজেন শরীরে চালান করে দিয়ে দূষিত কার্বন-ডাই-অক্সাইড বের করে দেয়। মানুষ এবং ডাঙার অন্যান্য প্রাণীদের

ফুসফুস বুকের খাঁচার ভেতরে ঝুলে থাকে, ডায়াফ্রাম এবং বাতাসের চাপে একবার ফোলে, একবার চুপসে যায়। বাতাস টেনে নিয়ে রক্তে অক্সিজেন ছড়ায় ফুসফুস। মাছেরাও অক্সিজেন নেয়, কার্বন-ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে, তবে ভিন্ন উপায়ে। বাতাস নয়, পানি থেকে অক্সিজেন নেয় ওরা, কাজেই শরীরের গঠন-পদ্ধতিও তাদের ভিন্ন। রক্ত চলাচলকারী এক ধরনের নরম টিস্যুতে অসংখ্য খুদে ফিলামেন্ট রয়েছে, একেই কানকো বলি আমরা। মাছের কানকো আর মানুষের ফুসফুস মিলিয়ে আলাদা একটা জিনিস, একটা যন্ত্র তৈরি করেছিলেন ডক্টর গ্র্যাহাম। এই যন্ত্র বুকের ভেতরে বিশেষ নালীর সঙ্গে যোগ করে দিলেই বাতাসের মত পানি থেকেও শ্বাস নিতে পারবে মানুষ।'

'অদ্ভুত তো!' বললেন অ্যাডমিরাল।

'ঠিকই বলেছেন, অদ্ভুতই,' সায় দিয়ে বলল রানা। 'পিকারিংকে যারা আক্রমণ করেছিল, তারা কোনরকম ডাইভিং গিয়ার ছাড়াই পানির তলা দিয়ে সাঁতরে এসেছিল। এখন বুঝতে পারছি ব্যাপারটা।'

'তবে,' বললেন শারম্যান, 'এই যন্ত্র বুকে লাগিয়ে একবারে আধ ঘণ্টার বেশি ডুবে থাকা সম্ভব নয়।'

মাথা ঝাড়া দিল টার্নার, বিস্ময়ের ভাবটা ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করছে যেন। 'আধ ঘণ্টা শুনতে কম লাগে, কিন্তু পানির তলায় এতটা সময় থাকতে পারা সোজা ব্যাপার না। কত হালকা, বয়ে নেয়া কত সহজ…এর তুলনায় ডাইভিং গিয়ার তো বিশাল এক বোঝা…'

'গ্র্যাহাম এবং প্রাইসের কি হয়েছে, কিছু জানেন আপনারা?' দুই বিজ্ঞানীকে জিজ্ঞেস করলেন অ্যাডমিরাল।

'বহু বছর আগে মারা গেছেন দু'জনই,' শ্রাগ করে বললেন শারম্যান।

একটা ফোনের রিসিভার তুলে নিলেন অ্যাডমিরাল। 'ডাটা সেকশন? অ্যাডমিরাল ম্যাকডেভিড বলছি। দু'জন বিজ্ঞানী, ডক্টর গ্র্যাহাম আর ডক্টর প্রাইসের মৃত্যু সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই। যত শীঘ্রি সম্ভব, জানাও।' রিসিভার রেখে দিলেন তিনি। 'ডক্টর আরন, ভোরটেক্স এলাকাটা সম্পর্কে কি কি জানেন, বলবেন?'

একটা ব্রিফকেস খুললেন আরন। কয়েকটা চার্ট বের করে টেবিলে রাখলেন। 'পিকারিঙের ইনস্ট্রুমেন্টস ডিটেকশন রুমের বেঁচে যাওয়া লোকদের জিজ্ঞেস করেছি। হাসপাতালে কমান্ডার রিচার্ডের সঙ্গে কথা বলেছি। মি. রানার মন্তব্য শুনলাম। একটাই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি…ভোরটেক্সটা আর কিচ্ছু না, একটা ডুবো পর্বত।'

'কিন্তু এতদিন পরে ওটার কথা জানলাম কেন আমরা? এর আগে আবিষ্কৃত হয়নি কেন?' জানতে চাইল টার্নার।

'অস্বাভাবিক কিছু নয়,' বললেন আরন। 'ডাঙার সমস্ত পর্বত চূড়া আবিষ্কার করা শেষ হয়েছে উনিশশো চল্লিশের পর। সাগরতলের তো আটানব্বই পার্সেন্টই এখনও অনাবিষ্কৃত।'

'সব ডুবো পর্বতই তো ডুবো আগ্নেয়গিরির ধ্বংসাবশেষ, তাই না?' জানতে

চাইল রানা।

একটা পাউচ থেকে তামাক নিয়ে পাইপে ভরলেন আরন। 'আগে তাই মনে করা হত। কিন্তু ইদানীং আধুনিক যন্ত্রপাতি নিয়ে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের পর ধারণা পাল্টেছে।' তামাকে আগুন ধরানোর জন্যে থামলেন তিনি। 'কানোলির পৌরাণিক কাহিনী বলে, প্রচণ্ড ভূমিকম্পে লোকজনসহ দ্বীপটা সাগরের তলায় তলিয়ে গিয়েছিল। ব্যাপারটা যদি সত্যি হয়, তাহলে আমি বলব ফল্টিঙের জন্যেই ঘটেছে এটা—প্রথমে ঠেলে জেগে উঠেছিল দ্বীপটা, তারপর আবার নেমে গেছে।' থামলেন আরন। চুপচাপ পাইপ টানলেন কিছুক্ষণ, তারপর আবার শুরু করলেন, 'ফল্ট জিনিসটা আর কিছু না, ভূ-ত্বকের ফাটল। চার্টে দেখেছি, আমাদের বিশেষ ডুবো পর্বতটা রয়েছে ফুলারটন ফ্র্যাকচার জোনে। ভূ-পৃষ্ঠের তলায় প্রচণ্ড ক্রিয়াকাণ্ডের ফলে কয়েকশো ফুট ঠেলে উঠতে পারে ভূ-ত্বক, হাজার বছর ফুলে থেকে মাত্র কয়েক দিনেই আবার নেমে যেতে পারে।' জানালার দিকে ফিরলেন ডক্টর। আধবোজা হলো চোখ। ধাপে ধাপে পৃথিবীর পরিবর্তনের ছবি দেখছেন হয়তো মনের চোখে। শ্রাগ করলেন, ফিরে চাইলেন রানার দিকে। 'মিস্টার রানা বলেছেন, ওখানে পানির তাপমাত্রা কম, এটাও আমাদের ফল্ট থিওরিকে সমর্থন করে...'

'আচ্ছা,' এসব ভৌগোলিক তত্ত্ব শোনার সময় এখন নেই, তাই বাধা দিলেন অ্যাডমিরাল ম্যাকডেভিড। 'পিকারিংকে যারা আক্রমণ করেছিল, ওই ডুবোপর্বতেই কি তাদের বাস? সম্ভব?'

'বুঝলাম না,' বললেন আরন।

'ওখানে, পানির ওপরে আর কোন জাহাজকে খুঁজে পায়নি পিকারিঙের রাডার। পানির তলায়ও স্করপিয়ন ছাড়া আর কোন সাবমেরিনের অস্তিত্ব ধরতে পারেনি সোনার। এর দুটো মানে হতে পারে। হয় পানির তলায় বাসস্থান তৈরি করেছে মানুষ, কিংবা ওই ডুবোপর্বতের ভেতরেই মানুষ বাসের উপযোগী জায়গা আছে।'

'আমি আপনার প্রথম অনুমানের বিপক্ষে,' বলে উঠল রানা। 'দু'শো লোকের কম হবে না, আমাদের আক্রমণ করেছিল। এত লোকের থাকার জন্যে বিরাট বাড়ি দরকার। এতবড় বাড়ি পানির তলায় তৈরি করা...নাহ্, বিশ্বাস করা কঠিন!'

'তাহলে ডুবোপর্বতের ভেতরই থাকার জায়গা আছে,' বললেন ম্যাকডেভিড।

টেবিলে দুই কনুই রেখে হাতের তালুতে থুতনির ভর রাখলেন শারম্যান। রানার দিকে তাকালেন। 'মেজর, কুয়াশা যখন আপনাদের জাহাজকে ঘিরে ধরল, আপনি বলছেন ইউক্যালিপ্টাসের গন্ধ পেয়েছেন তখন।'

'হ্যাঁ, পেয়েছি।'

'উদ্ভট কাণ্ডকারখানা!' বিড়বিড় করে বললেন শারম্যান। অ্যাডমিরালের দিকে ফিরে বললেন, 'মনে হচ্ছে, আপনার ভাবনাচিন্তা ঠিক পথেই এগোচ্ছে।'

'মানে?'

'খনির বাতাস পরিশোধনের কাজে ইউক্যালিপ্টাসের তেল ব্যবহার হত, অস্ট্রেলিয়ায়। বদ্ধ এলাকার স্যাঁতসেঁতে ভাব দূর করার কাজেও ব্যবহার হয় এই

জিনিস।'

ফোন বেজে উঠল। তুলে নিয়ে কানে ঠেকালেন অ্যাডমিরাল। চুপচাপ শুনলেন ওপাশের কথা। রিসিভার রেখে দিয়ে টেবিল ঘিরে বসা সবার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে আনলেন। 'সাগরে হারিয়ে গেছেন ডক্টর গ্র্যাহাম এবং প্রাইস। ফ্র্যাঙ্কলিন করপোরেশনের একটা রিসার্চ ভেসেল, ভয়েজারে করে বেরিয়েছিলেন তাঁরা। একটা মাইনিং কোম্পানীর হয়ে কাজ করছিলেন। ওই যাত্রায় গভীর সাগরের তল সম্পর্কে গবেষণা করার ইচ্ছে ছিল। হাওয়াইয়ের উত্তর দিকে চলেছিল ভয়েজার। জাহাজটাকে শেষ দেখা যায়…'

'তিরিশ বছর আগে,' কথাটা শেষ করে দিল টার্নার। হাতে কিছু কাগজ। ওগুলোর দিক থেকে মুখ তুলে বলল, 'রেকর্ড বলছে, ভোরটেক্স এলাকায় প্রথম হারিয়েছিল ওই ভয়েজারই।'

'ওই জাহাজেই ছিলেন ফ্রেডরিক মরগান, তাই না?' জানতে চাইল রানা।

'হ্যাঁ। ওই অভিযাত্রীদলের নেতা হিসেবে চলেছিলেন,' জবাবটা দিলেন শারম্যান।

'ধাঁধার উত্তর মিলতে শুরু করেছে,' বিড় বিড় করে বললেন আরন। চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে ছাতের দিকে তাকালেন। ওখানেই যেন লেখা রয়েছে ধাঁধার জবাব, পড়ছেন জোরে জোরে: 'অসংখ্য দ্বীপেই মানুষের তৈরি গুহা রয়েছে। মৌচাকের খোপের মত গুহা খুঁড়ত দ্বীপের আদিম মানুষেরা। কোনটাকে বানাত কবর, কোনটা মন্দির আবার কোন কোন গুহাতে পাথরের দেবদেবী রাখত। হয়তো এমনি কোন দ্বীপ ছিল ভোরটেক্স এলাকায়। তারপর ফল্টিঙের কারণে আবার সাগরের তলায় বসে গেছে দ্বীপটা। তাহলে বেশ কিছু গুহা অক্ষত থেকে যাওয়া সম্ভব।'

'কি বলতে চাইছেন?' ভুরু কুঁচকে গেছে অ্যাডমিরালের।

'ডক্টর প্রাইসের ফিল্ড ছিল হাইড্রলজি। পানির ধরন-ধারণ-ধর্ম নিয়ে গবেষণাই ছিল তাঁর কাজ। জলমগ্ন গুহাকে পাম্পের সাহায্যে পানিমুক্ত করে শুকানোর বিদ্যা জানা লোকের সংখ্যা হাতে গোণা যায়, তাঁদেরই একজন ছিলেন ডক্টর প্রাইস।'

স্থির চোখে আরনের দিকে তাকিয়ে আছেন অ্যাডমিরাল। কিন্তু আর কোন মন্তব্য করলেন না ডক্টর।

টেবিলে আস্তে করে চাপড় মারলেন ম্যাকডেভিড, উঠে দাঁড়ালেন। 'ডক্টর আরন, ডক্টর শারম্যান, অনেক সাহায্য করলেন আপনারা। ঋণী হয়ে থাকল ইউ.এস.নেভি…আমাদের হাতে সময় কম…'

উঠে দাঁড়ালেন দুই ডক্টর। একে একে হাত মেলালেন অন্য তিনজনের সঙ্গে। গুডবাই জানিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

ঘরের অন্য পাশে দেয়ালে বিশাল এক ম্যাপ ঝুলছে। উঠে ম্যাপটার কাছে এগিয়ে গেল রানা। শক্ত পিঠ উঁচু কাঠের চেয়ারে এতক্ষণ একটানা বসে থেকে পিঠ ব্যথা হয়ে গেছে তার।

নিজের চেয়ারেই বসে রইল টার্নার। পেছন থেকে বলল, 'কাদের বিরুদ্ধে

লেগেছি, এখন জানি আমরা।'

'তাই বুঝি?' শান্তকণ্ঠে বলল রানা। ম্যাপের মাঝখানে বিশেষ একটা জায়গায় গোল লাল চিহ্নটার দিকে তাকিয়ে আছে।

'সত্যিই কি জানি আমরা, কাদের বিরুদ্ধে লেগেছি?'

চার ঘন্টা একটানা ঘুমিয়েছে রানা। চোখ খুলেই মোজা পরা দুটো ফর্সা পা দেখতে পেল চোখের সামনে। ঘাড় কাত করে ওপরের দিকে তাকাল সে। সিভিল পোশাকে দাঁড়িয়ে আছে একটা মেয়ে, নেভির সেই লেফটেন্যান্ট। 'ভারি সুন্দর পা তো আপনার!' হাসল রানা।

লাল হয়ে উঠল মেয়েটার গাল। হাসি ফুটল চোখের তারায়। হাতের কাপ বাড়িয়ে ধরে বলল, 'কফি।'

'এটা অ্যাডমিরালের প্রাইভেট স্টাডি, এখানে কোন মেয়ের প্রশংসা করা নিষিদ্ধ।' মুচকে হাসল মেয়েটা। 'যাই। অ্যাডমিরালকে গিয়ে বলি আপনি উঠেছেন।'

পাশের ছোট্ট টিপয়ে কাপটা নামিয়ে রেখে ঘুরে হাঁটতে লাগল মেয়েটা।

পেছন থেকে তাকিয়ে রইল রানা, চোখ দুটো অনুসরণ করছে মেয়েটাকে। একটু যেন বেশি দুলছে না নিতম্ব? লেফটেন্যান্ট ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে কাউচে উঠে বসল রানা। মাথার ওপর হাত তুলে টান টান করে আড়মোড়া ভাঙল, হাই তুলল চিৎকার করে, ঘরটায় চোখ বোলাল।

একটু আগেও এ ঘরে ছিলেন অ্যাডমিরাল, তার সমস্ত চিহ্ন বর্তমান। ডেস্কে, মেঝেতে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য চার্ট, কাগজপত্র। সিগারেটের পোড়া টুকরোয় ভরা অ্যাশট্রে।

সিগারেটের জন্যে পকেটে হাত ঢোকাল রানা, নেই। হতাশ হয়ে কফির কাপ হাতে তুলে নিল। গরম কফি পেটে পড়তেই ঘুম ঘুম ভাবটা দূর হয়ে গেল। গিলটি মিঞার কথা মনে পড়ল এই সময়। ভাবনার কিছু নেই। হোটেল থেকে ওরা দু'জনে একই সঙ্গে ম্যাকডেভিডের হেডকোয়ার্টারে এসেছে। গিলটি মিঞাকে বাইরের একটা ঘরে বসিয়ে রেখে কনফারেন্স রূমে এসে ঢুকেছে সে। কথাবার্তার পর অ্যাডমিরালের প্রাইভেট স্টাডিতে ঘুমানোর জায়গা দেয়া হয়েছে রানাকে, হোটেলে ফিরে যাওয়া নিরাপদ নয়, কাজেই যেতে দেননি অ্যাডমিরাল। গিলটি মিঞাকেও রেখে দেয়া হয়েছে হেডকোয়ার্টারেই। ঘরে এসে ঢুকলেন অ্যাডমিরাল, ভাবনার জগৎ থেকে ফিরে এল রানা।

'দুঃখিত, রানা,' কাউচটার দিকে তাকিয়ে বললেন অ্যাডমিরাল, 'ঘুমানোর ভাল জায়গা দিতে পারিনি...'

'খুব আরামে ঘুমিয়েছি। ওসব কথা থাক। ভেরোনির ট্রান্সমিটার খুঁজে পাওয়া গেছে নিশ্চয়ই?'

সামান্য একটু ওপরে উঠল অ্যাডমিরালের ভুরু। 'এইমাত্র উঠলেন ঘুম থেকে। কি করে জানলেন?'

শ্রাগ করল রানা। 'অনুমান।'

'একটা রেকন প্লেন পাঠিয়েছিলাম। মাত্র দু'ঘণ্টা লেগেছে।' বললেন অ্যাডমিরাল। 'তিনশো ফুট উঁচু অ্যান্টেনা লুকিয়ে রাখার জিনিস নয়।'

'কোথায় ওটা।'

'মাউই দ্বীপের এক নির্জন কোণে। পরিত্যক্ত একটা মিলিটারি ঘাঁটিতে বসানো হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ডিফেন্স আর্টিলারি ওই ঘাঁটি তৈরি করেছিল। পুরানো রেকর্ডপত্র ঘেঁটে জানা গেছে, অনেক বছর আগেই পুরো এলাকাটা সিভিলিয়ানের কাছে বিক্রি করে দেয়া হয়েছে।'

'নিশ্চয় ফ্র্যাংকলিন করপোরেশনের কাছে?' জানতে চাইল রানা।

ভ্রূকুটি করলেন অ্যাডমিরাল। 'এবারেও অনুমানেই বলছেন, না?'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

'বেশ,' রহস্যময় হাসি হাসলেন অ্যাডমিরাল। 'আরেকটা অনুমান করুন তো, পিকারিঙের কি হয়েছে?'

ভুরু কুঁচকে অ্যাডমিরালের দিকে তাকাল রানা। হাসি হাসি ভাবটা দূর হয়ে গেছে চেহারা থেকে। জবাব দিল না।

'অনুমান করতে পারছেন কি, আগামীকাল এই সময়ে হনলুলুর ঘাটে বাঁধা থাকবে জাহাজটা?'

এবারে সত্যিই অবাক হলো রানা। 'তা কি করে সম্ভব?'

'কেন, রিচার্ড বলেনি, এখানে বসেই জাহাজটাকে চালাতে পারি আমরা?'

'বলেছে। কিন্তু কয়েকটা বিশেষ যন্ত্রপাতি ভেঙে দিলে, কয়েকটা তার কেটে দিলে ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে যাবে পিকারিঙের। স্টিয়ারিং ইকুইপমেন্ট আপনাদের কন্ট্রোলের বাইরে চলে যাবে। ভেরোনির লোকেরা কয়েকটা তার সহজেই কেটে দিতে পারবে।'

'না মিস্টার, পারবে না। আপনি কপ্টার নিয়ে উড়াল দেবার পর পরই, জাহাজটাকে হাওয়াইয়ে ফিরিয়ে আনার প্রোগ্রাম সেট করেছি আমরা, কম্পিউটারে। আর তার কাটার কথা বলছেন তো, সে ভাবনাটা আগেই ভেবেছি আমরা। স্যালভেজ অপারেশনে যথেষ্ট বিপদ আছে, তাই আগে থেকেই হুঁশিয়ার থাকতে হয় আমাদের। এখানে বসেই ইলেকট্রনিক কমান্ডের সাহায্যে পিকারিঙের ইঞ্জিন রুম আর নেভিগেশনাল কন্ট্রোল রুমের দরজা বন্ধ করে দিতে পারি। আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যেও ওই ইস্পাতের দরজা কেটে ঢুকতে দশ ঘণ্টা লাগবে। আর দশ ঘণ্টা প্রচুর সময়। এই সময়ের মাঝে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে আসা যায় জাহাজটাকে।'

'ক্রু ছাড়াই চলতে পারে?'

'পারে। কিন্তু এখন চলছে না। কপ্টারে করে ক্রু পাঠিয়ে দিয়েছি। ভোরের আলো ফোটার সময়েই ল্যান্ড করেছে ওরা পিকারিঙে।'

'ও। তা পিকারিঙকে তো ফিরিয়ে আনা হচ্ছে, স্করপিয়নের কি হবে?'

'ওটার আশা ছাড়তে হচ্ছে আমাদের,' কোনরকম অনুভূতি নেই

অ্যাডমিরালের গলায়। 'পেন্টাগন থেকে আদেশ এসেছে। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন জয়েন্ট চীফেরা। মারাত্মক মিসাইল রয়েছে ওতে। শত্রুপক্ষ ওগুলো হাতিয়ে নেবার আগেই ধ্বংস করে দিতে হবে সাবমেরিনটাকে।'

'কি করে ধ্বংস করবেন?'

'আগামীকাল ভোর পাঁচটায় একটা হাইপারিয়ন মিসাইল ছুঁড়বে ফ্রিগেট সাইক্লপস। সাবমেরিনটার টুকরোটাকরা পরে তুলে নিতে পারব আমরা।'

'কোন চেষ্টা না করেই মিসাইল মেরে...'

'হ্যাঁ। নেভির একটা ক্র্যাক-টীম নিয়ে সাবমেরিনটাকে তুলে আনতে যেতে চেয়েছিলাম, বড় কর্তারা রাজি হলেন না। তাঁরা ভয় করছেন, লঞ্চিং সিকোয়েন্স যদি ইতিমধ্যে কম্পিউট করে থাকে তাহলে একটা বোতাম টিপেই পৃথিবীর বড় বড় তিরিশটা শহর ধুলোয় মিশিয়ে দিতে পারবে ভেরোনি। এ ঝুঁকি তাঁরা নিতে পারেন না।'

'কিন্তু ভীষণ জটিল ওই কাজ কি পারবে ভেরোনি? রাশিয়ার বাইরে কোথাও হিট করতে হলে মিসাইলগুলোর গাইডেন্স কন্ট্রোল রিপ্রোগ্রাম করতে হবে। পারবে সে?'

'কর্তাদের ভয়, যদি পারে! ভেরোনির পক্ষে এই ক'দিনে শিখে নেয়া সম্ভব।'

'আমি মানতে পারছি না। ছয় মাস সময় পেয়েছে ভেরোনি, ধরতে গেলে তিরিশটা মিসাইলের ওপর বসে থেকেছে। এতদিনে শিখতে পারেনি, এই দু'দিনেই শিখে ফেলবে? শিখে থাকলে কবেই তার হুমকি-ধামকি শুরু হয়ে যেত!'

'হয়তো ঠিকই বলেছেন, কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে, এবং আদেশ মানতে আমি বাধ্য।'

দীর্ঘ এক মুহূর্ত অ্যাডমিরালের চোখে চোখে চেয়ে রইল রানা। 'কোরিনের কথা জানেন কর্তারা?'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ালেন অ্যাডমিরাল। 'জানাইনি। আমার ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে দেশের কাজে বাধার সৃষ্টি করতে চাই না।'

'হয়তো এখনও হনলুলুতেই আছে ভেরোনি, কোরিনও। আগামীকাল সকালের আগে ভেরোনিকে ধরে ফেলতে পারলে...'

'কি ভাবছেন, বুঝতে পারছি। ভেরোনিকে ধরতে পারলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়, ঠিক। কিন্তু আমাদের কপাল খারাপ। ধরা যাচ্ছে না। কোরিনকে নিয়ে ডুবোপর্বতে চলে গেছে সে।'

'সেকথা সঠিক করে বলতে পারেন না।'

'হাওয়াই দ্বীপের লাইসেন্স পাওয়া প্রতিটা প্রাইভেট এয়ার ক্র্যাফটের মালিক খুঁজতে গিয়ে আমার লোক আবিষ্কার করেছে, একটা জেট সীপ্লেন ফ্র্যাংকলিন করপোরেশনের নামে রেজিস্ট্রি করা। সঙ্গে সঙ্গে সিকিউরিটির একটা দল ছুটে যায় প্লেনটা যেখানে রাখা হয়েছিল, সেই ডকে। কিন্তু দেরি করে ফেলে। ওরা পৌঁছানোর দু'ঘণ্টা আগেই উড়ে গেছে প্লেনটা। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছে তাদেরকে, একটা বিশালদেহী লোক সঙ্গে কালোচুলো একটা মেয়েকে নিয়ে প্লেনে

উঠেছে। স্যাটেলাইটের সাহায্যে ট্র্যাক করে জানা গেছে স্করপিয়নের কাছাকাছিই পানিতে নেমেছে প্লেনটা।'

'হুঁ। ঠিকই বলেছেন, ডুবোপর্বতে ভেরোনির ওখানেই আছে তাহলে কোরিন।'

নীরবে মাথা ঝাঁকালেন অ্যাডমিরাল।

একটা চেয়ার টেনে এনে অ্যাডমিরালের ডেস্কের উল্টোদিকে বসে পড়ল রানা। 'স্করপিয়ন এবং তার আশপাশের এলাকা, মানে ডুবোপর্বতটা ধ্বংস করে দেয়া নিতান্তই বোকামি হবে। ভেরোনি আসলে ওখানে কি করছে কিচ্ছু জানতে পারব না আমরা। শুধু ওখানেই, না সাগরের আরও কোন জায়গায় এমনি ঘাঁটি তৈরি করেছে ভেরোনি জানা যাবে না। ওকি কোন বিদেশী শত্রুর এজেন্ট? ডুবোপর্বতে তার আস্তানায় স্করপিয়নের নাবিক-অফিসারেরা যে এখনও বেঁচে নেই, সে-কথাই বা কে বলতে পারে? এমনি আরও অনেক প্রশ্ন আছে। জায়গাটা ধ্বংস করে দিলে যেগুলোর উত্তর কোনদিনই পাব না আমরা। তাছাড়া ভুলে যাবেন না, বাংলাদেশী একটা জাহাজও রয়েছে ওখানে, জাহাজটাকে খুঁজে পাইনি আমি এখনও। চল্লিশ কোটি টাকা ধ্বংস করে দেয়াটা আমার দেশের জন্যে বিরাট ক্ষতির ব্যাপার। একটা কথার জবাব দিন তো, স্যার, সাত হাজার মাইল দূরে বসে কিছু কর্তাব্যক্তি ভুলভাল বিশ্লেষণ করে অন্যায় হুকুম দেবে, আমাদের কেন সেটা মানতেই হবে? হাঁদারামের মত বসে বসে শুধু আঙুলই বা চুষব কেন? আমি বলছি কি...'

'হয়েছে, হয়েছে!' হাত তুললেন অ্যাডমিরাল, কণ্ঠে তিক্ততা। 'আমাকে যা বলা হয়েছে, তাই করব, এবং আপনিও আমার কথা শুনবেন।'

'না, আমি শুনব না!' শান্ত কিন্তু ইস্পাত-কঠিন রানার গলা। 'চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি মারাত্মক ভুল হচ্ছে। শুধু চুপচাপ দেখে যাবার বান্দা আমি নই। আমার সাধ্যমত চেষ্টা আমি করবই।'

তিরিশ বছর নেভির চাকরি করছেন অ্যাডমিরাল ম্যাকডেভিড, এত বছরে আজ পর্যন্ত কেউ তাঁর আদেশ অমান্য করার স্পর্ধা দেখায়নি। অথচ অমান্য করতে যাচ্ছে বাংলাদেশী সাধারণ এক মেজর, বয়সে পদবীতে তাঁর চেয়ে যে অনেক অনেক ছোট! লোকটাকে ধমক দেবার ক্ষমতা পর্যন্ত যেন হারিয়ে ফেলেছেন তিনি। শান্তকণ্ঠে বললেন শুধু, 'তাহলে আপনাকে ঘরে তালা মেরে রাখা ছাড়া আর কোন পথ নেই।'

'চেষ্টা করে দেখতে পারেন,' বরফের মত শীতল রানার কণ্ঠ। 'আমি ঠিক কথা বলছি, এবং আমাকে বুঝিয়ে বিরত করার মত কোন কথা নেই আপনার মুখে। মরগান ওরফে ভেরোনি ওরফে যাই হোক, ওকে এবং ওর সাথে কোরিন এবং সম্ভবত স্করপিয়নের বেশ কিছু নাবিককে নাহয় শেষ করে দিলামই আমরা; এর পরেও যদি জাহাজ হারায়? বোকার মত অবাকই হব শুধু। আগামী বছরগুলোতে যদি আরও জাহাজ হারায়, আবার গোড়া থেকে শুরু করতে হবে আমাদের। এই ভেরোনির লোকেরাই যদি তখন ওসব জাহাজ গায়েব করে, ওদের ধরতে পারব না

আমরা, গ্যারান্টি দিতে পারি। ওদের কাজকর্মের ধারা, উদ্দেশ্য, কিছুই জানা নেই আমাদের।'

স্বপ্নের মধ্যে যেন রানাকে দেখছেন, এমনি দৃষ্টি অ্যাডমিরালের চোখে। বিশ বছর আগে হলে, ঠিক এই ধরনের পরিস্থিতিতে পড়লে, ক্যারিয়ারের কপালে লাথি মেরে ঝুঁকি নিয়ে নিতেন তিনি। তিরিশ বছরের চাকুরি জীবনে একবারের জন্যেও ওপরওয়ালার আদেশ অমান্য করেননি তিনি, আসলে করার সুযোগই পাননি কখনও···। তবে আজ পেয়েছেন, মনের গভীরে হঠাৎই অতি সূক্ষ্ম একটা সুড়সুড়ি অনুভব করলেন যেন অ্যাডমিরাল ম্যাকডেভিড। কিন্তু অসম্ভব একটা কাজের জন্যে ঝুঁকি নিয়ে এতদিনের সুনাম নষ্ট করবেন?···এই সময়ই মনে পড়ল তাঁর, অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের কথা: 'এই ছেলেটির অভিধানে "অসম্ভব" শব্দটা খুঁজেই পাবেন না আপনি।'

চেয়ারে সোজা হয়ে বসলেন অ্যাডমিরাল। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। কঠোর প্রতিজ্ঞার ছায়া ফুটেছে চেহারায়। 'ঠিক আছে, মেজর,' এই প্রথম রানার পদবী ধরে ডাকলেন অ্যাডমিরাল, 'আপনিই জিতলেন। এর জন্যে হয়তো অনেক বড় খেসারত দিতে হবে আমাকে। হোক। তবে আপনার প্ল্যান সঠিক হলে সবদিক থেকেই মঙ্গল।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রানা। 'ট্রেইনড একদল সাবমেরিন ক্রু ঢোকাব আমরা স্করপিয়নে। আপনার সিকিউরিটির আরেকটা দলকে পাঠাব ভেরোনির ট্রান্সমিটার অফ করে দিতে। আগামীকাল ভোর চারটার আগেই কাজটা করতে হবে ওদের।'

'বলার চেয়ে করা অনেক কঠিন,' বিড়বিড় করলেন অ্যাডমিরাল। 'পনেরো ঘণ্টাও নেই আমাদের হাতে।'

কয়েক মুহূর্ত নীরব রইল রানা। তারপর কথা বলল। ঠাণ্ডা দৃঢ় গলার স্বর, পাথুরে কঠিন চেহারা। 'সমাধান বের করে ফেলেছি। একটা প্লেন নষ্ট হবে। তবে সফল হবার ফিফটি-ফিফটিরও বেশি চান্স রয়েছে এতে।'

গড় গড় করে নিজের পরিকল্পনার কথা বলে গেল রানা। মন দিয়ে শুনলেন অ্যাডমিরাল।

রানার কথা শেষ হলে চেয়ারে নড়েচড়ে বসলেন অ্যাডমিরাল। মিথ্যাচার করতে বলছে রানা, এর ফলে কঠোর শাস্তি হতে পারে তাঁর। জানেন, এই প্ল্যান নিয়ে রানাকে এগিয়ে যাবার অনুমতি দেয়া নিতান্তই পাগলামি, তবু অমত করলেন না তিনি।

হঠাৎ অ্যাডমিরালের পেছনের দেয়াল আলমারির দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে গেল রানা। ধীরে ধীরে খুলে যাচ্ছে দরজা। ভেতর থেকে বানরের মত লাফ মেরে বেরিয়ে এল গিলটি মিঞা।

রানার বিস্মিত দৃষ্টি অনুসরণ করে ফিরে চাইলেন অ্যাডিমরাল। অবাক হয়ে গেলেন তিনিও।

'গিলটি মিঞা, তুমি এখানে?' প্রশ্ন করল রানা।

হাত কচলাচ্ছে গিলটি মিঞা। 'একা একা ভাল্লাগছিল না, স্যার।

মেয়েছেলেগুলো সবাই মিলে সেকি বকবকানি। ওদের কতা বুজলে এক কতা ছিল, কিছুই বোজা যায় না। পালিয়ে চলে এলুম। আপনি যতক্ষণ ঘুমাচ্ছিলেন, ওই আলমারির মদ্যেই ডেঁড়িয়ে ছিলুম।'

'কিন্তু পালিয়ে এলে কেন? কাউকে বললেই তো এখানে নিয়ে আসত?'

'যদি না আনত? যদি এঁটকে দিত? কি দরকার, স্যার, ঝামেলার। স্বাদীনভাবে চলে এলুম, যেখানে মন, সেখানে গমন···'

এইসব আদি ও অকৃত্রিম বাংলা কথার কিছুই বুঝলেন না অ্যাডমিরাল। রানাকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিলেন। নতুন দৃষ্টিতে তাকালেন গিলটি মিঞার দিকে।

'আপনি বিপদের মদ্যে যাচ্চেন, স্যার। আমি সব শুনেচি ওকান থেকে,' আঙুল তুলে আলমারি দেখিয়ে বলল গিলটি মিঞা।

'হ্যাঁ, যাচ্ছি।'

'আমিও যাচ্চি,' একগাল হাসল গিলটি মিঞা।

'আরে না। তুমি যাবে কোথায়? তুমি এখানেই থাকবে।'

'আমি চোর-ছ্যাঁচ্চোড় মানুষ হতে পারি, স্যার, কিন্তুক চোরের চেয়ে ছ্যাঁচোড়ের ভাগটা আমার মদ্যে বেশি। বেয়াদবি নেবেন না, স্যার। আমি যাব। আপনার দেকাশোনা করতে সেই ঢাকা থেকে এসেচি।···আমাকে রেকে যেতে পারবেন না।'

'আরে, ওখানে তোমার কি দরকার? আমার দেখাশোনা আমি নিজেই করতে পারব, সে নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না।'

'যত-যা-ই বলুন, মুক আচে বলতে পারেন, স্যার। আমি যাবই কিন্তুক। আপনাকে বেঘোরে মরতে দিতে পারি না কিচুতেই। যদি মরতে বসেন, কে বাঁচাবে?···আমি যাব,স্যার, সাফ কতা।' একটু থেমে কি যেন ভাবল গিলটি মিঞা। তারপর বলল, 'পানিকে ডরাই ভাবচেন তো? মোটেই না। সাঁতার তো কবেই শিখে লিয়েচি। তারপর ওই যে, রাবারের খোলগুলো, আপনার পাল্লায় পড়ে ওগুলোও তো ব্যভার করতে শিকেচি···'

হ্যাঁ-না কিছু বলল না রানা। গিলটি মিঞার দিকে তাকিয়ে আছে। ভাবছে।

রানার মৌনতাকে সম্মতির লক্ষণ ধরে নিল গিলটি মিঞা। খিলখিল করে হেসে বলল, 'তাহলে ওই কতাই রইল, স্যার, আমিও যাচ্চি আপনার সঙ্গে···'

পাঁচ

পুরানো একটা ডগলাস সি-৫৪ বিমান। মৌসুমি বাতাসে ডানা মেলে বিশাল এক নিশাচর পাখির মত উড়ে চলেছে উত্তরে। ককপিটের জানালা দিয়ে নিচে তাকাল রানা। আলো চোখে পড়ল, উত্তর-পুবে স্যানফ্র্যান্সিসকোর দিকে চলেছে একটা

সদাগরী জাহাজ। ফসফরাসের ঝিকিমিকি নেই, নিকষ কালো সাগর, আয়নার মত সমতল মনে হচ্ছে। শান্ত সাগরে প্লেন নামাতে সুবিধে, ভাবল রানা, তবে অসুবিধেও আছে। অন্ধকারে ওপর থেকে সঠিক উচ্চতা অনুমান করা যায় না।

'আর কদ্দূর, মিস্টার রানা?'

পেছনে প্রশ্ন শুনে ফিরে তাকাল রানা। হাসিমুখে তার দিকে তাকিয়ে আছে লোকটা। রবারের কালো ডাইভিং স্যুট পরনে, হাসিখুশি মুখ, মাথায় সোনালী চুল। চেহারাটা স্ক্যান্ডিনেভিয়ান। লেফটেন্যান্ট কমান্ডার পিটার হপকিন্স।

'আরও পাঁচশো মাইল,' জবাব দিল রানা।

এগিয়ে এসে কো-পাইলটের সীটে উঠে বসল হপকিন্স। প্যানেলের মিটারগুলোর দিকে তাকাল। 'যে স্পীডে চালাচ্ছেন, আরও দু'ঘণ্টা লাগবে। করবেনই বা কি, প্লেনটা যে চলছে এ-ই বেশি।' অলটিমিটারের দিকে তাকিয়ে আপন মনেই বলল, 'হুঁ, বারো হাজার ফুট ওপরে রয়েছি।' রানার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'নামতে শুরু করবেন কখন?'

'এক ঘণ্টা চল্লিশ মিনিট পর। সময় কিংবা অন্যান্য হিসেবে ভুল করলে চলবে না। এই একবারই—দ্বিতীয় সুযোগ পাব না আমরা।'

ঝুঁকে, ইনস্ট্রুমেন্টস প্যানেলের মাঝখানের চওড়া ডায়ালটায় টোকা দিল হপকিন্স। 'আন্ডারওয়াটার পজিশন মার্কারটা ঠিকমত সঙ্কেত পাঠালে ভুল তো হবার কথা নয়।'

হোমিং ডিভাইসের দিকে তাকাল রানা। কোর্স অ্যাডজাস্ট করতে লাগল। গোল কাচের নিচে কাঁটাটা জায়গামত এনে রাখল। 'ঠিকই বলেছেন। যতই কাছে এগোব আমরা, সিগন্যালের আওয়াজ বাড়বে।'

'পাঁচশো গজের ভেতরে নিয়ে যান প্লেনটাকে, বাকি কাজ সেলমা স্লুপই সেরে দেবে।' একটা ছোট্ট নীল ওয়াটারপ্রুফ বাক্স দেখাল হপকিন্স। পাইলটের সীটের এক হাতলে শক্ত করে বাঁধা রয়েছে ব্যাটারি-চালিত রেডিও ডাইরেকশন ফাইন্ডারটা।

'ওই সেলমা কাজ করবে, আপনি শিওর?' রানার গলায় সন্দেহ।

'নিশ্চয়ই,' জোর গলায় বলল হপকিন্স। 'ওই যে বললাম, বীপারের পাঁচশো গজের ভেতরে নিয়ে যান আমাকে, ব্যস, সবাইকে পথ দেখিয়ে স্করপিয়নে পৌঁছে দেব আমি।'

হাসল রানা। হপকিন্সের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল। 'গুড!'

'কিন্তু পুরো ব্যাপারটাই পাগলামি মনে হচ্ছে আমার,' অনিশ্চিত শোনাল হপকিন্সের গলা। 'কাজ করি সাবমেরিনে, জীবন কাটে পানিতেই। ডুবে মরলে অবাক হবার কিছুই নেই। কিন্তু পানিতে প্লেন ক্র্যাশ করে যদি মরি...।'

'অত ঘাবড়াবার কিছু নেই,' অভয় দিল রানা। 'টেরও পাবেন না কখন নেমেছি...'

চোখ তুলে চাইল হপকিন্স, চোখে বিস্ময়। 'টেরও পাব না...'

'দেখুন, প্লেনটাকে নিরাপদে নামানো আমার দায়িত্ব। আপনার জায়গায় আমি

হলে কিন্তু নামার পরে কি হবে, তাই নিয়ে বেশি ভাবতাম।'

'সাবমেরিনের এঞ্জিনিয়ারিং অফিসার আমি,' নিরীহ গলায় বলল হপকিন্স। 'এঞ্জিন সারাতে পারি, যুদ্ধে আনাড়ি নই, প্লেন চালাতেও জানি মোটামুটি, তবে সাবমেরিনের ভেতর আন-আর্মড কমব্যাট আমাকে দিয়ে হবেটবে না।'

'আপনাকে এবং আপনার উনিশজন ক্রুকে নিরাপদে নামিয়ে দেয়া আমার দায়িত্ব,' শান্তকণ্ঠে বলল রানা। 'তারপরের কাজ আপনার, সে যেমন বা যাই-হোক।'

'সত্যিই কি শুকনো রয়েছে সাবমেরিনের ভেতরটা?' কথার মোড় ঘোরাল হপকিন্স।

'আমি যখন বেরিয়ে আসি ওটা থেকে, শুকনোই ছিল, ফরোয়ার্ড টর্পেডো কম্পার্টমেন্ট ছাড়া।'

'টর্পেডো রূমের পানি বের করে সাবমেরিনটাকে রওনা করাতে চার ঘণ্টার বেশি লাগবে না আমাদের। অবশ্য যদি যন্ত্র পাতিতে আর কেউ হাত না দিয়ে থাকে তবেই।'

'তারমানে আধ ঘণ্টা বেশি সময় পাচ্ছেন হাতে।'

'কোন গোলমাল ঘটে গেলে কিন্তু ওই আধ ঘণ্টায় কিছুই হবে না।' এদিক ওদিক মাথা নাড়াল হপকিন্স। 'আসলে স্রেফ আত্মহত্যা করতে চলেছি আমরা!'

'বুঝতে পারছেন নিশ্চয়, সাবমেরিনে ঢোকার আগে বা পরে ছোট-খাট যুদ্ধও করতে হতে পারে?'

'আগেই বলেছি, আমি এঞ্জিনিয়ার মানুষ, ব্রুস লী নই। তাই পাঁচজন খুনীকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি। স্পেশাল ডিপার্টমেন্টের লোক ওরা। চোখ দেখলেই কলজে কাঁপে।'

এয়ার পোর্টেই ওদের দেখেছে রানা। পাঁচজন লোক, চোখ দেখলেই বোঝা যায়, খুন-খারাবি কিছুই না ওদের কাছে। আমেরিকান নেভির বাছাইকরা সিকিউরিটি ফোর্সের লোক। পানি এবং ডাঙায় যুদ্ধের বিশেষ ট্রেনিং দেয়া হয়েছে বিশালদেহী এই লোকগুলোকে।

'বাকি চোদ্দজন?' জানতে চাইল রানা।

'সাবমেরিনার,' গর্বের ছোঁয়া হপকিন্সের গলায়। 'স্করপিয়নের মত সাবমেরিনকে অপারেট করা যার তার কাজ নয়। যদি ওটাকে পার্ল হারবারে কেউ ফিরিয়ে নিতে পারে, ওরা পারবে। কিন্তু নতুন করে পাওয়ার চালু করতে হলেই গেছি আমরা।'

'রি-অ্যাকটর আছে একটা, ভুলে যাচ্ছেন,' বলল বটে, রানার গলায় জোর নেই। রি-অ্যাকটরটা এখনও চালু আছে কিনা, জানে না সে। সাবমেরিনটাই এখনও আছে কিনা ওখানে, তাই বা কে বলতে পারে! 'ওসব নিয়ে আগেভাগে চিন্তা করে লাভ নেই। গিয়ে দেখা যাবে'খন। তবে কোন গোলমাল ঘটে গেলে, সাড়ে চারটার মধ্যে অবশ্যই বেরিয়ে আসতে হবে স্করপিয়ন থেকে, আদেশটার কথা মনে আছে, নিশ্চয়ই?'

'হিরো হয়ে মরার কোন ইচ্ছেই আমার নেই। মনে আছে।' ককপিটের

জানালা দিয়ে নিচের অন্ধকার সাগরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে হপকিন্স। চিন্তিত।
রেডিও নিয়ে ব্যস্ত হলো রানা।

গত এক ঘন্টায় এই নিয়ে বিশবার ঘড়ি দেখলেন অ্যাডমিরাল ম্যাকডেভিড। পায়ের তলায় পিষে মারলেন জ্বলন্ত সিগারেটের টুকরোটা। চেয়ার থেকে উঠে গিয়ে দাঁড়ালেন অপারেশন রূমের অন্যপ্রান্তের দেয়ালে ঝোলানো বিশাল ম্যাপটার সামনে। খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন ম্যাপের দিকে, তারপর ফিরে চাইলেন। গোটা ঘরটায় ব্যস্ততা। পিঠ-খাড়া একটা চেয়ারে বসে আছে জন টার্নার, জুতোসুদ্ধ পা তুলে দিয়েছে অন্য একটা চেয়ারের পেছনে। আধবোজা চোখ, দুনিয়ার কোন কিছুর প্রতিই যেন কোন খেয়াল নেই। কিন্তু সি-৫৪ থেকে রেডিও মেসেজ আসার সঙ্গে সঙ্গে ঝট করে সোজা হয়ে গেল তার দেহটা, নিমেষে জ্যান্ত হয়ে উঠেছে চোখ।

'বিগ ড্যাডি, খোকা বলছি। শুনতে পাচ্ছ?' রেডিও সেটের ওপরে বসানো অ্যামপ্লিফায়ারে কড়কড় করে উঠল রানার গলা।

অপারেটর কোন জবাব দেবার আগেই তার ওপর এসে ঝুঁকে দাঁড়ালেন অ্যাডমিরাল আর টার্নার।

জবাব দিল অপারেটর, 'বিগ ড্যাডি বলছি, খোকা। বলে যান। ওভার।'

'ফ্ল্যাগ নামাচ্ছি আমি। ওভার।' ডুবোপর্বতের ওপরে প্লেন নামাতে যাচ্ছে রানা, এটা তারই সঙ্কেত।

মাইক্রোফোনের জবাব দিল অপারেটর, 'ট্রফি নিয়ে অপেক্ষা করছি আমরা, আপনার জেতার অপেক্ষায় আছি। ওভার।'

'উইনার সার্কেলে দেখা হবে...।' মাঝপথেই থেমে গেল কথা।

ছোঁ মেরে রিসিভার ছিনিয়ে নিলেন অ্যাডমিরাল। 'খোকা, কথা বলো। বিগ ড্যাডি বলছি। ওভার।'

নীরবতা। তারপর আবার শোনা গেল কথা, আগের চেয়ে জোরাল, গলার স্বরও সামান্য বদলে গেছে। 'দেরি করে ফেললাম, বিগ ড্যাডি, দুঃখিত।...আপনার আদেশ জানান। ওভার।'

চট করে টার্নারের দিকে তাকালেন অ্যাডমিরাল। চোখে চোখে কথা হয়ে গেল দু'জনের। দু'জনেরই মুখ থেকে রক্ত সরে গেছে। দু'জনেই বুঝতে পারছেন কি ব্যাপার।

'আদেশ?' ধীরে ধীরে কথা বললেন অ্যাডমিরাল। 'আদেশ জানতে চাইছেন?'

'হ্যাঁ। খুলে বলুন, প্লীজ,' কথা ভেসে এল মাইক্রোফোনে।

ঘোরের মধ্যে রয়েছেন যেন, মাইক্রোফোন নামিয়ে রেখে ট্রান্সমিটারের সুইচ অফ করে দিলেন অ্যাডমিরাল। 'হা, ঈশ্বর! আমাদের ফ্রিকোয়েন্সী ধরে ফেলেছে ওরা!' যান্ত্রিক শোনাল ম্যাকডেভিডের গলা।

আচমকা গুলি খেয়েছে যেন টার্নার, এমনিভাবে তাকাল অ্যাডমিরালের দিকে। 'রানার গলা নয় ওটা!' ব্যাপারটা নিজেই বিশ্বাস করতে পারছে না যেন সে।

'ফ্রিকোয়েন্সীটা ঠিকই আবিষ্কার করে ফেলেছে ভেরোনির ট্রান্সমিটার।'

আস্তে করে একটা চেয়ারে বসে পড়লেন ম্যাকডেভিড। 'পাগলামি, পুরো প্ল্যানটাই মস্ত এক পাগলামি। সায় দেয়া কিছুতেই উচিত হয়নি আমার। স্করপিয়নে ঢুকে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের আর কোন উপায়ই থাকল না পিটারের।'

'কম্যুনিকেশন কম্পিউটারের মাধ্যমে কোডে যোগাযোগ করতে পারবে,' টার্নার বলল।

'ভুলে গেছ?' অ্যাডমিরালের গলায় হতাশা। 'স্করপিয়নে কম্পিউটার বসানোই হয়নি। ওটার রেডিও অপারেট করা যায় শুধু স্ট্যান্ডার্ড ফ্রিকোয়েন্সীতে। ভেরোনির ট্র্যান্সমিটার যতক্ষণ না ধ্বংস করা যাচ্ছে প্রত্যেকটা ওপেন ফ্রিকোয়েন্সী ধরবে সে। আমাদের প্ল্যান কি, এখন না জানলেও, পিটার ট্রান্সমিট করতে শুরু করলেই জেনে যাবে...'

'এবং স্করপিয়নের ভেতরে যারা ঢুকবে তাদের আক্রমণ করবে। কিংবা বোমা মেরে উড়িয়ে দেবে সাবমেরিনটাকে,' অ্যাডমিরালের কথাটা শেষ করে দিল টার্নার।

একেবারে খাদে নেমে গেল অ্যাডমিরালের গলা। ফিসফিসিয়ে আপনমনেই বললেন, 'ঈশ্বর ওদের সহায় হোন! এখন ওদের রক্ষা করতে পারবেন একমাত্র তিনিই।'

কান থেকে ইয়ারফোন খুলে নিয়ে ককপিটের মেঝেতে আছড়ে ফেলল রানা। 'আমাদের যোগাযোগে বাধা দিচ্ছে হারামজাদা!' কর্কশ শোনাল তার গলা। 'আমরা কি করতে যাচ্ছি অনুমান করতে পারলে সর্বনাশ ঘটাবে ভেরোনি!'

'এই সময়ে আপনার মত বন্ধু সঙ্গে রয়েছেন, স্বস্তি পাচ্ছি,' হাসল হপকিন্স।

'স্বস্তির কিছু নেই,' হপকিন্সের হাসির জবাবে হাসল না রানা। 'অ্যাডমিরাল যদি ভেবে বসেন, আমরা মিশন ফেল করেছি, গেছি তাহলে।'

'এমনিতেও ভালমতই ফাঁদে আটকেছি,' হপকিন্সের মুখ থেকে হাসি মুছে গেছে। একটু থেমে আবার বলল, 'তবে হলুদচোখো দানবটাকে ওভার এস্টিমেট করছেন না তো! আমার তো মনে হয়, ও কিছু বোঝার আগেই স্করপিয়নকে নিয়ে পালিয়ে যেতে পারব আমরা।'

'এ ধারণা কেন হলো?'

'সহজেই,' হপকিন্সের কথায় তার প্রতি প্রশংসার ভাবটা কান এড়াল না রানার। 'রাতের অন্ধকারে তীর থেকে এতদূরে প্যাসিফিকের খোলা সমুদ্রে ক্র্যাশল্যান্ড করার কথা ভাবতেই পারবে না কেউ...দারুণ প্ল্যান আপনার। ভেরোনি নিশ্চয়ই ভাবছে প্লেন নিয়ে পর্যবেক্ষণে বেরিয়েছি আমরা। সকালের আগে কিছু করব, বা করতে পারব, কল্পনাও করবে না সে।'

'যুক্তি আছে আপনার কথায়। তবে সব সময় সব কাজ যুক্তিতর্ক মাফিক হয় না।'

'এবারে হলেই বাঁচি।'

'আমাদের অন্যান্য যাত্রীরা কি বলে? মানে এই অভিযান সম্পর্কে…?'

'যা খুশি বলুক। সেধে তো আর আনিনি, ইচ্ছে হয়েছে, এসেছে। দোজখে গিয়ে কে কি কাজ নেবে, আলোচনা করছে হয়তো। আমাদের অতসব জেনে কাজ নেই…'

এয়ার হোস্টেসের দায়িত্ব পালন করছে গিলটি মিঞা। কফি নিয়ে এল তৃতীয় ও শেষবারের মত। সাগ্রহে কাপদুটো নিল রানা ও হপকিন্স।

অলটিমিটারের দিকে তাকাল রানা। ছোট্ট সাদা কাঁটাগুলো নিচের গোঁজের ওপর অলস ভঙ্গিতে শুয়ে আছে। ল্যান্ডিং লাইটের সুইচ অন করে দিল সে। ফিউজিলাজের তলা দিয়ে দ্রুত ছুটে যাচ্ছে পানি। এয়ার স্পীড ইনডিকেটর ১৭০ নট শো করছে। হাত বাড়িয়ে তুলে দ্বিতীয় এক সেট ইয়ারফোন কানে লাগাল রানা। মন দিয়ে শুনল কয়েক মুহূর্ত। 'আন্ডারওয়াটার মার্কারের সিগন্যাল এখন চূড়ান্তে। ফাইনাল ল্যান্ডিং চেক করে ফেলা দরকার।'

অলস ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল হপকিন্স। সীট থেকে উঠে গিয়ে দাঁড়াল এঞ্জিনিয়ারস প্যানেলের সামনে। চেক লিস্টটা তুলে বাড়িয়ে দিল রানার দিকে। 'আপনি পড়ুন, আমি মিলিয়ে দেখছি।'

কার্ডে প্রিন্ট করা নাম্বার দেয়া আইটেমগুলোর নাম জোরে জোরে পড়ল রানা। মিলিয়ে দেখে জবাব দিল হপকিন্স।

'স্পার্ক অ্যাডভান্স সিলেক্টর সুইচেস্?' কার্ড দেখে জিজ্ঞেস করল রানা।

'টোয়েন্টি পারসেন্ট নর্মাল,' জবাব দিল হপকিন্স।

'মিক্সচার লেভেলস্?'

'চেক।'

গৎবাঁধা কিন্তু প্রয়োজনীয় জিনিসগুলোর নাম একে একে উচ্চারণ করে গেল রানা। কয়েক সেকেন্ড পর পরই চোখ তুলে তাকাচ্ছে নিচে সাগরের দিকে। পড়তে পড়তে কার্ডের শেষ আইটেমটায় চলে এল।

'সেন্টার উইং ট্যাংক লাইন ভাল্‌ভ অ্যান্ড বুস্ট সুইচেস্?'

'ক্লোজড অ্যান্ড অফ।'

'হয়েছে,' বলে কাঁধের ওপর দিয়ে কার্ডটা মেঝেতে ফেলে দিল রানা। 'ওটার আর দরকার নেই।'

কন্ট্রোলের ওপর ঝুঁকল হপকিন্স। আঙুল তুলে দেখিয়ে বলল, 'নাক বরাবর সামনে, দিগন্তের তারাগুলো দেখুন…আলো কেমন ম্লান হয়ে আসছে।' চেঁচিয়ে কথা বলতে হচ্ছে হপকিন্সকে। নইলে কানে লাগানো ইয়ারফোনের রিসিভারে মার্কারের জোরাল আওয়াজের জ্বালায় শুনতে পাবে না রানা।

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'ফগ ব্যাংক।'

দিগন্তের কালো রেখার ওপরের খানিকটা জায়গা আরও কালো দেখাচ্ছে। গতি কমাতে লাগল রানা। ১২০-এর ঘরে চলে এল স্পীড ইন্ডিকেটরের কাঁটা।

'সময় হয়ে গেছে,' শান্ত রানার গলা। হপকিন্সের দিকে না তাকিয়ে বলল, 'মেইন কেবিনে চলে যান। সবাইকে তৈরি হয়ে নিতে বলুন।'

'যাচ্ছি,' উঠে দাঁড়াল হপকিন্স। রানার বাহুতে আস্তে করে চাপ দিল। ঘুরেই রওনা হয়ে গেল মেইন কেবিনের দিকে।

এলোমেলো বাতাস বইছে। ধীরে ধীরে প্লেন আরও নিচে নামিয়ে আনল রানা। সাবধান, সতর্ক রয়েছে। আরও কয়েক ফুট নামতেই ল্যান্ডিং লাইটের আলোয় ঢেউয়ের উচ্চতা পরিষ্কার অনুমান করতে পারল। ভাবছে, আলো না জ্বেলে যদি নামতে পারত, তো খুবই ভাল হত, শত্রুপক্ষ কাছাকাছি থাকলেও টের পেত না। কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। টার্গেট এরিয়া এখনও মাইল তিনেক সামনে, কুয়াশাও জমছে ওখানেই। এয়ার স্পীড ১০৫-এ নেমে এসেছে।

উইং লেভেল ঠিক রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করছে রানা। একটু এদিক ওদিক হলেই, মানে, একটা ডানা ঢেউয়ে বাড়ি খেলেই কাত হয়ে যাবে প্লেন, উল্টে যাবে চোখের পলকে। ধীরে, অতি ধীরে প্লেন নামিয়ে আনতে লাগল সে। যে-কোন একটা ঢেউয়ের সামনের দিকের ঢালে প্লেনের পেট ছোঁয়ানোর ইচ্ছে, নামার বেগটা তাহলে অনেকখানি সামলে নেবে ঢেউ। আঘাতের জোর কমে যাবে অনেকখানি।

প্রপেলারের আঘাতে পানি ছিটকে উঠল। স্পীড বোটের পেছনে যেমন হয়, তেমনি ঢেউয়ের বিশাল দুই খাঁজ সৃষ্টি করল প্রপেলার, ছুটে গিয়ে ঢেউয়ের বুকে ঝাঁপ দিল প্লেন। ককপিটের উইন্ডশীল্ডে আছড়ে পড়ল কুয়াশা।

ঢেউয়ের সঙ্গে প্লেনের আঘাতের প্রথম জোর ধাক্কাটা কোনমতে সামলিয়ে নিল রানা, পরক্ষণেই এল আরেক ধাক্কা। পাথাল ঢেউটা প্লেনের তলা থেকে সরে গেল, উথাল ঢেউ এসে আঘাত হানল অ্যালুমিনিয়মের পেটে। ঢেউয়ের দেয়ালে সরাসরি ঢুকে গেল প্লেনের নাক।

ঢেউটা সরে গেল। পানিতে ভেজা উইন্ডশীল্ডের ওপারে কুয়াশা, কুয়াশা ছাড়া বাইরের আর কোন কিছুই দেখতে পাচ্ছে না রানা। তবে বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না, কাজটা করতে পেরেছে সে, নিরাপদেই সাগরের বুকে নামিয়ে এনেছে প্লেন। ঢেউয়ে মোচার খোলার মতই দুলছে সি-৫৪। ভেসে থাকবে এখন প্লেনটা, ভাবছে রানা, কয়েক মিনিট হতে পারে, আবার কয়েক দিনও হতে পারে—নির্ভর করছে কতখানি ফুটো কিংবা ফাটল সৃষ্টি হয়েছে প্লেনের পেটে, তার ওপর।

চেপে রাখা শ্বাসটা শব্দ করে ছাড়ল রানা, হেলান দিয়ে আরাম করে বসল। ঝাঁকিতে ব্যাটারির কোনও ক্ষতি হয়নি, কেবিনের হালকা আলোটা জ্বলছে ঠিকমতই। ইগনিশন সুইচ আর ল্যান্ডিং লাইটের সুইচ অফ করে দিল রানা, যতটা সম্ভব ব্যাটারির শক্তি বাঁচিয়ে রাখতে হবে। দ্রুত সীট বেল্ট খুলে উঠে পড়ল সীট থেকে। মেইন কেবিনের দিকে রওনা হলো।

কেউ বসে নেই, কেবিনের সবাই ব্যস্ত। রবারের স্যুট পরাই আছে, অন্যান্য সাজসরঞ্জাম পরতে শুরু করেছে এখন। এসকেপ হ্যাচ খুলে ফেলেছে পাঁচজন স্পেশাল ব্রাঞ্চের লোক, নিজেদের যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করছে।

'দারুণ দেখালেন, মিস্টার রানা।' দাঁত বের করে হাসল হপকিন্স। 'এত সুন্দরভাবে নামাতে পারবেন, কল্পনাও করিনি।'

'একটা ড্রিংক পাওনা হয়ে গেলাম, খেয়াল রাখবেন,' হেসে বলল রানা।

এগিয়ে গিয়ে নিজের জন্যে একসেট ডাইভিং ইকুইপমেন্ট তুলে নিল।

'প্লেনটা কতক্ষণ ভেসে থাকবে?' জানতে চাইল হপকিন্স।

'পেটটা পরীক্ষা করেছেন?' পাল্টা প্রশ্ন করল রানা।

'করেছি। তেমন কিছুই হয়নি। লোয়ার ডেকে সামান্য পানি চুইয়ে উঠছে।'

'তাহলে ডুবতে দেরি হবে।'

'প্লেনের পেটে একটা ছেঁদা করে দিলে কেমন হয়?' জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকাল হপকিন্স।

'উচিত হবে না। ভেরোনি পানির ওপর পরিত্যক্ত প্লেনটাকে দেখলে অনুমান করবে, আমরা লাইফ-র‍্যাফটে করে ভেসে পড়েছি। এবং এই কারণেই প্লেনের সমস্ত রেসকিউ ইকুইপমেন্ট হিকাম ফিল্ডেই রেখে এসেছি আমি। ওগুলো প্লেনে জায়গামত রয়ে গেছে দেখলেই সন্দেহ করে বসত ভেরোনি। কিন্তু এখন, প্রথমেই সাগরের তলায় আমাদের খোঁজ করার কথা মনে আসবে না তার। ফলে বেশ অনেকটা সময় পাব আমরা।'

'চমৎকার!'

হপকিন্সের প্রশংসায় কান না দিয়ে আবার বলল রানা, 'সাবমেরিনটাকে চালু করতে পারলেই অ্যাডমিরাল ম্যাকডেভিডের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। বারোশো পঞ্চাশ কিলোসাইকেলে।'

চোখের পাতা কাছাকাছি হলো হপকিন্সের। 'কি বলছেন? ওটা তো কমার্শিয়াল ফ্রিকোয়েন্সী। ফেডারেল কম্যুনিকেশনস কমিশন বিপদ বাধাবে না?'

'হয়তো বাধাবে,' সায় দিয়ে বলল রানা। 'কিন্তু এই ফ্রিকোয়েন্সীই এখন আমাদের একমাত্র ভরসা। আমাদের অন্যান্য ফ্রিকোয়েন্সী জানা হয়ে গেছে ভেরোনির, রেডিও যোগাযোগে বাদ সাধবে সে।'

জবাবে মৃদু শিস দিতে শুরু করল হপকিন্স, কোন কথা বলল না।

পায়ে ফ্লিপার পরে নিল রানা। ব্রিদিং রেগুলেটর পরীক্ষা করল। তারপর ঝুঁকে খোলা হ্যাচ দিয়ে বাইরে তাকাল। কালো অন্ধকার। প্লেনের পেটে ঢেউয়ের চাপড় মারার শব্দ কানে আসছে, যেন শাবাশ দিচ্ছে। বুঝতে পারছে রানা, সামান্য নিচের দিকে ঝুঁকে গেছে প্লেনের নাক।

হপকিন্সের দিকে ফিরল রানা। 'রেডি?'

হাতের সিগন্যাল ডিটেকটরের দিকে তাকিয়ে জবাব দিল হপকিন্স, 'রেডি।'

'যান তাহলে,' হ্যাচের দিকে ইঙ্গিত করে বলল রানা।

রানার দিকে পেছন ফিরে মাউথপিস অ্যাডজাস্ট করে নিল হপকিন্স। খোলা হ্যাচ দিয়ে অন্ধকার পানির দিকে তাকিয়ে দ্বিধা করল এক মুহূর্ত। বসে পড়ে এদিকে ফিরল। রানাকে উদ্দেশ্য করে হাত নাড়াল একবার। তারপর আস্তে করে নেমে গেল পানিতে।

হপকিন্সের পর নেমে গেল স্পেশাল ব্রাঞ্চের পাঁচজনের দু'জন। এরপর নামল হপকিন্সের অন্য লোকেরা, ওদের পর নামল স্পেশাল ব্রাঞ্চের বাকি তিনজন। সবার মুখেই হাসি হাসি ভাব, কিন্তু মুখ দেখে অনুমান করতে কষ্ট হলো না রানার, জোর

করে ভয় তাড়াচ্ছে ওরা।

উবু হয়ে হ্যাচ দিয়ে নিচে তাকাল রানা। একের পর এক আলো নেমে যাচ্ছে নিচের দিকে, আন্ডারওয়াটার ডাইভিং লাইট। আস্তে আস্তে সাঁতরে নিচের দিকে নেমে চলেছে ডাইভাররা।

'স্যার,' পেছনে ডাক শুনে ফিরে চাইল রানা।

ডাইভিং পোশাকে বেঢপ দেখাচ্ছে গিলটি মিঞাকে। হাতে ফেস মাস্কটা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, রানা চাইতেই বলল, 'আমরাই বাকি রয়ে গেলুম, স্যার। আমরা নাববো কখোন?'

'এই তো, এখুনি, একটু দাঁড়াও।'

নামার জন্যে তৈরি হলো রানা। মাস্কটা হাতে নিয়ে একবার চোখ বোলাল কেবিনটায়। সার্কিট বক্সের কাছে এগিয়ে গেল, বাড়ি ছেড়ে কিছুক্ষণের জন্যে বেড়াতে যাচ্ছে যেন, এমনি ভাবসাব, হাত বাড়িয়ে একে একে সবক'টা সুইচ অফ করে দিল সে।

ছয়

অন্ধকার, কুসুম গরম পানি গ্রাস করে নিল রানাকে। ডাইভ লাইটের আলোয় বিশ ফুট তলার লোকটাকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে সে। আলো দেখেই ওপরের দিকে তাকিয়েছে লোকটা, তারপর আবার নিচে নেমে যাচ্ছে একইভাবে। রানার পাশে পাশে সাঁতরাচ্ছে গিলটি মিঞা। ঘাড় কাত করে একবার দেখে নিল রানা, না, কোনরকম জড়তা নেই। পানিকে ভয় পেত সে এককালে, কিন্তু এখন ভাবভঙ্গি দেখে বোঝা যাচ্ছে সাঁতারটা ভালই রপ্ত করেছে গিলটি মিঞা।

ধীরে ধীরে সাঁতরে নামছে রানা। মনে কেমন একটা ভয় ভয় ভাব। রাতের সাগরে ডুব দিতে গিয়ে অনেক ডুবুরীরই হয় এরকম। মনে হয়, চারদিক থেকে হাজারো নাম না-জানা সাগরদানব হাঁ করে এগিয়ে আসছে, যে-কোন মুহূর্তে গিলে নেবে টুক করে। কয়েক সেকেন্ড পর পরই ডাইভিং লাইটটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আশপাশ, ওপর নিচটা দেখে নিচ্ছে রানা, কিন্তু কল্পিত দানবের চিহ্নও নেই কোথাও। শুধু নিচে আর পাশে দেখা যাচ্ছে কিম্ভূত পোশাক পরা তারই সঙ্গের কিছু মানুষকে।

ডাইভিং লাইটের আলোয় সাগরের তলাটা দেখা যাচ্ছে এখন। রানার মনে হলো, ফেস মাস্কের ভেতর দিয়ে অসংখ্য ছোটবড় দানবের দিকে তাকিয়ে আছে। দানবগুলো আসলে ছোটবড় পাথর আর পাহাড়ের টিলাটক্কর। ওগুলোকে কেমন যেন পুরানো বন্ধুর মত মনে হচ্ছে। সামনে দিয়ে কিলবিল করতে করতে ছুটে গেল একটা ছোট স্কুইড, সড়াৎ করে গিয়ে ঢুকে পড়ল গুহার নিরাপদ আশ্রয়ে। পাহাড়ের ঢাল ধরে ধরে সাঁতরে নিচে নামতে লাগল রানা। আস্তে আস্তে গোড়ার দিকের

বালুঢাকা উপত্যকা চোখে পড়ছে।

যেমন রেখে গিয়েছিল, ঠিক তেমনি পাওয়া গেল স্করপিয়নকে। ডাইভিং লাইটের আলোয় ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে সাবমেরিনটাকে, অজানা কোন দানব যেন ঘাপটি মেরে পড়ে আছে ওখানে বালির ওপরে।

দ্রুত পা চালাল রানা। সাঁতরে অন্যান্য লোকদের পেরিয়ে হপকিন্সের পাশে চলে এল। তার বাহু ধরে টেনে নিজের দিকে ফেরাল। ডাইভিং লাইটের আলোয় দেখতে পেল, ফেসমাস্কের আড়ালে চকচক করছে হপকিন্সের দুই চোখ।

নিজের মেসেজ বোর্ডে তাড়াতাড়ি লিখল রানা:

'এখান থেকেই আপনার সঙ্গ ছাড়ছি। এখন থেকে সাবমেরিনটার পুরো দায়িত্ব আপনার।'

মাথা ঝাঁকাল হপকিন্স। পানিতে অদ্ভুতভাবে দুলে উঠল চুল। দ্রুত নিজের লোকদের কাজ ভাগ করে দিল ইশারা ইঙ্গিতে আর মেসেজ বোর্ডে লেখালেখি করে।

স্পেশাল ডিপার্টমেন্টের একজনকে সঙ্গে নিয়ে সাবমেরিনের ফরোয়ার্ড টর্পেডো কম্পার্টমেন্টে ঢুকবে চারজন সাবমেরিনার। বন্ধ করে রাখা ভাল্‌ভ্ আর ভেন্টগুলো খুলে দেবে। এই পাঁচজন ছাড়া বাকি সবাই এসকেপ চেম্বার দিয়ে সাবমেরিনের শুকনো অংশে ঢুকে যাবে, সেখান থেকে চলে আসবে কন্ট্রোল রুমে।

ভয় ভয় ভাবটা চলে গেছে এখন সাবমেরিনারদের মন থেকে, তাদের হাবভাব দেখেই অনুমান করা যাচ্ছে। অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোর সুযোগ পেয়েছে ওরা, কাজ দেখানোর সুযোগ পেয়েছে। বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে যে-যার কাজে লেগে গেছে ওরা। প্রথম পাঁচজন এক গ্রুপে কাজ করছে, অন্যেরা তিন দলে ভাগ হয়ে গেছে। একবারে এতগুলো লোকের জায়গা হবে না একটা কম্পার্টমেন্টে।

শেষ পাঁচজন লোক ঢুকে গেলে বাইরে থেকে হ্যাচ বন্ধ করে দিল রানা। এগজস্ট ভেন্ট দিয়ে এসকেপ কম্পার্টমেন্টের পানি বেরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল। তারপর সাবমেরিনের খোলসে ছুরির বাট দিয়ে টোকা দিল তিনবার। সঙ্গে সঙ্গেই ভেতর থেকেও টোকার আওয়াজ হলো। তার মানে ভেতরে কোন গোলমাল নেই। সরু টপ ডেক ধরে আস্তে আস্তে সাঁতরে বো-এর কাছে চলে এল সে। আবার টোকা দিল তিনবার। এবারে উত্তর এল একটু দেরিতে, একটু ধীরে। টর্পেডো কম্পার্টমেন্ট পানিতে ভরা, সে জন্যেই এরকম হলো।

মেসেজ বোর্ডে আবার লিখল রানা, বাংলায়। 'গুহায় ঢোকার পথ রয়েছে কাছেই কোথাও। ত্রিশ মিনিট সময় আছে আমাদের হাতে।'

বুঝল গিলটি মিঞা। আস্তে করে ঘাড় কাত করল।

ত্রিশ মিনিট খুব বেশি সময় নয়। এরই মাঝে অজানা গুহার মুখ আবিষ্কার করতে হবে। শুধু তাই নয়, এই সময়ের মাঝেই এস. এস. তুরাগকেও খুঁজে বের করতে হবে, ভাবল রানা, অবশ্য যদি আশেপাশে থেকে থাকে জাহাজটা। অনুমান করল সে, থাকলে, সামনের দিকেই কোথাও থাকবে ওটা। একটা জিনিস খেয়াল করছে রানা, যে জাহাজটা আগে ডুবছে, তার ঠিক সামনেই কোথাও পাওয়া যাচ্ছে

তার পরের ডোবা জাহাজকে। স্করপিয়নের পরে ডুবেছে তুরাগ, তারমানে ওটাকে সামনে পাওয়া যাওয়ার কথা।

গিলটি মিঞার কাঁধে হাতের চাপ দিল রানা। সে ফিরে চাইতেই হাতের ইশারায় ডানে দেখল। তারপর সাঁতরাতে শুরু করল নির্দেশিত দিকে। তার পিছু নিল গিলটি মিঞা।

দিনের বেলা সাগরের তলায় অজানা গুহার প্রবেশপথ খোঁজা এক কথা, কিন্তু রাতের অন্ধকারে এই কাজটা একেবারে অসম্ভবই বলা চলে। অ্যাডমিরাল ম্যাকডেভিডের চেহারাটা ভেসে রয়েছে মনের পর্দায়, ভেসে রয়েছে কোরিনের চেহারা, শুধু এই জন্যেই স্করপিয়নের ভেতরের নিরাপত্তা ছেড়ে অসম্ভবকে সম্ভব করবার চেষ্টা করতে যাচ্ছে রানা। গিলটি মিঞাকে আগেই জানিয়েছে সব, সে কিছুতেই পেছন ছাড়তে রাজি হয়নি। বুকের ভেতরের জোর ধুকপুকানিটা যেন শুনতে পাচ্ছে রানা।

জাহাজটাকে খুঁজে পেতে খুব বেশিক্ষণ লাগল না। ডাইভিং লাইটের আলোয় ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে বিশাল দুটো ধাতব শ্যাফট। ও দুটোর পেছনে খোলসটা পরিষ্কার ঝকঝকে, এক বিন্দু ময়লা নেই, একটা আগাছা জন্মায়নি। দেখে মনে হয়, যেন এইমাত্র ডুবল জাহাজটা।

সাঁতরে ডেকের ওপরে চলে এল দু'জনে। বিশাল জাহাজ। সাদা রঙ করা। জাহাজটার বো-এর কাছে চলে এল রানা। রেলিঙ পেরিয়ে ধীরে ধীরে নিচের দিকে নামতে লাগল। উজ্জ্বল আলোয় পরিষ্কার দেখতে পেল নামটা। ছয় ফুট সাইজ অক্ষরে ইংরেজী ও বাংলায় নাম লেখা রয়েছে: এস.এস. তুরাগ। একটা শিহরণ খেলে গেল রানার শিরদাঁড়া বেয়ে। জাহাজটাকে খুঁজে পেয়েছে সে। ভেতরে ঢুকে দেখতে পারলে ভাল হত, মালপত্র কি আছে না আছে। কিন্তু সময় নেই। আগের কাজ আগে সারতে হবে।

গিলটি মিঞাকে ইশারা করে জাহাজটার কাছ থেকে সরে এল রানা। ডানে ঘেঁষে সামনে এগোতে লাগল। আরেকটা চমক রয়েছে তার জন্যে, খানিকটা সামনেই। আরেকটা জাহাজ!

এই জাহাজটারও ডেকে চলে এল দু'জনে। নীলচে সাদা রঙ করা এই জাহাজটাও পরিষ্কার ঝকঝকে। তারমানে অল্পদিন আগে ডুবেছে, অবস্থান দেখে অনুমান করল রানা, তুরাগের পরে ডুবেছে এটা। একটা বিশাল ট্রলার। অসংখ্য ইলেকট্রনিক স্ক্যানার আর অ্যানটেনা ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ডেকের এখানে ওখানে। জাহাজটার চেহারা-নমুনা কেমন সন্দেহের উদ্রেক করল রানার মনে। সিদ্ধান্ত নিল, সময় থাকুক না থাকুক, এটার ভেতরে ঢুকবেই। ঘটনাটা কি, বোঝার চেষ্টা করবে।

শত্রুপক্ষের, মানে ভেরোনির লোকজনের, কোন চিহ্নই দেখা যাচ্ছে না। তবু সাবধানের মার নেই, তাই গিলটি মিঞাকে একটা দেয়ালের আড়ালে পাহারায় রেখে এগিয়ে গেল রানা। স্টার বোর্ড ব্রিজ উইঙের ভেতরে এসে ঢুকল। সুইচ টিপে ডাইভিং লাইটের আলো নিভিয়ে দিল। গাঢ় অন্ধকার গ্রাস করে নিল তাকে সঙ্গে

সঙ্গে।

ধীরে ধীরে সাঁতরে খোলা দরজা দিয়ে হুইলহাউসের ভেতরে এসে ঢুকল রানা। আলো জ্বালল আবার। ভৌতিক নির্জনতা, চারপাশের আসবাব আর যন্ত্রপাতিতে কেমন এক ধরনের অপার্থিবতার ছোঁয়া। স্থির হয়ে গেল রানা। নাড়াচাড়া টের পেয়ে চট করে ওপরের দিকে মুখ তুলল। সিলিং ঘেঁষে বিচ্ছিরি ভাবে পাক খেতে খেতে এগিয়ে যাচ্ছে একটা সামুদ্রিক সাপ। এঁকেবেঁকে সাঁতরে গিয়ে একটা খোলা ভেন্টের ভেতরে ঢুকে পড়ল সাপটা। স্তব্ধ হয়ে দেখল রানা দৃশ্যটা, শির শির করে উঠল শরীরের সমস্ত লোম। ভয়ঙ্কর বিষাক্ত এই সাপ, জানা আছে ওর। একটা সাপ যেতে না যেতেই সিলিঙের এক কোণ থেকে বেরিয়ে এল আরেকটা, মোচড় খেতে খেতে এটাও গিয়ে ঢুকল আগেরটা যে ভেন্টে ঢুকেছে, সেখানে।

কেন জাহাজের হুইলহাউসে এসে ঢুকেছে রানা, জানে না, কিন্তু মন বলছে, কিছু একটা পাওয়া যাবে এখানে। টেবিলে পাকানো অবস্থায় পড়ে আছে কিছু চার্ট, পড়ে আছে না বলে টেবিল ছুঁয়ে ভেসে আছে বললেই ঠিক হবে। মৃদু স্রোতে এপাশ-ওপাশে আস্তে আস্তে গড়াগড়ি খাচ্ছে চার্টগুলো। আলোয় চকচক করছে তামার হুইল। কম্পাসের কাঁটা এখনও রিডিং দিচ্ছে। টেলিগ্রাফের ওপরের তীরগুলো সব 'অল স্টপ' পজিশনে রয়েছে।

আরেকটু এগিয়ে এল রানা। সিগন্যাল লেভারের নিচের সিগন্যালগুলোর ভাষাটা ইংরেজী নয়, রাশিয়ান। আরও এগিয়ে একটা যন্ত্রের গায়ে আটকানো নেমপ্লেটে লেখা জাহাজের নাম দেখতে পেল: তেলেনিকভ।

চমকে উঠল রানা। তাহলে স্করপিয়নকে খুঁজে পেয়েছিল তেলেনিকভ! এবং তারপর আর ফিরে যেতে পারেনি। স্করপিয়নের মতই শিকার হয়েছে ভোরটেক্সের। জলদস্যুদের হাতে আক্রান্ত হয়ে জাহাজটা এখন মরে পড়ে আছে স্করপিয়নেরই পাশে!

ঠিক এই সময় কিছু একটা স্পর্শ করল রানার কাঁধ!

বরফের ছুরি বিঁধল যেন রানার কলজেয়। বুকের খাঁচায় বার দুই উল্টোপাল্টা বাড়ি মারল হৃৎপিণ্ডটা। পাঁই করে ঘুরতে গেল রানা, কিন্তু পানিতে অত তাড়াতাড়ি ঘোরা সম্ভব হলো না। ঠিক ঘোরা নয়, শরীরটা দুমড়ে মুচড়ে পিছন ফিরল রানা। শিউরে উঠল। মেরুদণ্ড বেয়ে শির শির করে নেমে গেল বরফ-শিহরণ! ডাইভিং লাইটের আলো পড়েছে লোকটার মুখে।

পানিতে ডুবে মরা লাশ এর আগেও দেখেছে রানা, কিন্তু ওগুলোর তুলনায় এটা রীতিমত একটা দুঃস্বপ্ন। ফুলে ঢোল হয়ে আছে মুখ। ফুটবল হয়ে গেছে গাল দুটো। হাঁ করা মুখ, বিকট ভঙ্গিতে বেরিয়ে রয়েছে দাঁতগুলো। একটা বড়সড় সুপুরি সাইজের চোখ এক কোটর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আছে। অন্য কোটরে চোখ নেই, একটা দাঁড়া বেরিয়ে আছে শুধু। চোখটা খেয়ে নিয়ে চোখের কোটরেই বাসা বেঁধেছে একটা ছোট সাইজের কাঁকড়া। পানির তলার স্রোতে সামনে পেছনে আলতো আলতো দুলছে অস্বাভাবিক লাশটা, দু'দিকে কাকতাড়ানো পুতুলের মত

ছড়িয়ে থাকা দুই হাত দুলছে কনুইয়ের কাছ থেকে। এরই একটা হাত এসে বাড়ি খেয়েছিল রানার কাঁধে।

মনের সমস্ত জোর একত্রিত করে হাত বাড়াল রানা, লাশটার বুকের কাছে ধাক্কা মারল। প্রথমে ঝটকা মেরে বেশ খানিকটা পেছনে সরে গেল লাশটা। ধাক্কার জোর কমে আসতেই গতি কমে গেল। দুই হাত নাড়াতে নাড়াতে, একটা প্রাণহীন চোখ একচক্ষু দানবের মত রানার দিকে মেলে দিয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। হারিয়ে গেল পেছনের অন্ধকারে।

জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছে রানা। ট্যাংক থেকে আসছে পরিষ্কার অক্সিজেন, কিন্তু তার মনে হচ্ছে পচাগলা লাশের তীব্র গন্ধ পাচ্ছে যেন সে। আসলে সবই তার আতঙ্কিত মস্তিষ্কের কল্পনা, একথা বুঝতেও অসুবিধে হচ্ছে না।

এখানে আর কিছু দেখার নেই। আরেকটা রাশান লাশের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে যাক, এটা কিছুতেই চায় না সে। সময়ও ফুরিয়ে আসছে দ্রুত। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ার জোর তাগিদ অনুভব করল সে।

একই জায়গায় একইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই আওয়াজটা কানে এল গিলটি মিঞার। কিসের আওয়াজ বুঝতে পারল না। কিন্তু ব্যাপারটা সন্দেহজনক মনে হলো তার কাছে। দেরি না করে রানাকে খবর দিতে হুইলহাউসের দিকে রওনা হলো সে।

বেরিয়ে আসছে রানা। হুইলহাউসের দরজায়ই সাক্ষাৎ হলো দু'জনের। গিলটি মিঞা ইঙ্গিতে শব্দটার কথা জানাল, রানাও শুনল ইলেকট্রিক মোটরের গুঞ্জন। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল দু'জনেই। কয়েক সেকেন্ড পরেই দেখা গেল বৈদ্যুতিক আলো।

প্রথমে, কোন অদ্ভুত প্রাগৈতিহাসিক জানোয়ারের মতই মনে হলো জিনিসটাকে। কিন্তু ভাল করে লক্ষ্য করতেই বুঝল রানা, কোন জানোয়ার নয়, একটা জলযান। ডলফিনের দেহের আকৃতিতে বানানো হয়েছে। একটা মিনি-সাবমেরিন।

খোলা ককপিটে বসে দু'জন লোক। সামনের লোকটার হাতে স্টিয়ারিং। তার পেছনে বসে নেভিগেট করছে দ্বিতীয় লোকটা। ডলফিনের লেজের তলায় আলোড়ন সৃষ্টি করে তীব্র গতিতে ঘুরছে ছোট্ট প্রপেলার। একশো ষাট ফুট পানির তলায় পাঁচ নট গতিতে ছুটছে সাবমেরিন। তেলেনিকভের ব্রিজের দিকেই এগিয়ে আসছে সাবমেরিনটা।

হুইলহাউসের দরজার কাছ থেকে গিলটি মিঞাকে নিয়ে সরে এল রানা। পাশের একটা জানালার কাছে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দেয়াল সেঁটে দাঁড়াল দু'জনে। শ্বাস নিতেই হবে, কোন উপায় নেই। কাজেই দুই সারি এয়ার বাবল ওপরের দিকে উঠে যাওয়া ঠেকানোরও কোন উপায় নেই। দুরুদুরু বুকে দেয়াল সেঁটে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল ওরা। হাতে বেরিয়ে এসেছে ছুরি।

সামনের মাস্তুল ঘুরে হুইলহাউসের দিকে এগোল সাবমেরিন। লোক দু'জনের বুকের পাশে আটকানো ব্রীদিং ইউনিটে শ্বাস নেয়ার শব্দও শুনতে পাচ্ছে, মনে হলো রানার। ছুরির বাটে হাতের চাপ বাড়ল। টান টান হয়ে উঠেছে শরীরের সমস্ত

স্নায়ু। যে-কোন মুহূর্তে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে তৈরি, ওদের হাতের প্রোজেক্টাইল গানের বিরুদ্ধে শুধু ছুরি নিয়ে লড়তে হলে ক্ষিপ্রতা দরকার। ওত পেতে তৈরি হয়ে রইল রানা।

অপেক্ষার মুহূর্তগুলো শেষ হলো। শেষ মুহূর্তে দিক পরিবর্তন করল সাবমেরিন। হঠাৎ ওপরের দিকে উঠে গেল যান্ত্রিক ডলফিনের নাক। ব্রিজের ওপর দিয়ে সোজা ছুটে চলে গেল সামনের দিকে। কোন রকম উত্তেজনা নেই আরোহীদের মাঝে। দু'জন লোকের এয়ার বাবলের ভেতর দিয়ে চলে গেল, অথচ খেয়াল করল না মোটেই। অবাকই হলো রানা।

প্রপেলারের শব্দ ক্ষীণ হতে হতে মিলিয়ে যেতেই আলো জ্বালল গিলটি মিঞা। হঠাৎই বুঝতে পারল রানা, কেন এয়ার বাবলের দিকে নজর দেয়নি লোক দু'জন।

তেলেনিকভ ডুবেছে, খুব বেশি দিন হয়নি। অসংখ্য এয়ার পকেট রয়ে গেছে এখনও জাহাজটার এখানে ওখানে। খোলস এবং বিশাল কাঠামোর এখানে ওখানে তেলের বিন্দুর সঙ্গে মিশে এক নাগাড়ে উঠছে অসংখ্য বুদ্বুদ। কাজেই রানা আর গিলটি মিঞার শ্বাস ফেলার বুদ্বুদকে আলাদা করে দেখেনি লোক দু'জন। আসলে, একটা জাহাজ ডোবার পর, ওটার ভেতরে জমে থাকা সমস্ত বাতাস বেরিয়ে শেষ হয়ে যেতে কোন কোন সময় এমনকি কয়েক বছরও লেগে যায়।

রিস্ট ওয়াচ দেখল রানা। গিলটি মিঞার দিকে তাকিয়ে আঙুলের ইশারা করল, মিনি সাবমেরিনটা যেদিকে গেছে সেদিকটা দেখাল। মাথা ঝাঁকাল গিলটি মিঞা, বুঝতে পেরেছে, অনুসরণ করতে হবে।

ব্রিজের ওপর দিয়ে সাঁতরে জাহাজের ওপর থেকে সরে এল দু'জনে। নিচে নেমে এল আবার। বালিতে ঢাকা সাগরতল পেরিয়ে পাথুরে ভূমিতে এসে পড়ল। তারপরেই শুরু হয়েছে আশ্চর্য সেই জলজ উদ্ভিদের বাগান। পাথর আর লতা-শ্যাওলার আড়ালে আড়ালে দুটো মাছের মত এগিয়ে চলল দু'জনে।

পেছনে একবার ফিরে চাইল রানা। দেখা যাচ্ছে না এখন তেলেনিকভকে। ভাবছে রানা, জাহাজটা আর কোনদিনই বাইরের আলোবাতাস দেখতে পাবে না। আমেরিকানরা জানবে কোথায় আছে তেলেনিকভ, কিন্তু রাশানরা জানবে না। কি অদ্ভুত আন্তর্জাতিক টানাপোড়েন, এক দেশের প্রতি আরেক দেশের কি বিদ্বেষ, ঘৃণা…।

ডেপথ গজের দিকে তাকাল রানা। ঢাল ধরে চলতে গিয়ে ওপরে উঠছে ওরা। কিম্ভূত পাথরগুলোর পাশ কাটিয়ে, ফাটলের ভেতর দিয়ে গিলটি মিঞাকে নিয়ে সাবধানে এগিয়ে চলল সে। পানি ঠাণ্ডা, প্রশান্ত মহাসাগরের এই অংশে যতটা হওয়া উচিত তার চেয়ে একটু যেন বেশিই ঠাণ্ডা এখানে পানি।

সামনে, ওপরের দিকে কোনাকুনি উঠে গেছে ডাইভিং লাইটের আলোর রশ্মি। দেখতে দেখতে এগোচ্ছে রানা। কোনরকম নড়াচড়ার চিহ্ন চোখে পড়ছে না। ঢাল এখানে মসৃণ, এই কাজ প্রকৃতির নয়, মানুষের তৈরি যন্ত্র ছাড়া এমন সমানভাবে কাটা সম্ভব নয়। আশেপাশেই কোথাও প্রবেশপথ রয়েছে, ধারণা হলো রানার। এখানেই কোন পথ দিয়ে ঢুকে গেছে মিনি সাবমেরিনটা।

ঘড়ি দেখল রানা। নির্ধারিত সময় প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এখন যে-কোন মুহূর্তে ফুরিয়ে যেতে পারে বাতাস। তারপর স্করপিয়নের নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে যাবার আর কোন উপায়ই থাকবে না। এখন চেষ্টা করলেও ফিরে যেতে পারবে না আর। বাতাসে কুলোবে না। বাতাস ফুরানোর মুহূর্ত এসে যাবার আগেই প্রবেশপথটা খুঁজে বের করতে হবে, যে করেই হোক, নইলে নিশ্চিত মৃত্যু। ওপরে ভেসে উঠতে পারবে হয়তো, কিন্তু তাহলেই বা কি লাভ? কতক্ষণ সাঁতার কেটে ভেসে থাকতে পারবে ওরা? ঠিক ভোর পাঁচটায় হাইপারিয়ন মিশাইল ছুঁড়বে ফ্রিগেট সাইক্লপ্স্। ধ্বংস হয়ে যাবে ডুবোপর্বত। বিশাল সব ঢেউ উঠবে শকওয়েভের ধাক্কায়। মারা পড়বে ওরা দু'জন।

ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চলেছে রানা, হঠাৎই থেমে গেল সে। পানির তাপমাত্রার হঠাৎ পরিবর্তন টের পেল ঠিকই। বেড়ে গেছে তাপ, কমপক্ষে পাঁচ ডিগ্রি। এই সময়েই আরেকটা ব্যাপার অনুভব করল সে, স্রোত। বেশ জোরাল একটা স্রোত ঢাল বরাবর ছুটে গিয়ে আঘাত করছে নিচের বালুঢাকা তলায়, ধোঁয়ার মত বালি উড়ছে পানিতে, লতা-শ্যাওলাগুলো দুলছে, ঘুরছে, ঝটকা খাচ্ছে। শ্যাওলার দুলুনি দেখেই বোঝা যাচ্ছে, কোন্ পথে এগোচ্ছে স্রোত। একটু পাশ কাটল রানা, তার সঙ্গে রইল গিলটি মিঞা। হঠাৎই একেবারে স্রোতের মাঝখানে হুমড়ি খেয়ে পড়ল দু'জন। প্রবল স্রোত ধাক্কা মেরে কাত করে ফেলল ওদেরকে। টেনে নিয়ে চলল।

গাড়ির পেছনের বাম্পারে দড়ি দিয়ে বেঁধে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হয়নি কখনও রানাকে। তাহলে কেমন লাগবে, সে ধারণা নেই ওর। কল্পনা করল, এখন যেভাবে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তাকে স্রোত, অনেকটা এমনিই লাগত বোধহয়। মনে হলো, উঁচুনিচু পাথুরে এলাকায় ঘন ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাকে। জলজ হলে হবে কি, লতা-শ্যাওলাগুলোর ঘষা মোটেই আরামপ্রদ নয়। গালে, কপালে চামড়া ছড়ে গেল রানার, লালচে দাগ পড়ল।

রানার মত একই অবস্থা হয়েছে গিলটি মিঞারও। ফেসমাস্কের তলায় বিড় বিড় করছে সে, 'এ কোথায় এলুমরে, বাবা। ঘাসগুলো দেকি দারোগার বেতের চেয়েও পাজি...'

উঁচু হয়ে থাকা বিশাল এক পাথরের ওপর এসে আছড়ে পড়ল রানার দেহ। পাথরটার গায়ে নিজেকে আটকে রাখার চেষ্টা করল সে। হাত বাড়িয়ে চেপে ধরতে গেল পাথরের একটা ধার, কিন্তু পিচ্ছিল শ্যাওলায় পিছলে গেল হাত। ছোট ছোট কয়েকটা শামুক-গুগলির ধারাল খোলায় লেগে কেটে গেল হাতের চামড়া। বড় জোর একটা সেকেন্ড আটকে থাকতে পারল রানা, তারপরই ধাক্কা মেরে তাকে নিয়ে চলল স্রোত। অনুভব করল, তার এক পা শক্ত করে চেপে ধরা হয়েছে। গিলটি মিঞা, রানার দুই পায়ের ফাঁকে ঢুকে গিয়ে কায়দা করে হাত দিয়ে পেঁচিয়ে ধরেছে পা। পাথরের গায়ে পায়ের ঠেকো রেখে শরীর বাঁকিয়ে টান মেরে ধরে রাখার চেষ্টা করছে রানাকে। প্রাণপণ চেষ্টা করছে গিলটি মিঞা, কিন্তু তার ছোটখাট শরীরে আর কতটুকুই বা জোর, বেশি সুবিধে করতে পারছে না। যে

কোন মুহূর্তে তাকে সুদ্ধ ভাসিয়ে নেবে স্রোত।

ফিরে চাইল রানা। আলো পড়ল গিলটি মিঞার চোখে। এক পলকের জন্যে সরল নিষ্পাপ চোখ দুটো দেখতে পেল রানা, কোন ভাবান্তর নেই সে চোখে। মনে মনে গিলটি মিঞার উপস্থিত বুদ্ধিকে ধন্যবাদ দিল সে। আবার পাথর খামচে ধরে স্রোতের বিরোধিতা করার জন্যে হাত বাড়াল রানা।

দু'জন একজন হয়ে গেছে এখন। দু'জনের মিলিত শক্তি, স্রোতের ধাক্কার বিরুদ্ধে কিছুটা প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে পারল। শেষ পর্যন্ত আটকে থাকতে পারল না ঠিকই, কিন্তু আগের সেই খড়কুটোর মত ব্যবহার আর করতে পারছে না ওদের সঙ্গে স্রোত।

ভোঁতা ঝনঝনে একটা আওয়াজ উঠছে, টের পেল রানা। সঙ্গে সঙ্গেই বুঝে গেল, কিসের আওয়াজ। পাথরে বাড়ি খাচ্ছে পিঠের অক্সিজেন ট্যাংক। পেছনে হাত বাড়াতে গিয়েই থমকে থেমে গেল সে। বিপদ-সঙ্কেত জানাচ্ছে তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। ওপরের দিকে চাইল সে। আলো ফেলল। সামনের দিকে থাবা মারল সঙ্গে সঙ্গে। পাথরের একটা খোঁড়লের ভেতরে ঢুকে গেছে ওরা। ওপাশের দেয়ালে বাড়ি খাবার আগের মুহূর্তে কোনমতে ঠেকাতে পারল আঘাতটা, কিন্তু পুরোপুরি সফল হলো না।

পাথুরে দেয়ালে সাংঘাতিক জোরে বাড়ি খেলো রানার দেহ। সিকি ইঞ্চি পুরু রাবারের পোশাকই বাঁচিয়ে দিল তাকে এযাত্রা, কিন্তু গোল বাধাল দেয়াল থেকে বেরিয়ে থাকা ধারাল চোখা কিছু পাথরের ছোট ছোট ফলা। রাবার চিরে ভেতরের নাইলনের কোটিং কেটে দিল পাথরের ছুরি। বাম বাহুতে তীক্ষ্ণ ব্যথা অনুভব করল রানা। হাতের চারপাশে পানিতে রক্তের হালকা ছোট্ট মেঘ। পাথরের ফলার ডগায় বিঁধে মুখ থেকে ছুটে গেছে ফেসমাস্ক। বালি ঢুকে যাচ্ছে নাকের ভেতরে, ঢুকে গেছে চোখে—কচকচে যন্ত্রণা চোখের নরম মেমব্রেনে। জোরে শ্বাস ফেলে নাক থেকে পানিসুদ্ধ বালি বের করার চেষ্টা করল রানা, কিন্তু জ্বালা আরও বাড়ল বৈ কমল না। বালি তো বেরোলই না, উল্টে ফুসফুসের বাতাস বের করে দিয়ে দম বন্ধ হয়ে মরার জোগাড় হলো। চোখের যন্ত্রণাও বাড়ছে। বালির সঙ্গে যোগ দিয়েছে নোনা পানি, তীব্র জ্বালা পাক খেতে খেতে যেন উঠে যাচ্ছে মগজে।

সহ্যের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছে রানা। ভাবছে, জ্ঞান হারাবে নাকি? হাত-পা নাড়ার চেষ্টা করল, কিন্তু বুঝতে পারল আসছে, আবার সেই প্যারালিসিস। পরমুহূর্তে ব্ল্যাঙ্ক হয়ে গেল সব।

এই সময়ই বাড়িটা খেলো। বেরিয়ে থাকা ছোট একটা পাথরে খুব জোরে বাড়ি খেলো ওর মাথা। রঙধনুর সাত রঙ ছিটকে পড়ল যেন মগজে, ছড়িয়ে পড়ল কোষে কোষে। স্থির হয়ে গেল রানার দেহটা। লাইটটা খসে পড়ে গেল হাত থেকে।

নিজের লাইট জ্বালল গিলটি মিঞা। রানার স্থির হয়ে যাওয়া দেহের ওপর আলো ফেলল। দেখল, বেহুঁশ হয়ে গেলেও রানার দাঁতের ফাঁকে কামড়ে ধরা আছে মাউথপিসটা। একটু নিশ্চিন্ত হলো সে। আরও জোরে পেঁচিয়ে ধরে রইল

রানার পা। স্রোতে ভাসিয়ে দিল গা।

দু'জনের নিচ দিয়ে এক টুকরো বালি ঢাকা জমি সরে যাচ্ছে। পাগলের মত পা বাড়াল গিলটি মিঞা। বালিতে পায়ের ডগা বিঁধিয়ে ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করল দুটো দেহকে। জোরাজুরিতে পায়ের ফিন খুলে ভেসে গেল। পাথরের কণায় ঘষা খেয়ে ছড়ে গেল পা আর গোড়ালির চামড়া। কিন্তু হাল ছাড়ল না সে। মাউথপিসটাকে আরও জোরে কামড়ে ধরে হড়হড়ে বালিতে পা ডুবিয়ে দিল, আরও জোরে চাপ দিল নিচের দিকে। একলা হলে কথা ছিল না, কিন্তু তার চেয়ে ভারী একটা শরীরকে স্রোতের বিরুদ্ধে আঁকড়ে ধরে রেখে টিকে থাকতে পারল না শেষ পর্যন্ত।

ভাসিয়ে নিতে নিতে হঠাৎই যেন খেলাটার ওপর বিরক্তি ধরে গেল স্রোতের। লম্বা হয়ে ভেসে থাকা দুটো দেহকে লম্বালম্বি এক পাক ঘুরিয়ে বের করে দিল কেন্দ্র থেকে। পিছলে স্রোতের বাইরে চলে এল দেহ দুটো, নিজেদের চেষ্টা ছাড়াই। সুযোগ হাতছাড়া করল না গিলটি মিঞা। থাবা মেরে একগোছা ঘাস আঁকড়ে ধরল। কাছেই সরু একটা ফাটল দেখতে পেল। কোন গুহামুখ হবে। রানার দেহটাকে টেনে টেনে গুহামুখের কাছে নিয়ে এল সে। ঘুরে নিজের পেছন দিকটা গুহামুখের দিকে ফেরাল। তারপর রানার পা আঁকড়ে ধরে চিত সাঁতার শুরু করল, গুহার ভেতরের শান্ত পানিতে। ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল দুটো দেহ।

পার্ল হারবার। অপারেশন বাঙ্কারের ভেতরটা চুপচাপ। টাইপরাইটারের খটাখট নেই, স্তব্ধ হয়ে আছে কম্পিউটারগুলো, টেপের রীলগুলো চুপ। রেডিও সেন্টারে দল বেঁধে বসে আছে অর্ধেক স্টাফ। নীরবে সিগারেট টেনে চলেছে পুরুষেরা, মেয়েরা যতটা সম্ভব নিঃশব্দে কফি বিতরণ করছে। তাদের চোখমুখ ফ্যাকাসে। টান টান ভারী আবহাওয়া, ছুরি দিয়ে কাটা যাবে যেন। শ্বাস ফেলতেও কষ্ট হচ্ছে যেন ওদের। রেডিও অপারেটরের দুই পাশে বসে আছেন অ্যাডমিরাল ম্যাকডেভিড আর জন টার্নার। মাঝে মাঝেই চোখ তুলে তাকাচ্ছেন একে অন্যের দিকে, লাল চোখ।

বুক পকেট থেকে ছোট একটা প্লাস্টিকের শিশি বের করল টার্নার। টেবিলে রেখে বেলুন দিয়ে রুটি বেলার মত একবার সামনে একবার পিছনে করতে লাগল।

ভুরু কুঁচকে এক মুহূর্ত শিশিটা দেখলেন অ্যাডমিরাল, চোখ তুলে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি ওটা?'

শিশিটা তুলে ধরল টার্নার। 'রানা দিয়েছে, অ্যানালাইয করে দেখার জন্যে। একটা হাইপোডার্মিক সিরিঞ্জে ছিল ভেতরের জিনিসটুকু।'

'রানা দিয়েছে?' আবার ভুরু কুঁচকে গেল অ্যাডমিরালের। 'কি আছে ওতে?'

'ডিজি-টেন জাতীয় কিছু,' সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল টার্নার। 'ডিজি-টেন ভয়ঙ্কর বিষ। এই বিষে মারা গেলে পোস্ট মর্টেম করে মৃত্যুর কারণ বের করা খুবই কঠিন। মনে হবে, হার্টফেল করে মারা গেছে ভিকটিম।'

'এটা নিয়ে কি করছিল সে?'

কাঁধ ঝাঁকাল টার্নার। 'জানি না। জিজ্ঞেস করেছিলাম, উত্তর এড়িয়ে গেছে। পরে নাকি জানাবে।'

শূন্য দৃষ্টি ফুটল অ্যাডমিরালের চোখে। আপনমনেই বললেন, 'হেঁয়ালি··· ছেলেটার সব কিছুতেই কেমন···'

'টেলিফোন, অ্যাডমিরাল,' বাধা দিয়ে বলল একজন অফিসার। রিসিভার বাড়িয়ে রেখেছে অ্যাডমিরালের দিকে।

'কে?' জানতে চাইলেন ম্যাকডেভিড।

অফিসারের গলায় দ্বিধা। 'ডেনিস, ডেনিস কুক। পোপো রেডিও স্টেশন থেকে বলছে। একজন ঘোষক।'

মুখ বাঁকালেন অ্যাডমিরাল। 'আরে! কি বলছ তুমি? চিনি না জানি না, এক প্রোগ্রাম অ্যানাউন্সারের সাথে এখন কথা বলতে যাব কেন আমি? আমাদের প্রাইভেট লাইনই বা সে পেল কি করে?'

অ্যাডমিরালের দৃষ্টির সামনে অস্বস্তি বোধ করছে অফিসার। নড়েচড়ে উঠে চোখ নামিয়ে নিল সে। 'বলছে, স্যার, জরুরী। ওর কথাবার্তা ঠিক বুঝছি না। বলেছে: "ব্ল্যাকবার্ড ঘরে ফিরেছে।" ধাঁধাটার জবাব দিতে পারলে নাকি একটা পুরস্কার পাবেন।'

'কি সব আবোলতাবোল বকছ!' ধমকে উঠলেন অ্যাডমিরাল। 'পাগলটাকে বলো···' মাঝপথেই ঠোঁট অনড় হয়ে গেল তাঁর। বড় বড় হয়ে গেল চোখ। 'মাই গড! পিটার! তারই কোড এটা!'

ছোঁ মেরে অফিসারের হাত থেকে রিসিভারটা ছিনিয়ে নিয়ে কানে ঠেকালেন অ্যাডমিরাল। অন্য প্রান্তের লোকটার সঙ্গে এক নাগাড়ে দ্রুত কথা বলে গেলেন। রিসিভারটা আবার স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা অফিসারের হাতে গুঁজে দিয়ে টার্নারের দিকে ফিরলেন।

'হনলুলু রেডিও স্টেশনের ফ্রীকোয়েন্সিতে মেসেজ পাঠাচ্ছে পিটার।'

স্পষ্ট বিস্ময় টার্নারের চেহারায়। 'কিচ্ছু বুঝলাম না, স্যার!'

'চমৎকার, সত্যি চমৎকার বুদ্ধি!' উত্তেজিত শোনাল অ্যাডমিরালের গলা। 'একটা কমার্শিয়াল ব্রডকাস্ট স্টেশনের ফ্রিকোয়েন্সী মনিটরিং করার কথা কল্পনাও করবে না ভেরোনি। বিশেষ করে যখন একটা রক অ্যান্ড রোল প্রোগ্রাম চলছে। এই সময়ে ওই প্রোগ্রাম কেউ শোনে কিনা যথেষ্ট সন্দেহ আছে আমার।' রেডিও অপারেটরের দিকে তাকালেন। 'ফ্রিকোয়েন্সী বারোশো পঞ্চাশে সেট করো।'

প্রচণ্ড শব্দ করে উঠল স্পীকার। টান টান উত্তেজনায় যেন ফেটে পড়ল রক অ্যান্ড রোলের তীব্র মিউজিক। নিজেদের অজান্তেই কানের ছেঁদায় আঙুল ঢুকে গেল অনেকের। বাজনার শব্দ হারিয়ে গেল আচমকা। কান থেকে অঙুল সরাল, যারা আঙুল দিয়েছিল। খড় খড় শব্দ উঠল স্পীকারে, তারপরেই মেশিনগানের মত একটানা কথার তুবড়ি ছোটাল স্পীকার।

'সকালের বার্ডওয়াচারদের বলছি। আমি ডেনিস কুক। স্পেশাল কিছু শোনাতে যাচ্ছি আপনাদের। ট্রানজিস্টর সেট ছেড়ে নড়বেন না। বিগ ড্যাডি আর

তার দলের লেটেস্ট কমেডি বাজিয়ে শোনাচ্ছি, মন দিয়ে শুনুন।…এই যে বিগ ড্যাডি…।'

বাঙ্কারে, ট্রান্সমিট বাটন টিপল রেডিও অপারেটর। স্টেশনের প্রোগ্রাম স্তব্ধ হয়ে গেল। এপাশ থেকে বলল রেডিও অপারেটর, 'বিগ ড্যাডি কলিং আওয়ার গ্যাঙ। কাম ইন, প্লীজ। ওভার।'

'আওয়ার গ্যাঙ বলছি, বিগ ড্যাডি। শুনতে পাচ্ছেন? ওভার।'

লাফ দিয়ে খাড়া হলো টার্নার। 'হপকিনস, পিটার হপকিনস। ঢুকতে পেরেছে ও! স্করপিয়নের ভেতরে বসে কথা বলছে!'

'শুনতে পাচ্ছি, আওয়ার গ্যাঙ। ওভার।' বলল রেডিও অপারেটর।

'হিয়ার ইজ দা ফাইনাল স্কোর। ভিজিটরস: ওয়ান রান, ওয়ান হিট, থ্রী এরোরস। হোম টীম: নো রানস, থ্রী হীটস, ফোর এরোরস।'

শূন্য দৃষ্টিতে স্পীকারের দিকে তাকালেন অ্যাডমিরাল। 'কোডে কথা বলছে পিটার। সাবমেরিনের কন্ট্রোল নিয়েছে সে, কিন্তু মূল্য দিতে হয়েছে: একজন মৃত, তিনজন আহত।'

'উই অ্যাকনলেজ ইয়োর স্কোর, আওয়ার গ্যাঙ,' গোঙাচ্ছে যেন রেডিও অপারেটর। 'ভিজিটিং টীমের জন্যে আমাদের শুভেচ্ছা রইল। খেলার আসর ত্যাগ করবেন কখন?'

উত্তর এল সঙ্গে সঙ্গেই। 'বাথটাবের পানি বেরোতে শুরু করেছে। খালি হতে আরও এক ঘণ্টা লাগবে। ভোর সাড়ে চারটে নাগাদ স্টেডিয়াম ছাড়ব আমরা, বাসে করেই রওনা হব।'

টেবিলে চাপড় দিতে লাগলেন অ্যাডমিরাল। চওড়া হাসি ফুটেছে ঠোঁটে। চোখেও ছড়িয়েছে সে হাসি। 'টারবাইনে পাওয়ার পাঠাতে শুরু করেছে রি-অ্যাকটর। আর এক ঘণ্টার মধ্যেই ফরওয়ার্ড টর্পেডো রুম থেকে পানি বের করে ফেলবে। থ্যাংক গড, শিডিউল টাইমের আগেই কাজ সেরে ফেলবে ওরা।'

ঝুঁকে, হাত বাড়িয়ে অপারেটরের কাছ থেকে মাইক্রোফোন নিয়ে নিলেন অ্যাডমিরাল।

'আওয়ার গ্যাঙ, বিগ ড্যাডি বলছি। খোকা কোথায়?'

'খোকা তার বন্ধুকে নিয়ে পাহাড়ের দিকে সোনার খনি খুঁজতে গেছে। এখন পর্যন্ত তার আর কোন খবর নেই। আশঙ্কা করছি, মরুভূমিতে হারিয়ে গেছে ওরা, পানি শেষ করে ফেলেছে।'

নীরবে, আস্তে করে মাইক্রোফোন নামিয়ে রাখলেন অ্যাডমিরাল। থমথমে চেহারা। এই কোড অনুবাদ করার কোন দরকার নেই, পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে এমনিতেই।

'পাঁচটায় খেলা সংক্রান্ত রিপোর্ট করব,' বলল হপকিনস। 'আওয়ার গ্যাঙ, আউট।'

এক মুহূর্ত দেরি না করে স্পীকারে ভেসে এল আবার ডেনিস কুকের গলা: 'শুনলেন তো? এবার আবার ডিসকো শুরু হচ্ছে…'

আস্তে করে স্পীকারের সুইচ অফ করে দিল অপারেটর। পাঁচটার আগে আর স্পীকার অন করবার দরকার নেই।

আস্তে করে এগিয়ে গিয়ে একটা চেয়ারে বসে পড়লেন অ্যাডমিরাল। ও-প্রান্তের দেয়ালের দিকে তাকিয়ে আছেন বোবা দৃষ্টিতে।

'বড় বেশি মূল্য দিতে হলো,' এক সময় মন্তব্য করলেন ম্যাকডেভিড।

'পিটারের সঙ্গে থাকা উচিত ছিল রানার,' তিক্ত শোনাল টার্নারের গলা। 'আপনার মেয়ের খোঁজে পা বাড়ানোই উচিত হয়নি তার...' থামল বড় দেরিতে। বুঝতে পারল, এভাবে সরাসরি বলাটা মোটেই উচিত হয়নি তার।

চোখ তুলে টার্নারের দিকে তাকালেন অ্যাডমিরাল। 'কোরিনকে খোঁজার পারমিশন রানাকে দিইনি আমি। আমার আদেশ অমান্য করেছে সে।'

'জানি, স্যার,' শ্রাগ করল টার্নার। 'ওকে বাধা দেবার চেষ্টা আমিও করেছি, কিন্তু নিরাশ হওয়াটা রানার ধাতে নেই।'

'নেই নয়, বলো ছিল না,' নিরাশ কণ্ঠে বললেন অ্যাডমিরাল। বিড় বিড় করে একই কথা উচ্চারণ করলেন আবার, 'ধাতে ছিল না।'

ধীরে ধীরে চোখ মেলল রানা। ছোট্ট একটা মুখ ঝুঁকে আছে তার ওপর, গিজগিজে দাড়ি সে মুখে। নিষ্পাপ দুই চোখে উদ্বেগ।

'ওফ্, বেঁচে গেচেন, স্যার!' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল গিলটি মিঞা। 'আমি তো ভেবেছিলুম মরেই যাচ্চেন বুজি। আবার ভাবি, আমাকে এখেনে একা রেকে এমোন একটা অন্যায় কাজ...নাহ্ আপনাকে দিয়ে হবে না। কিন্তুক আরাকটু...'

'কোথায় আমরা?' বিড় বিড় করে বলল রানা। প্রচণ্ড ব্যথা কেটে যাওয়া বাহু আর বাড়ি খাওয়া মাথায়। একবার নড়ার চেষ্টা করেই থেমে গেল। তীব্র ব্যথা তীব্রতর হয়ে উঠছে নড়লে।

'এরকোম শুয়ে শুয়ে ন্যাজ নাড়লে তো চলবে না, স্যার, উটুন...উটে পড়ুন। সময় কম। এখেনে বেশিক্ষণ টেকা যাবেনিকো।'

'আবার বেহুঁশ হয়ে গেলেই ভাল হত,' মনে মনে বলল রানা। ভাল হাতটা সামনের দিকে বাড়াল। বাহু চেপে ধরে টান দিল তাকে গিলটি মিঞা। উঠে বসল রানা। চোখ পিটপিট করে ভেতরে জমে থাকা বালি আর লবণ পানি বের করতে চাইছে। 'আমরা আছি কোথায়?'

'একটা গর্তো, মানে একটা গুহার মতোন, পানির নিচে,' জবাব দিল গিলটি মিঞা। 'আপনি জ্ঞান হারাতেই চারদিকে চেয়ে পেয়ে গেলুম। সোঁতটাও ছেড়ে দিলে...ওপরে উটে দেকি বাতাস, পানিতে উপুড় করা গামলার মতোন।'

'হুঁ!'

গুহাটার চারদিকে তাকাল রানা। গিলটি মিঞার ডাইভিং লাইটের আলোয় আবছাভাবে আলোকিত। চওড়ায় বিশ ফুট, অনুমান করল রানা, লম্বায় ফুট তিরিশেক হবে। পানি থেকে ছাদের দূরত্ব সব জায়গায় সমান নয়, তবে পাঁচ থেকে দশ ফুটের ভেতরে। কোথাও ঠেলে বেরিয়ে আছে পাথুরে দেয়াল, কোথাও তাকের

মত। অনেকটা গ্যালারির মত দেখাচ্ছে গুহাটাকে, তাকগুলোর জন্যে। এমনি একটা তাকেই রয়েছে সে আর গিলটি মিঞা। শুধু তারা দু'জনেই নয়, তাকগুলোতে জীবন্ত প্রাণী আরও আছে। ছোট্ট সাইজের হাজারো কাঁকড়া, গিজ গিজ করছে পিঁপড়ের মত।

'ভাবছি, কতটা গভীরে রয়েছি আমরা!'

নিজের হাতের ডেপথ গজের দিকে তাকাল গিলটি মিঞা। 'ভেতরে ঢুকবার আগে একবার দেকেছিলুম, স্যার। বেশি না, মাত্তর পঞ্চাশ ফুট।'

'ইস্, একটা সিগারেট যদি পেতাম!' ভাবতে ভাবতে, ক্ষতবিক্ষত শরীরটাকে টেনে কোনমতে তাকের পেছনের দেয়ালের কাছে নিয়ে এল রানা। হেলান দিয়ে বসল। ছেঁড়া রবার স্যুটে লেগে থাকা জমাট কালচে রক্তের দিকে তাকাল, ওরই রক্ত।

'একাবারে সব্বোনাশ হয়ে গেছে, স্যার,' সরল চোখে রানার কাটা বাহুর দিকে তাকিয়ে আছে গিলটি মিঞা। 'কেটে, ছিঁড়ে...'

'যত দেখাচ্ছে, ততটা খারাপ নয়,' মিথ্যে কথা বলল রানা। গিলটি মিঞার পায়ের দিকে তাকাল। কুঁচকে উঠল ভুরু। 'তোমার ফিন কোথায়? পায়ের এ অবস্থা কেন?'

'ওই শালার...' গাল দিতে গিয়েই জিভ কাটল গিলটি মিঞা। আবার বলল, 'সোঁত, স্যার। চেষ্টা করেছিলুম, রাখতে পারলাম না। লিয়ে লিলো। পায়ে কিচু হয়নি। কাঁকর আর বালিতে একটু ঘঁষা খেয়েচে, তারওপর নোনতা পানি লেগেচে তো—লাল হয়ে গেচে...'

'কিন্তু রক্ত তো দেখতে পাচ্ছি?'

'ও কিচু নয়, স্যার। বালির ঘঁষায় রক্ত বেরোলে কিচু হয় না...'

গিলটি মিঞার ডাক্তারী তত্ত্ব শুনে হেসে ফেলল রানা। 'তাই বুঝি?'

রানাকে হাসতে দেখেই দাঁত বের হয়ে গেল গিলটি মিঞার। 'তাই তো, স্যার। সেই একবার, ডি. আই. জি সাহেবের ঘড়িটা পচোন্দো হয়েছিল, লিয়েছিলুম...ধরে ফেললে পুলিস।...তারপর, কী বলব, স্যার, কাঁকর বালির ওপর দিয়ে টিনে হিঁচড়ে লিয়ে গেল আদ মাইল। হাত-পায়ের চামড়া কিছু ছিল নাকি? রক্ত বেরিয়েছিল মেলা, কিন্তুক কই, কিচ্ছু তো হয় নি...'

সহজ সরল যুক্তি, এরপরে আর কিছু বলার থাকে না।

'কিন্তু, বাইরে বেরোই কি করে!' আপনমনেই বলল রানা। 'যে রকম রক্ত বেরোচ্ছে, বাইরে বেরোলেই আশেপাশের সব হাঙর এসে হাজির হয়ে যাবে।' ঘড়ির দিকে তাকাল একবার, তারপর পানির দিকে চেয়ে বলল, 'সাইক্লপ্সের মিসাইল ফাটতে এখনও ঘণ্টা দু'য়েক দেরি আছে। বসে থেকে কি লাভ, চলো, দেখি ঘুরে ফিরে।'

কিছু বলল না গিলটি মিঞা। কাছেই একটা কাঁকড়ার দিকে স্থির নিশানা করল, তারপর দুই ঠোঁট গোল করে দাঁতের ফাঁক দিয়ে পিচকারির মত করে থুথু ছিটাল। কিন্তু মিস করল, কাঁকড়ার গায়ে লাগল না একবিন্দুও। ভাবনাচিন্তা কিচ্ছু নেই যেন

তার। ধরেই নিয়েছে, রানা যখন সঙ্গে রয়েছে, আরও কিছুদিন বাঁচবে ওরা। এই গুহা থেকে বেরিয়ে যাবার কোন না কোন উপায় ঠিকই বের করে ফেলবে রানা।

'আমাদের যন্ত্রপাতিগুলোর কি অবস্থা?' গিলটি মিঞার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা।

'ধরতে গেলে কিছুই নেই,' এদিক ওদিক মাথা দোলাল গিলটি মিঞা। 'টাংকিগুলোয় বাতাস নেই, মুকোস আচে একটা, চল্লিশ ফুট লায়লনের দড়ি, একটা পা-পাকনা, আর আমার এই বাতিটা। এই তো সব।'

'না থাকুক বাতাস। এয়ার ট্যাংক ছাড়াই ডুব দেব আমরা।'

অবশিষ্ট একটা ফিন টেনেটুনে আবার পায়ে পরে নিল রানা। নাইলনের দড়ির এক প্রান্ত বাঁধল নিজের কোমরে। অন্য প্রান্তটা গিলটি মিঞার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'এটা ধরে চুপচাপ বসে থাকো এখানে। আমি নেমে গিয়ে দড়ি টানব। তিন ঝাঁকুনির মানে, জলদি ভাগো। দুই ঝাঁকুনি, জোরসে টানো। আর এক ঝাঁকুনির মানে চলে এসো আমার কাছে। বুঝেছ?'

'বুজেচি, স্যার,' ঘাড় কাত করে সায় দিল গিলটি মিঞা। খুশিতে চকচক করছে নিষ্পাপ চোখ। একটা দারুণ মজার খেলা যেন এটা। চারদিকের কাঁকড়াগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনি নিশ্চিন্তে যেতে পারেন, স্যার। একা একা লাগবে না। এনারা তো রয়েচেন···'

'খুব বেশিক্ষণ একা থাকতে হবেও না অবশ্য,' বলল রানা। 'বড় জোর দেড় মিনিট দম রাখতে পারব আমি। এর মধ্যে কিছু না পেলে বাধ্য হয়ে ফিরে আসতে হবে।'

লাইটটা তুলে নিল রানা। আবার তাকের গায়ে হেলান দিয়ে বসল। বারকয়েক শ্বাস নিল জোরে জোরে। দূষিত কার্বন ডাই-অক্সাইড বের করে দিচ্ছে শ্বাসযন্ত্র থেকে। তারপর লম্বা দম নিয়ে নেমে পড়ল অন্ধকার পানিতে। নিচে নেমে চলল।

মাংসপেশীতে ব্যথা, নোনাপানি লেগে আরও বেশি জ্বালা করছে কাটা জায়গাগুলো। নেমে চলেছে রানা। এক হাতে ডাইভিং লাইট। অন্য হাত গুহার মসৃণ দেয়ালে। ঢালু হয়ে পনেরো ফুট পর্যন্ত নেমে গেছে দেয়াল, একটু সুড়ঙ্গের কাছে এসে শেষ হয়েছে।

পাথরের স্তূপ জমে প্রায় বন্ধ হয়ে আছে সুড়ঙ্গমুখ। সরু একটুখানি ফাটল রয়েছে স্তূপের মাঝে। মাথা সেঁধিয়ে দিল রানা। সাপের মত দেহটাকে আঁকিয়ে বাঁকিয়ে সরু ফাটল দিয়ে ঢুকে গেল ভেতরে। ছোট্ট সুড়ঙ্গ পেরিয়ে এসে পড়ল আরেকটা গুহায়। বিশাল গুহা। টর্চের আলো দু'দিকের দেয়াল অবধি পৌঁছুচ্ছে না।

এক পায়ের ফ্লিপার নেড়ে আস্তে আস্তে ওপরে উঠতে শুরু করল রানা। কয়েক সেকেন্ড পরেই বেরিয়ে এল খোলা বাতাসে। আরেকটা গ্যালারী। প্রথমটার মতই, তবে আরও বড়। অন্ধকারও নেই এখানে, এক ধরনের হলুদ আলোয় আলোকিত। আশ্চর্য এক হলুদ জগতে চলে এসেছে যেন সে। দেহের ছায়া পড়ছে,

সেটাও হলদেটে। মাথার ওপরে বিশ ফুট উঁচুতে ছাত, অসংখ্য স্ট্যালাকটাইট পাথর থেকে হলদে আভার বিচ্ছুরণ হচ্ছে। ছাতের কোথাও কোথাও ক্ষীণ ফাটল, পানি চোয়াচ্ছে।

হলদে আভা পানিতেও। চিৎ হয়ে আস্তে আস্তে সাঁতরে এগোল রানা। পাথর কেটে তৈরি করা একটা সিঁড়ির গোড়ায় এসে থামল। একটা সুড়ঙ্গ মুখের কাছে উঠে গেছে সিঁড়িটা। সিঁড়ির দুই পাশে দুটো মূর্তি। কোমর থেকে ওপরের অংশটা মানুষের প্রতিকৃতি, লম্বা দাড়িতে ঢাকা বুক, কিন্তু নিচের দিকে পায়ের জায়গায় রয়েছে মাছের লেজ। ছাত থেকে চুইয়ে পড়া পানিতেই বোধহয় ক্ষয়ে গেছে মূর্তিদুটো, দেখে মনে হয় অনেক পুরানো।

সিঁড়ির নিচের ধাপে উঠে বসল রানা। মাস্ক খুলে ফেলল। মিটমিট করে অদ্ভুত আলো সইয়ে নিল চোখে। কাটাবাহুতে লেগে যন্ত্রণা বাড়াচ্ছে ভেজা স্যুট। বাহুর কাটায় যতটা সম্ভব ঘষা না লাগিয়ে গা থেকে আস্তে করে স্যুটটা খুলে নিল রানা। স্যুট খুলতে গিয়েই কোমরের দড়িটার কথা মনে পড়ল। দেখল, আরও তিন ফুট এগোলে তবে টান পড়বে দড়িতে। দড়ি ধরে, জোরে একবার টান দিল। একটু সময় দিয়ে টেনে আনতে লাগল দড়ি। খানিকবাদেই ভুশ করে পানির ওপর ভেসে উঠল গিলটি মিঞার মাথা।

'লে বাওয়া, চোকে সষ্যে ফুল দেকচি নাকি! সবই যে হলদে!' অবাক হয়ে চারদিকে তাকাচ্ছে গিলটি মিঞা। ওপর দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিল।

'হ্যাঁ, ভেরোনির হলুদ নরক,' গিলটি মিঞার বাড়ানো হাতটা ধরে টান দিল রানা। পানি থেকে তুলে আনল ওপরে।

'ভায়ানক মূর্তি তো!' মূর্তিগুলোকে দেখিয়ে বলল গিলটি মিঞা। রানার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'এই জণ্ডিসের আলো কোত্থেকে আসে, স্যার?'

'মনে হচ্ছে পাথর থেকেই,' এগিয়ে গিয়ে একটা মূর্তির গায়ে হাত বোলাল রানা। তালুর দিকে তাকাল। গিলটি মিঞাকে দেখিয়ে বলল, 'এই দেখো, হাতে লেগে গেছে। কেমন হলুদ আভা বেরুচ্ছে, দেখছ? ঠিক কি জিনিস পরীক্ষা না করে বলা যাবে না, তবে পাথরে যে উজ্জ্বল ফসফরাস জাতীয় কিছু রয়েছে, সন্দেহ নেই।'

এদিক ওদিক তাকাচ্ছে, জোরে জোরে শ্বাস টানছে আর নাক কুঁচকাচ্ছে গিলটি মিয়া। 'কেমোন একটা গন্দো পাচ্চি, স্যার।'

'ইউক্যালিপটাস তেলের। ভেজা ভাবটা কমিয়ে রাখছে ওরা এই তেলের সাহায্যে, বাতাসও পরিষ্কার রাখছে।'

গায়ের ওয়েট স্যুট খুলতে শুরু করল গিলটি মিঞা। স্যুটের পায়ের ভেতর দিয়ে সাবধানে বের করে আনল নিজের ক্ষত-বিক্ষত পা। ঘষা লাগা থেকে পুরোপুরি বাঁচাতে পারল না ক্ষতগুলোকে, আবার রক্ত বেরিয়ে এল।

গিলটি মিঞার রক্তাক্ত পায়ের দিকে তাকিয়ে বলল রানা, 'তুমি বরং এখানেই থাকো। আমি এগিয়ে দেখে আসি, কি আছে না আছে।'

কেন তাকে যেতে নিষেধ করছে রানা, ঠিকই বুঝল গিলটি মিঞা। খোঁচা

খোঁচা দাড়ি চুলকে নিয়ে হাসল।

সিঁড়ির ওপরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'দু'জন একসাতে থাকলে অনেক সুবিদে হবে না, স্যার?'

গিলটি মিঞার পায়ের দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিজের কাটা বাহুতে নজর বোলাল রানা। মাথায় হাত দিল, ব্যথা করে উঠল বাড়ি খাওয়া জায়গাটা। দু'জনের প্রায় একই অবস্থা, ভাবল সে। দু'জনেই আহত, প্রচুর রক্ত বেরিয়ে গেছে, প্রচণ্ড ক্লান্তিতে ভেঙে পড়তে চাইছে শরীর। চিকিৎসা করাতে গেলে এক্ষুণি ধরে হাসপাতালে ভরে দিত ডাক্তার, দু'জনকেই।

'ঠিক আছে, এসো,' বলেই ঘুরে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল রানা।

ঘুরে ঘুরে এগিয়ে গেছে সুড়ঙ্গ। ভেতরেও সিঁড়ি দেখে অনুমান করল রানা, ওপরের দিকে উঠেছে সুড়ঙ্গ। নিঃশব্দ, নীরব। শুধু ছাত থেকে পানির ফোঁটা পড়ার টুপটাপ শব্দ।

ধীরে ধীরে সরু হয়ে আসছে সুড়ঙ্গ। অনুমান করল রানা, উচ্চতায় পাঁচ ফুট আর চওড়ায় ফুট তিনেক হবে এখানে। আরও সামনে সুড়ঙ্গের পরিসর আরও কমে এল। পাশাপাশি এগোতে গিয়ে গায়ে গা ঠেকে যাচ্ছে এখন দু'জনের। রানার পেছনে চলে গেল গিলটি মিঞা।

ভেজা দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাচ্ছে রানার, মাথা নিচু করে রাখতে হচ্ছে। সরু সুড়ঙ্গ ধরে এগোতে হচ্ছে খুব ধীরে ধীরে। লাইটের ব্যাটারি ফুরিয়ে এসেছে। চলতে খুবই কষ্ট হচ্ছে। শব্দ করে হাঁপাচ্ছে দু'জনেই।

থামল রানা। ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'খুব কষ্ট হচ্ছে?'

'না না, স্যার,' তাড়াতাড়ি বলল গিলটি মিঞা। 'নাচতে নাচতে চলেচি···কষ্ট কিসের? এট্টু শুদু ন্যাংচাতে হচ্চে, এই যা।'

আবার [illegible], শুরু করল রানা। আর বেশি সময় নেই হাতে। সাইক্লপস মিসাইল ছোঁড়ার আগেই বেরোনোর পথ খুঁজে না পেলে, হাজার হাজার টন পাথরের তলায় চাপা পড়ে মরতে হবে। বাইরের কেউ জানবে না কিছু।

ফুরিয়ে গেছে ব্যাটারি। ডাইভিং লাইটটা বয়ে বেড়ানোর আর কোন দরকার নেই। লাইটের লেন্সের দিকে একবার চাইল রানা, আলো নেই। আস্তে করে ছেড়ে দিল হাত থেকে। পাথরের সিঁড়িতে ঠোকা খাবার শব্দ তুলে গড়িয়ে নেমে যেতে লাগল ওটা, ওরা দু'জন যেদিক থেকে এসেছে সেদিকে।

আরও কয়েক ধাপ উঠতেই ঠাণ্ডা বাতাসের ছোঁয়া লাগল রানার মুখে। থেমে গেল সে। কোথা থেকে এল বাতাস? আশেপাশে দেয়ালে কোন ফাঁকফোকর আছে? নাকি ওপরে সুড়ঙ্গের অন্য মুখের কাছে পৌঁছে গেছে ওরা?

এগিয়ে চলল রানা। বেশিদূর যেতে হলো না। হালকা নীল কিছু একটা চোখে পড়ছে। চেনা চেনা লাগছে, কিন্তু চিনতে পারছে না কিছুতেই। হঠাৎই মনে হলো, কোথায় আছে সে জানে না। কি করছে এখানে, তা-ও বুঝতে পারছে না। সে কে, সেটাও অজানা। থমকে গেল রানা। আহত জায়গায় দপদপে ব্যথা তো আছেই, পরিচিত একটা ঝিমঝিমানিও শুরু হয়েছে সেই সঙ্গে। চোখ বন্ধ করে দু'হাতে মাথা

চেপে ধরল সে।

যেমন শুরু হয়েছিল, তেমনি হঠাৎই চলে গেল ঝিমঝিমানিটা। পরিষ্কার হয়ে গেল আবার মগজ। নীল জিনিসটার দিকে চোখ তুলে তাকাল রানা। পরিচিত একটা দুলুনী নীলের মাঝে। আরে! এই জিনিসটা এতক্ষণ চিনতে পারেনি সে! পর্দা, নীল মখমলের পর্দা!

পা বাড়াতে গিয়ে টের পেল রানা, জোর নেই পায়ে। কয়েক মন সীসে বেঁধে দিয়েছে যেন কেউ। গায়ের জোর নয়, নেহায়েত মনের জোরেই আবার নিজেকে টেনে নিয়ে চলল সে। পর্দাটার কাছে এসে দাঁড়াল। ছুঁয়ে দেখল হাত দিয়ে। নরম, মসৃণ অনুভূতি। মখমলই।

পর্দা ফাঁক করে ভেতরে পা রাখল রানা।

স্বর্গ! হ্যাঁ, ঘরটাকে স্বর্গ বললে বাড়িয়ে বলা হবে না। ঘরে নীলের ছড়াছড়ি। নীল মখমল দিয়ে ছাওয়া দেয়াল। পায়ের তলায় নীল পুরু কার্পেট, এক ইঞ্চি দেবে যায়। কালো আবলুস কাঠের আসবাবপত্র, চকচকে পালিশ করা। এক দেয়ালের পুরোটাই আয়না দিয়ে ঢাকা, ঘরের সব কিছু প্রতিফলিত হচ্ছে সেই আয়নায়। ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা বিছানা, এমন খাট জীবনে দেখেনি রানা। বিশাল এক ঝিনুককে চারদিক থেকে ঠোঁটে তুলে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে যেন চারটে মাছ। আশ্চর্য শিল্পকর্ম!

বিশাল খাটে শুয়ে আছে একটা মেয়ে। গায়ের ওপর আলুথালু পড়ে আছে নীল সাটিনের চাদর। চিত হয়ে শুয়ে গভীর ঘুমে অচেতন মেয়েটা। লম্বা চুলে ঢেকে আছে মুখের বেশির ভাগ।

এগিয়ে গিয়ে মেয়েটার মাথার কাছে দাঁড়াল রানা। হাত বাড়িয়ে আস্তে করে মুখের ওপর থেকে চুলগুলো সরিয়ে দিল। রানার হাতের ছোঁয়া লাগতেই গুঙিয়ে উঠল মেয়েটা, নড়ল-চড়ল। ধীরে ধীরে মেলল চোখ। এক মুহূর্ত বোবা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল রানার দিকে। মাথার কাছে দাঁড়ানো লোকটাকে চিনে নিতে ওই এক মুহূর্তই যথেষ্ট। চোখ মেলেই চেঁচিয়ে ওঠার জন্যে ফাঁক হয়ে গিয়েছিল ঠোঁট দুটো, কিন্তু রানাকে চিনতে পারার পর গলাতেই আটকে গেল চিৎকারটা। দু'চোখে স্তব্ধ বিস্ময়।

'হ্যাল্লো, ডিনা,' হাসল রানা। 'তারপর? আছ কেমন?'

ডায়না কোন জবাব দেবার আগেই মাথার ভেতরটা আচমকা দুলে উঠল রানার। তারপর গভীর অন্ধকার।

সাত

অন্ধকার। গাঢ় কুয়াশার ভেতর থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসছে রানা। দূরে, বহুদূরে মানুষের গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। ঘোর কেটে গেল হঠাৎই। আস্তে

করে চোখ মেলল সে। চোখ পড়ল এক জোড়া হলদে চোখের ওপর। তার দিকেই তাকিয়ে আছে ভেরোনি।

'গুড মর্নিং, মিস্টার রানা,' শুকনো গলায় বলল ভেরোনি। কথা বলার ভঙ্গিতে, চেহারায়, ভদ্রতা বজায় রেখেছে, কিন্তু ভেতরের ঘৃণা ঠিকই টের পাওয়া যাচ্ছে। 'অনধিকার প্রবেশ করতে গিয়ে ভালই জখম হয়েছেন দেখছি।'

'নো ট্রেসপাসিং সাইন লাগাতে ভুলে গেছেন আপনি,' গলার স্বর নিজের কানেই বেসুরো লাগল রানার। সে নয়, কোন বুড়ো মানুষ কথা বলল যেন।

'খেয়াল করিনি। কিন্তু আমাদের পাওয়ার টারবাইনের এগজস্ট কারেন্টে গা ভাসিয়ে দিতে দাওয়াতও করেনি কেউ আপনাকে।'

'পাওয়ার টারবাইন?'

'হ্যাঁ,' বলল ভেরোনি। রানার কোঁচকানো ভুরু দেখে মজা পাচ্ছে যেন। 'চার মাইলের মত সুড়ঙ্গ রয়েছে আমার এখানে। দেখেছেনই তো, বেশ ঠাণ্ডা আবহাওয়া। ফলে উত্তাপ দরকার হয় আমাদের। উত্তাপের জন্যে ইলেকট্রিসিটি দরকার। আর এখানে ইলেকট্রিসিটি তৈরি করতে পারে একমাত্র স্টীম টারবাইন।'

'আরাম আয়েশের সুন্দর ব্যবস্থা,' বিড় বিড় করল রানা। মাথার ভেতরটা পুরোপুরি পরিষ্কার হয়নি এখনও। 'কুয়াশার জন্যেও দায়ী নিশ্চয় ওই টারবাইন?'

'হ্যাঁ। পাওয়ার প্ল্যান্ট থেকে বেরোন তাপ ঠাণ্ডা পানির সংস্পর্শে এলেই বাষ্প সৃষ্টি করে। ঘন বাষ্প, কুয়াশার মতই।'

কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে নিজেকে তুলল রানা, বসল। ঘড়িটা রয়েছে হাতে। তাকাল। আপন মনেই বিড় বিড় করল, 'কতক্ষণ বেহুঁশ রইলাম!'

জবাবটা দিল ভেরোনি। 'চল্লিশ মিনিট আগে ডায়নার ঘরে আবিষ্কার করা হয়েছে আপনাকে।' রানার জখমগুলোর দিকে আরেকবার চোখ বোলাল সে। কোন রকম ভাব পরিবর্তন নেই চেহারায়।

'খারাপ অভ্যেস আমার,' হাসল রানা। 'ভুল সময়ে মেয়েদের কামরায় ঢুকে পড়ি।'

চুপ রইল ভেরোনি। শ্বেতপাথর কুঁদে তৈরি করা কাউচে লাল সাটিনের কভার লাগানো গদিতে পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে বসে আছে সাদাচুলো দানবটা। এতক্ষণে খেয়াল করল রানা, কার্পেট নেই, মার্বেল পাথরের মত মসৃণ ঠাণ্ডা মেঝেতে বসে আছে সে।

ভেরোনির দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে ঘরটা দেখতে লাগল রানা। অনুমান করল, পঁচিশ বাই পঁচিশ ফুট হবে ঘরটা। অফিস ঘর। প্রতিটি জিনিসে সৌখিনতার ছোঁয়া। একটা অফিস ঘরে আরাম আয়েশের যতখানি ব্যবস্থা থাকা দরকার, সবই আছে। কোনরকম কার্পণ্য নেই। দেয়ালে ঝুলছে চমৎকার তৈলচিত্র, সবগুলোই সাগরের দৃশ্য। উজ্জ্বল আলোয় ঝলসাচ্ছে তামার জিনিসপত্র।

ওপাশের দেয়ালের কাছে একটা চওড়া ডেস্ক, ওয়ালনাট কাঠের তৈরি। লাল চামড়ায় ওপরটা মোড়ানো। ডেস্কের সঙ্গে মানানসই চেয়ার আর অন্যান্য আসবাব। টেবিলে রয়েছে আধুনিকতম, দামী ইন্টারকম ইউনিট। কিন্তু সবচেয়ে

আশ্চর্য জিনিস হলো ঘরে বসে সাগর দেখার ব্যবস্থাটা। আট ফুট বাই দশ ফুট একটা পুরু ক্রিস্টাল বসানো হয়েছে দেয়ালে, তার ভেতর দিয়ে সাগর দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার। সাগর তলের বাগান দেখতে পেল রানা মেঝেতে বসেই। জলজ উদ্ভিদের মাঝে মাঝে পড়ে আছে ব্যাঙের-ছাতার মত পাথর। ক্রিস্টালের পর্দার ওপাশে নাক ঠেকিয়ে এদিকেই তাকিয়ে আছে আট ফুট লম্বা একটা মোরে ঈল। চোখ দুটোকে মনে হচ্ছে কঠিন লাল পাথর।

ফিরে চাইল রানা। অন্য-কোন দিকেই খেয়াল নেই ভেরোনির, তার দিকেই রয়েছে হলুদ চোখের দৃষ্টি।

'আজ এত চুপচাপ কেন?' রানা ফিরে চাইতেই বলল ভেরোনি। 'কথা বলার মূড নেই, নাকি বন্ধুর চিন্তা করছেন?'

'বন্ধু? কার কথা বলছেন?'

'বানরের মত লোকটা। পায়ে জখম হয়েছে যার, যাকে পর্দার ওপাশে রেখে ঢুকেছিলেন ডায়নার ঘরে।'

রানা বুঝল, ধরা পড়েছে গিলটি মিঞাও। চরম বিপদের মুহূর্তে হঠাৎ হাজির হয়ে যে খানিকটা চমক সৃষ্টি করবে, সে গুড়েও বালি। হ্যাঁ-না কিছু না বলে চুপ করে থাকল সে।

'না জানার ভান করে কোন লাভ নেই, মিস্টার রানা। আপনার উড়োজাহাজটাও খুঁজে পেয়েছে আমার লোকেরা।'

'এই আমার একটা বদ অভ্যেস। যেখানে খুশি পার্ক করে ফেলি।'

রানার কথা এড়িয়ে গেল ভেরোনি। 'আর তিরিশ সেকেন্ড সময় দেয়া হলো আপনাকে। এর মাঝেই বলতে হবে, এখানে কি করছেন।'

'তিরিশ সেকেন্ড কেন, এখুনি বলে ফেলছি,' সহজ গলায় বলল রানা। 'একটা প্লেন ভাড়া করে লাসভেগাসের এক ক্যাসিনোতে যাচ্ছিলাম স্পেশাল ট্যুরে। তারপর পথ হারিয়ে ফেললাম। সত্যিই, এক বিন্দু মিথ্যে বলছি না।'

'হুঁ,' কঠিন হয়ে উঠল ভেরোনির গলা। 'এখন গুরুত্ব দিচ্ছেন না বটে, পরে এই আমার সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্যেই পাগল হয়ে উঠবেন।'

'প্রায়ই ভাবি আমি, একদিন দেখা দরকার কতখানি অত্যাচার সইবার ক্ষমতা আমার আছে।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকাল ভেরোনি। 'আপনি নন, রানা। আপনার গায়ে একটা ফুলের টোকাও দেয়া হবে না। কথা আদায়ের আরও অনেক সহজ ব্যবস্থা আছে।' কাউচ থেকে উঠে গিয়ে ইন্টারকমের ওপর ঝুঁকল সে। 'অন্য লোকটাকেও নিয়ে এসো।' সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রানার দিকে তাকিয়ে হাসল নিষ্প্রাণ হাসি। 'একটু আরাম করে নিন। কথা দিচ্ছি, বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না।'

উঠে দাঁড়াল রানা। মাথা ঘুরে উঠল। চোখ টিপে বন্ধ করে মাথা ঝাড়া দিল দুপ দুপ করছে হৃৎপিণ্ড। আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে এল হৃৎপিণ্ডের গতি। পরিষ্কার হয়ে গেল মাথার ভেতরটা দুর্বল লাগছে ঠিকই, কিন্তু খাড়া হয়ে থাকতে পারল

সে।

ঘড়ি দেখল রানা। ভোর চারটে দশ। আর মাত্র পঞ্চাশ মিনিট বাকি, তারপরেই হাইপারিয়ন ছোঁড়া হবে সাইক্লপ্স থেকে, ধ্বংস হয়ে যাবে ভেরোনির আড্ডাখানা। এখান থেকে এই সময়েব মধ্যে জ্যান্ত বেরিয়ে যাবার সম্ভাবনা খুবই কম, ভাবল রানা। চোখ বন্ধ করে মনে ছবি ফোটাবার চেষ্টা করল, হাওয়াইয়ের দিকে ছুটে চলেছে স্করপিয়ন, কিন্তু ছবিটা আসতে চাইছে না কিছুতেই।

এত রক্ত এর আগে কখনও দেখেছে কিনা, মনে করতে পারছে না হপকিন্স। কন্ট্রোল রুমের মেঝের এদিক থেকে ওদিকে শুধু রক্ত আর রক্ত, ইলেকট্রিক্যাল প্যানেল আর যন্ত্রপাতিতেও ছিটকে পড়েছে রক্ত।

সহজেই সাবমেরিনে ঢুকেছে ওরা, এরপর এত কিছু ঘটবে, ভাবেনি হপকিন্স। আফটার স্টোরেজ কম্পার্টমেন্টে ঢুকেছে, কোন বাধা পায়নি। ডাইভিং গিয়ার খুলেছে, এমনকি দম নেবার সময়ও পেয়েছে খানিকক্ষণ। কিন্তু স্পেশাল ব্রাঞ্চের লোকেরা যেই কন্ট্রোল রুমে ঢুকেছে, নরক গুলজার শুরু হয়ে গেল যেন।

পরের চারটে মিনিট ভয়ঙ্কর এক দুঃস্বপ্ন দেখেছে যেন হপকিন্স। স্পেশাল ব্রাঞ্চের লোকেদের হাতের অটোমেটিক অস্ত্র প্রচণ্ড গর্জন তুলেছে। একেই ধাতব দেয়ালে ঘেরা বদ্ধ ঘর, তার ওপর পানিতে ডুবে আছে সাবমেরিন, গুলির আওয়াজে কানের পর্দা ফেটে যাবার জোগাড় হয়েছিল যেন শ্রোতাদের। গুলির আওয়াজের ফাঁকে ফাঁকে শোনা গেছে আহতের আর্তনাদ। ওইসব ভয়াবহ শব্দ এখনও কানে বাজছে হপকিন্সের; যদি বেঁচে থাকে, বাজবে আরও অনেকদিন।

যুদ্ধ করার ধরন দেখে ভেরোনির লোকগুলোকে পাগল ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারছে না হপকিন্স। যুদ্ধের কোন কায়দা কানুনই যেন জানে না ওরা, প্রাণের মায়া নেই বিন্দুমাত্র। স্রেফ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের নীরব পিস্তল ফায়ার করে গেছে। সহজ টার্গেট, নির্দ্বিধায় গুলি চালিয়েছে স্পেশাল ব্রাঞ্চের লোকেরা। শত্রুপক্ষের একেক জন আট-দশটা করে বুলেট খেয়েছে। দেখে মনে হয়েছে হপকিন্সের, ইচ্ছে করেই যেন এই শাস্তি মাথা পেতে নিয়েছে লোকগুলো। আশ্চর্য!

অ্যাডমিরাল ম্যাকডেভিডের কাছে মেসেজ পাঠানোর সময় শত্রুপক্ষের মৃতের সংখ্যা ছিল তিন। তারপরে অর্ধনগ্ন লাশের সংখ্যা বেড়েছে আরও চারটে। শরীরে অসংখ্য বুলেটের ফুটো নিয়ে পড়ে থেকেছে ওরা ডেকে, মারা গেছে রক্তক্ষরণে। টু শব্দটি করেনি।

আগে থেকেই হুঁশিয়ার করা হয়েছিল হপকিন্সকে, সাবমেরিনে ঢুকে মারপিট একটা হতে পারে, কিন্তু ওই শোনা পর্যন্তই। সে ভাবেনি, সত্যিই মারপিট-খুনজখম হবে। স্পেশাল ব্রাঞ্চের একজন মারা গেছে, তিনজন আহত হয়েছে মারাত্মকভাবে। ওদেরকে সাবমেরিনের হাসপাতালে শুইয়ে রাখা হয়েছে। প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে শুয়ে আছে ওরা চুপচাপ, দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথা সহ্য করছে, অপেক্ষা করছে, 'যাদুকর হপকিন্স' শিগ্‌গিরই চালু করে ফেলবে স্করপিয়নকে,

ফিরিয়ে নিয়ে যাবে বন্দরে, তাদেরকে পৌঁছে দেবে আধুনিকতম হাসপাতালের ইমার্জেন্সি রুমে। আহতদের কথা ভাবতে ভাবতে হপকিন্সের সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল রানার ওপর। আরেকটা পাগল! ওই বিদেশী পাগলটার জন্যেই এই অবস্থা হয়েছে। মারা যেতে বসেছে আমেরিকান নেভির এতগুলো লোক। আর একটা অসম্ভবকে সম্ভব করার ভার দেয়া হয়েছে হপকিন্সের ওপর—জলমগ্ন সাবমেরিন স্করপিয়নকে চালু করে পার্ল হারবারে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

ঘড়ি দেখল ও। শিডিউল টাইম পেরিয়ে গেছে। স্করপিয়নকে চারটের ভেতর রওনা করাতে পারবে, অ্যাডমিরালকে এই আশ্বাস দেয়ার জন্যে ক্ষোভে দুঃখে মাথার চুল ছিঁড়ছে এখন। চোদ্দ মিনিট লেট হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই। অ্যাডমিরালকে আশ্বাস দেয়ার আগেই কেন কথাটা ভাবেনি, ইশ!...

সাকশন! ছয় মাস সাগরের তলায় বালিতে শুয়ে আছে স্করপিয়ন, খোলসের চারপাশে প্রচণ্ড সাকশন তৈরি হয়েছে এখন। সাবমেরিনের সমস্ত ব্যালাস্ট ট্যাংক খালি করে ফেলা হয়েছে, কিন্তু তবু নড়ার নাম নেই জাহাজটার। সাগরতলের প্রচণ্ড আকর্ষণ কিছুতেই ছাড়াতে পারছে না স্করপিয়ন। ক্রমেই শঙ্কিত হয়ে উঠছে হপকিন্স, স্করপিয়নের আগের নাবিকদের মত একই অবস্থা হবে তাদেরও!

হপকিন্সের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড, গোমড়ামুখো এক চীফ পেটি অফিসার এসে হাজির হলো। 'আর কিছু ফেলার নেই, কমান্ডার। মেইন ব্যালাস্ট ট্যাংক খালি, ডিজেল এবং খাবার পানি, সব বের করে দিয়েছি। কিন্তু নড়ার কোন লক্ষণই নেই হতচ্ছাড়া জাহাজটার।'

আজরাইলকে এগিয়ে আসতে দেখছে যেন হপকিন্স, চেহারা দেখে তাই মনে হচ্ছে। হঠাৎই খেপে উঠল সে, লাথি মেরে তাড়াতে চাইছে যেন মৃত্যুকে, এমনিভাবে লাথি মারল চার্ট টেবিলে।

'নড়বে, নড়তে হবে হারামজাদীকে। টেনে ছিঁড়ে যদি ওর নাড়িভুঁড়ি বের করে ফেলতে হয়, তা-ও করব! কিন্তু নড়তেই হবে!' তীব্র দৃষ্টিতে পেটি অফিসারের দিকে তাকাল সে। 'ফুল অ্যাস্টার্ন!'

বড় বড় হয়ে গেল পেটি অফিসারের চোখ। 'স্যা-আ-র!'

'ফুল অ্যাস্টার্ন!' চেঁচিয়ে উঠল হপকিন্স।

'মাপ করবেন, কমান্ডার। স্ক্রুগুলোর বারোটা বেজে যাবে তাহলে! বালিতে অর্ধেক দেবে আছে। বেশি চাপাচাপি করলে শ্যাফটও ছিঁড়ে যেতে পারে!'

'যাক!' কর্কশ গলায় বলল হপকিন্স। 'পাছায় লাথি মেরে পাগলা ঘোড়ার মত ছোটাব শালীকে। তর্ক কোরো না, চীফ। ফুল অ্যাস্টার্ন দিয়ে রাখো পাঁচ সেকেন্ড, তারপর পাঁচ সেকেন্ড ফুল এহেড। এই প্রক্রিয়া চালাতে থাকোগে। যতক্ষণ না নড়তে শুরু করে এটা...' মেঝেতে লাথি মারল হপকিন্স।

হতাশ ভঙ্গিতে শ্রাগ করল পেটি অফিসার। আর কিছু না বলে তাড়াতাড়ি রওনা হয়ে গেল এঞ্জিনরুমের দিকে।

'এঞ্জিনরুম, কমান্ডার,' একটু পরেই স্পীকারে ভেসে এল পেটি অফিসারের গলা। 'আর বেশি চাপ সইতে পারবে না সাবমেরিন। স্ক্রু-ব্লেডগুলো বাঁকা হয়ে

গেছে। ব্যালান্স নষ্ট হয়ে গেছে, কাঁপছে থর থর করে।'

'চালিয়ে যাও,' মাইক্রোফোনে সংক্ষিপ্ত আদেশ দিল হপকিন্স। পেটি অফিসারের বলার আগেই অনুমান করে নিয়েছে সে ব্যাপারটা। দানবীয় প্রপেলার দুটো কি করছে না করছে, সাবমেরিনের প্রচণ্ড কাঁপুনি থেকেই অনুমান করতে পারছে সে।

কন্ট্রোল প্যানেলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে লালচুলো অল্পবয়েসী এক সাবমেরিনার। স্থির চোখে কতগুলো গজ আর রঙিন লাইটের দিকে তাকিয়ে আছে। ফ্যাকাসে চেহারা, বিড়বিড় করে কি যেন বলছে সে, হয়তো প্রার্থনা করছে।

লালচুলোর কাছে এগিয়ে গেল হপকিন্স। অল্পবয়েসী টেকনিশিয়ানের কাঁধে হাত রাখল। বলল, 'পরের বার যখন ফুল অ্যাস্টার্ন চলবে, সব কটা টর্পেডো টিউব খালি করে দেবে।'

'এতে কাজ হবে ভাবছেন, স্যার?' প্যানেলের দিক থেকে চোখ সরাল না টেকনিশিয়ান।

'হতে পারে। তবে কোন সম্ভাবনাই বাদ রাখতে চাই না।'

এঞ্জিনরুম থেকে ভেসে এল আবার পেটি অফিসারের গলা। 'স্টারবোর্ড শ্যাফটটা গেল, স্যার। সীলের কাছ থেকে দু'টুকরো হয়ে গেছে, দুটো বেয়ারিংও গেছে সঙ্গে।'

'আগের মতই চালিয়ে যাও,' আদেশ পরিবর্তন করল না হপকিন্স।

'কিন্তু, স্যার,' অনুনয় পেটি অফিসারের গলায়। 'যদি পোর্ট শ্যাফটটাও যায়? বালি থেকে সাবমেরিনকে টেনে তুলতে পারলেও বন্দরে নিয়ে যাব কি করে?'

'দাঁড় বেয়ে,' কাটা কাটা শোনাল হপকিন্সের গলা। 'আই রিপিট, মেইনটেইন প্রসিডিওর।'

দুটো প্রপেলার শ্যাফটই যদি ভেঙে যায়, যাবে, ভাবল হপকিন্স। কিন্তু থামবে না সে। আশার কথা, পোর্ট সাইড শ্যাফটটা যায়নি এখনও। তবে ভেঙে যেতে পারে যে কোন মুহূর্তে…

কংক্রিট বাংকারের আড়াল থেকে অটোমেটিক রাইফেলের আরেক পশলা ফায়ার করল লে. সেওয়ার্ড হারকার, ইউ.এস.এম. সি। একটা কথাই ভাবছে সে, কেন এই মরণপণ লড়াই? তার ওপর আদেশ আছে, সহজ আদেশ: ট্রান্সমিটারটা দখল করো। কিন্তু কেন?—জানে না সে। ঘন ঝোপঝাড়ের ভেতর লুকিয়ে রয়েছে ইউ এস নেভির একটা দল। ট্রান্সমিটারটা দখল করবে ওরা, হারকারের নেতৃত্বে। তারপর নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সীতে নির্দিষ্ট জায়গায় নির্দিষ্ট মেসেজ পাঠাবে হারকার। ব্যস, তার কাজ শেষ। ভাবছে সে, একান্ত গোপনীয় নাকি ব্যাপারটা? মরতে পাঠানো হয়েছে তাকে? যদি মারা যায় আপত্তি নেই কর্তৃপক্ষের, কিন্তু কেন মরতে হবে জানতে চাইলে আপত্তি আছে।

মাউইয়ের উত্তর পশ্চিম প্রান্তের একটা পরিত্যক্ত সামরিক ঘাঁটি। বাইরে থেকে

দেখে মনে হয়েছিল, এখনও পোড়োই রয়েছে ঘাঁটিটা, নির্জন। কিন্তু যেই এলাকার ভেতরে ঢুকতে গিয়েছে নেভির দলটা, অমনি যেন ভোজবাজির মত উদয় হয়েছে হাজারো ওয়ার্নিং আর ডিটেকশন গিয়ার। বোঝা গেছে, ফোর্ট নক্সের চেয়েও সুরক্ষিত এই ঘাঁটি। ইলেকট্রিফায়েড তার, আর লাইট বীমের প্রহরায় ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কান ফাটানো শব্দে বেজে উঠেছে সাইরেন, পুরো এলাকাটা দিন হয়ে গেছে ফ্লাড লাইটের আলোয়। ঠিক এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে বলে তৈরি ছিল না হারকার, নিজেকে গাল দিল সে। কপালে দুঃখ আছে তার। কমান্ডিং অফিসার কিছুতেই ছাড়বে না তাকে।

দুর্গের প্রতিটি জানালা-দরজা দেখে একটু আগেও মনে হয়েছিল হারকারের, ওখানে মানুষ বাস করা ছেড়ে দিয়েছে অনেকদিন। ইশ্, কি ভুলই না করেছে সে! জানালা, দরজা আর ছাতের ওপর থেকে একটানা গুলিবর্ষণ চলেছে এখন, মাথা তোলার সুযোগই পাবে না যেন হারকার আর তার দল।

ওপাশ থেকে মুহূর্তের বিরতি হলেই নিশানা করছে হারকারের লোকেরা, লাশ জমছে দরজা, জানালা আর খোলা বারান্দার সামনে।

চূড়ান্ত গোলাগুলির মাঝেই অন্ধকার ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একজন সার্জেন্ট। মাথা নিচু করে ছায়ায় ছায়ায় ছুটে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল হারকারের বাংকারের সামনে। চুল-দাড়িতে ঢাকা মুখ, বিশালদেহী রোমশ লোকটাকে ভালুকের মত দেখাচ্ছে।

'একটা লাশের পাশ থেকে রাইফেল কুড়িয়ে নিয়েছি, স্যার,' গুলির আওয়াজের জন্যে চেঁচিয়ে কথা বলতে হলো সার্জেন্টকে। 'রাশান জেড জেড কে কালেশনেভ্।'

'রাশান!' বিস্ময় চাপা দিতে পারল না হারকার।

'হ্যাঁ, স্যার, এই যে,' হারকারের সামনে অটোমেটিকটা তুলে ধরল সার্জেন্ট। 'লাল মিঞাদের তৈরি লেটেস্ট জিনিস। এটা এই ঘাঁটির লোকেরা কি করে পেল বুঝতে পারছি না!'

'আমাদের বোঝার দরকারও নেই। ওটা ইন্টেলিজেন্সের জন্যে রেখে দাও,' ট্রান্সমিটার বিল্ডিঙের দিকে আবার নজর ফেরাল হারকার। অ্যান্টেনার ওপাশে অন্ধকারে গোলাগুলির আওয়াজ আরও বেড়েছে।

'একটা দেয়ালের কাছে কোণঠাসা করে ফেলা হয়েছে কর্পোরাল ডেনজিং আর তার দলকে,' অ্যান্টেনার দিকে ফিরে বলল সার্জেন্ট। শত্রুর মনোযোগ ফেরাবার জন্যে ছোট ছোট দমকে বুলেট বর্ষণ করল। তারই ফাঁকে দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'ইশ্, একটা নাইন মিলিমিটার ট্যাঙ্ক বাস্টার হলেই কাজ হত এখন!'

প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণ ঘটল এই সময়, ধুলোর ঝড় উঠে গেল আকাশের দিকে, বৃষ্টির-মত ঝরে পড়তে লাগল দেয়াল ভাঙা কংক্রিটের গুঁড়ো। স্তব্ধ হয়ে গেল হারকার। নিজেকে সামলে নিতে পুরো দুটো মিনিট লেগে গেল তার। ধীরে ধীরে নিজেকে পায়ের ওপর খাড়া করে তুলল সে। হাঁ করে তাকিয়ে আছে ট্রান্সমিটার বিল্ডিংটার দিকে। ধ্বংসস্তূপ।

'রেডিও!' চেঁচিয়ে উঠল হারকার। 'রেডিওম্যান কোথায়!'

ছায়াঢাকা ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একজন লোক। কালো-সবুজ ক্যামোফ্লেজ ইউনিফর্ম পরনে, মুখে কালি। 'এই যে, স্যার।'

'রিসিভার!' হাত বাড়াল হারকার।

'এই যে,' হারকারের বাড়ানো হাতে রিসিভার তুলে দিল রেডিওম্যান।

'বিগ ড্যাডি,' রিসিভার কানে ঠেকিয়ে বলল হারকার, 'বিগ ড্যাডি…দিস ইজ ম্যাড চপার। ওভার।'

'দিস ইজ বিগ ড্যাডি, ম্যাড চপার। বলে যাও। ওভার।'

শুনে মনে হলো হারকারের, কোন গভীর কুয়ার তলা থেকে আসছে কথাটা।

'পুরো ব্লকটা আমাদের সামনে থেকে হাওয়া হয়ে গেছে! আবার বলছি, হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে ট্রান্সমিটার বিল্ডিং! আজ রাতে আর খবর টিউন করতে পারব না।'

'বিগ ড্যাডি আন্ডারস্ট্যান্ডস, ম্যাড চপার। দুঃখ প্রকাশ করেছেন তিনি। এটা ছাড়া উপায় ছিল না। ওভার অ্যান্ড আউট।'

খটাশ করে ক্রাডলে রিসিভার রেখে দিল হারকার। এখানে আজ রাতে কি ঘটল না ঘটল সব কানে যাবে পেন্টাগনের, কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না যেন তার। 'যা হয়-হোকগে,' এমনি একটা ভাব। সাংঘাতিক কোন একটা ভুল হয়ে গেছে আজ রাতে, এখানে। একে একে ফিরে আসতে শুরু করেছে তার লোকেরা, যারা বেঁচে আছে, জমায়েত হচ্ছে এক জায়গায়। শেষ পর্যন্ত কারা জিতল, ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না যেন হারকার।

আট

দরজা খুলে গেল। গিলটি মিঞাকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে ঘরে ঢুকল দু'জন লোক। ছেড়ে দিতেই দড়াম করে মেঝেতে আছড়ে পড়ল গিলটি মিঞা। দম বন্ধ করে ফেলল রানা, মোচড় দিয়ে উঠল পেটের ভেতর। গিলটি মিঞার দিকে চাওয়া যায় না। ক্ষতবিক্ষত পা থেকে আবার রক্ত বেরোতে শুরু করেছে। বাঁ ভুরুটা কাটা, বিচ্ছিরিভাবে ফুলে উঠেছে চারপাশের চামড়া, বাঁ চোখটা দেখাই যাচ্ছে না। মারের আরও কিছু নমুনা দেখা যাচ্ছে মুখের এখানে ওখানে।

'মেজর রানা,' বলে উঠল ভেরোনি, 'আপনার বন্ধুকে কিছুই কি বলার নেই? কিচ্ছু না? নাকি ওর নাম ভুলে গেছেন? গিলটি মিঞা নামটা মনে কোন রেখাপাত করে কি?'

'ওর নাম জানেন?'

'নিশ্চয়! আপনার সম্বন্ধেও অনেক কিছু জানি। রানা এজেন্সি, বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স কিছুই আমার আর অজানা নেই। অবাক হয়ে গেলেন মনে

হচ্ছে?'

'না না,' সহজ গলায় বলল রানা। 'বুঝতে পারছি, খুব ভালমত খোঁজ নিয়েই খবর সরবরাহ করেছে হেই ম্যাকেঞ্জী।'

কথাটা হজম করতে অসুবিধে হচ্ছে ভেরোনির, চেহারা দেখে প্রথমে তাই মনে হলো রানার। দীর্ঘ এক মুহূর্তে কাউচে চুপচাপ বসে রইল দানবটা। তারপর ধীরে ধীরে সামান্য ওপরে উঠে গেল ভুরুজোড়া।

'ক্যাপ্টেন ম্যাকেঞ্জী?' স্থির গলা ভেরোনির। কিন্তু এর মাঝেও সন্দেহের সূক্ষ্ম ছোঁয়াটা কান এড়াল না রানার। 'ভুল পানিতে মাছ শিকারের চেষ্টা করছেন আপনি, রানা…'

'হয়েছে, হয়েছে, নাটক বাদ দিন,' ধারাল গলা রানার। 'ইউ এস নেভির কাছ থেকে ক্যাপ্টেনের বেতন ঠিকই নিত ম্যাকেঞ্জী, আবার আপনার হয়েও কাজ করত। চমৎকার বন্দোবস্ত· খুবই উঁচুতে একজন ইনফর্মারকে বসিয়ে রেখেছিলেন। কাগজে কলমে লেখা হওয়ার আগেই হান্ড্রেড অ্যান্ড ফার্স্টের যে কোন অপারেশনাল প্ল্যান আপনার গোচরে চলে আসত। ম্যাকেঞ্জীকে রিক্রুট করেছিলেন কি করে? টাকা দিয়ে? নাকি ব্ল্যাকমেল? আপনার সম্পর্কে যতদূর জেনেছি, ব্ল্যাকমেলের দিকেই ধারণা ঝুঁকছে আমার।'

'খুব চালাক লোক আপনি।'

'এতে চালাকির কিছু নেই। ম্যাকেঞ্জীর গন্ধ সহজেই খুঁজে পাওয়া গেছে। বরং ইনফর্মার হিসেবে একটু বেশিই টিকে গেছে সে। বুঝতে পারছিল, বিশ্বাসঘাতক হিসেবে আর বেশি দিন বাঁচা যাবে না। ভাঙতে শুরু করেছিল ম্যাকেঞ্জী, নার্ভাস ব্রেকডাউন হতে আরম্ভ করেছিল, সেই সঙ্গে যোগ হলো কোরিন ম্যাকডেভিড। বুঝতে পারলেন আপনি, আর বেশি দিন বাঁচিয়ে রাখা যায় না লোকটাকে। তাহলে আপনার অর্গানাইজেশনের খবর ফাঁস করে দিতে আরম্ভ করবে। কিন্তু ম্যাকেঞ্জীকে নেহায়েত আনাড়ির মত খুন করে জগাখিচুড়ি পাকিয়ে ফেললেন সব।'

রানার দিকে তাকিয়ে আছে ভেরোনি। চোখে সন্দেহের ছায়া। 'সবই আপনার অনুমান।'

'মোটেও না,' বলল রানা। 'আপনার কপাল খারাপ, রয়্যাল হাওয়াইয়ান হোটেলে হঠাৎ করেই ওদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে গিয়েছিল আমার। কোরিনের সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল ম্যাকেঞ্জীর, বারে দেখা হয়ে গেল আমার সঙ্গে। সে জানত না, কোরিনের অনেক খেলার সাথীদের মাঝে একসময় আমিও একজন ছিলাম। তার সঙ্গে কোরিনের কোন গোপন সম্পর্ক আছে, আমার কাছে ফাঁস হয়ে যাক, এটা চায়নি সে। তাই কোরিন আসার আগেই কেটে পড়ে। ডায়না ওকে খুন করতে এসে আমাকে পেল। গায়েগতরে আমার সঙ্গে ক্যাপ্টেনের মিল রয়েছে। এর আগে কখনও দেখেনি, শুধু চেহারা-স্বাস্থ্যের বর্ণনা জেনে এসেছে, তাই আমাকেই ম্যাকেঞ্জী ভেবে বসল ডায়না। আমার সঙ্গে বসে কোরিনও ড্রিংক করছিল তখন, ম্যাকেঞ্জী চলে যাবার খানিক পরেই এসেছিল সে। কাজেই কোন সন্দেহ ছিল না ডায়নার মনে যে আমিই ম্যাকেঞ্জী। ব্যস কোরিনকে মারধর করে

সরিয়ে দিয়ে ডায়না জলজ্যান্ত মাসুদ রানাকে নিয়ে চলে গেল সৈকতে, বিষ ঢুকিয়ে মারতে চেষ্টা করল। হোটেলে, আমার ঘরে এসে আবিষ্কার করল ডায়না, সাংঘাতিক ভুল করে ফেলেছে সে। প্রথম সন্দেহ হয়েছিল আমার মনে, যখন আমাকে 'ক্যাপ্টেন' বলে ডাকল ডায়না। তখন অতটা বুঝিনি, ম্যাকেঞ্জীর মৃত্যুতে পরিষ্কার হয়ে গেল সব। অবশ্য পরিষ্কার এমনিতেও হত। দিন শেষ হয়ে এসেছিল ম্যাকেঞ্জীর।

কিন্তু একটা কথা, ম্যাকেঞ্জীকে খুন করতে ডায়নাকে পাঠালেন ও রাজি হলো কেন? মানে, আমি বলতে চাইছি রাজি করালেন কি করে? জ্যান্ত কিছু মানুষ-রোবটও রয়েছে আপনার। নিজের বলতে কিছুই নেই যেন ওদের, আপনি যা বলেন, যন্ত্রের মত করে যায়। আপনার জন্যে মরতেও কোন আপত্তি নেই। কাজটা কি করে সম্ভব করলেন? জাদু? কোন ধরনের ওষুধ মিশিয়ে দেন ওদের খাবারে? নাকি চোখের ভুয়া হলুদ রঙ দেখিয়ে সম্মোহিত করে ফেলেন?'

এই প্রথম অনিশ্চিত হয়ে পড়ল ভেরোনি। রানার আচার-আচরণে মনে হয় না আর কিছুক্ষণ পরেই মরতে যাচ্ছে সে। কি করে জানি পুরো ব্যাপারটাই পাল্টে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে এখন, রানাই তার প্রসিকিউটর।

'অনেক বেশি এগিয়ে গেছেন আপনি,' বলল ভেরোনি। ঝুঁকে রানার চোখের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করল, সম্মোহন করতে চাইছে যেন।

চোখ সরিয়ে নেবার একটুও চেষ্টা করল না রানা। জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে রয়েছে ভেরোনির দিকে। 'খামোকা কষ্ট করছেন, ভেরোনি। আমি মোটেও ইমপ্রেসড হইনি। ওই যে বলেছি, ভুয়া। হলুদ কন্ট্যাক্ট লেন্স ছাড়া আর কিচ্ছু না ওদুটো। আপনাকে ভক্তি করে না, এমন কারও ওপর বিন্দুমাত্র ছাপ ফেলতে পারবেন না। মস্ত এক জালিয়াত আপনি। গ্র্যাহাম আর প্রাইস, হুঁহ্, আমাকে গাধা মনে করেছেন নাকি আপনি? আপনার চিন্তাধারা ওদের সমকক্ষ?—ওদের ব্ল্যাকবোর্ড মোছার যোগ্যতা আছে নাকি আপনার? ডক্টর ফ্রেডরিক মরগানেরই বা কি আছে আপনার মাঝে…'

আচমকা থেমে গেল রানা। পাশে সরেই পিছিয়ে এল। চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে পড়েছে ভেরোনি। রক্ত উঠে এসেছে মুখে। রাগে দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। গায়ের জোরে ঘুসি মেরেছিল রানার মাথা লক্ষ্য করে। কিন্তু রানা সরে পড়ায় মিস করেছে।

ব্যালান্স হারাল ভেরোনি। সুযোগটা কাজে লাগাল রানা। দড়াম করে এক লাথি চালিয়ে দিল ভেরোনির কিডনি বরাবর।

ঘোঁৎ করে একটা আর্তস্বর বেরিয়ে এল দানবের মুখ থেকে। হুমড়ি খেয়ে উপুড় হয়ে পড়ল সে।

সবকটা চোখ ভেরোনির ও'র নিবদ্ধ। কেউ খেয়াল করল না, ধীরে ধীরে উঠে পড়েছে গিলটি মিঞা। কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে নিজেকে তুলল সে। ধীরে সুস্থে নিশানা করল। কিন্তু রেঞ্জটা অনেক বেশি। ঠিকমত লাগাতে পারল না, থুতনির ওপর গিয়ে পড়ল থুতুর দলা।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ নীরবতা বিরাজ করল ঘরে। তারপর ডেস্কের ওপর ভর দিয়ে কোনমতে উঠে দাঁড়াল ভেরোনি। জোরে জোরে শ্বাস পড়ছে। কঠিন হয়ে উঠেছে মুখের প্রতিটি রেখা। বিশাল সোনালী চোখের রঙ মলিন হয়ে গেছে। কারও দিকে তাকাল না সে। চিবুক গলা থেকে থুতু মুছে ফেলল আস্তে করে।

পাথরের মূর্তি হয়ে গেছে রানা। দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে ভেরোনির দিকে। অবিবেচকের মত কাজ করার জন্যে মনে মনে নিজেকে গাল দিচ্ছে। কোন সন্দেহ নেই তার, এখুনি, এখানেই খুন করবে তাদেরকে ভেরোনি।

এগিয়ে গিয়ে ডেস্কের ড্রয়ার খুলল ভেরোনি। পিস্তল বের করে আনল। প্রোজেক্টাইল গান নয়, কালচে নীল রঙের ·৪৪ ক্যালিবারের একটা কোল্ট রিভলভার। ভেরোনির হাতে এই জিনিস আশা করেনি রানা।

তাড়াহুড়ো করল না ভেরোনি। ধীরে সুস্থে রিভলভারের চেম্বার থেকে বুলেটগুলো খুলে নিল, পরীক্ষা করল, তারপর আবার ভরে নিল জায়গামত। উজ্জ্বলতা আবার ফিরে এসেছে চোখে, হাবভাব বরফের মত শীতল।

গিলটি মিঞার দিকে তাকিয়ে হাসল রানা। কোন রকম ভাবান্তর নেই গিলটি মিঞার চেহারায়। জানে সে, মরলে রানার সাথেই মরবে, খুব একটা আগে-পরে হবে না। কাজেই চিন্তা কিসের? তাছাড়া কে বলতে পারে, হয়তো বাঁচার কোন উপায় হয়ে যাবে। মৃত্যু কাছাকাছি এলে বড় জোর ফাইট করে তার প্রিয় লোকটা। আর যদি বাঁচে, ওকে নিয়েই বাঁচবে।

কঠিন হয়ে গেছে রানার দেহ। যে-কোন মুহূর্তে ভারী বুলেট ঢুকবে শরীরে, মনে মনে তৈরি করল সে নিজেকে। টান টান হয়ে গেছে মাংসপেশী, ছিঁড়ে যাবে যেন স্নায়ুগুলো। এভাবেই তাহলে মরণ ছিল তার, ভাবল রানা। কোল্টের ভারী বুলেট খেয়ে···হঠাৎই ঢিল হয়ে গেল তার স্নায়ু। তাকিয়ে আছে দরজার দিকে, দরজায় দাঁড়ানো মেয়েটার দিকে।

'না না, ভেরোনি,' বাধা দিয়ে বলল ডায়না, 'ওভাবে না!'

আলখেল্লার মত একটা সবুজ পোশাক পরনে। হাঁটুর অনেক ওপরে পোশাকের ঝুল শেষ হয়েছে। রোদে তাতানো চমৎকার মসৃণ চামড়া, অদ্ভুত একটা দীপ্তি ছড়াচ্ছে যেন। রক্তের গতি দ্রুত হয়ে গেল রানার। ঘরে এসে ঢুকল ডায়না। ভেরোনির দিকে তাকিয়ে আছে স্থির চোখে।

'আমার ব্যাপারে নাক গলাতে এসো না,' চাপা গলায় বলল ভেরোনি। 'এখানে তোমার কোন কাজ নেই।'

'এখানে ওদের গুলি করা উচিত হবে না,' ভেরোনির কথায় কান দিল না ডায়না। বড় বড় চোখ দুটোতে অনুনয়। 'অন্তত এ ঘরে তো নয়ই।'

'রক্ত ধুয়ে ফেলা যাবে।'

'সেটাও ঠিক হবে না। সব সময়েই শুনেছি অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতেই শুধু খুন করো তুমি। এবং সেটা করো এই স্যাংচুয়ারির বাইরে, সাগরে। মানুষের রক্তে নিজের ঘর নোংরা করবে?'

দ্বিধা করল ভেরোনি। চটে উঠতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল, বোধহয় একে

এখুনি শ্বদন্ত দেখাতে চায় না। আস্তে আস্তে রিভলভার নামিয়ে নিল। হঠাৎই হাসি ফুটল মুখে। আবার স্বাভাবিক হয়ে গেছে যেন সে। 'এখনও কিছু হয় না, কিন্তু হবে' কথাটার মানে বুঝতে পারল রানা পরিষ্কার।

'ঠিক বলেছ তুমি, ডায়না। গুলি করলে সঙ্গে সঙ্গে মরে যাবে ওরা। খুবই সুখের মৃত্যু হয়ে যাবে সেটা। ঠিকই বলেছ, মানুষের রক্তে নিজের ঘর নোংরা করাটা বোকামি। ওদেরকে ছেড়ে দেব আমি, বাইরে বের করে দেব, বাঁচার সুযোগ দেব একটা। তারপর...'

'দারুণ সুযোগ!' মুখ বাঁকাল রানা। 'কয়েকশো মাইল দূরে ডাঙা। আশেপাশে রয়েছে মানুষখেকো হাঙর। আপনি দয়ার সাগর, ভেরোনি...'

'হয়েছে, হয়েছে,' বাধা দিয়ে বলল ভেরোনি। দেঁতো হাসি হাসল। 'বাজে কথা বাদ। এখন বলুন তো, কি করে এসেছেন আপনি এখানে, এবং কেন? তাড়াতাড়ি করুন, বাজে আলাপের সময় নেই আমার।'

ঘড়ি দেখল রানা। নিজেকেই বলল যেন, 'আর একত্রিশ মিনিট।'

'একত্রিশ মিনিট?'

'হ্যাঁ। আর একত্রিশ মিনিট পরেই আপনার এই স্যাংচুয়ারি,' ভেরোনির দিকে তাকিয়ে হাতের তালু উপুড় করল রানা। 'খতম।'

'আবার বাজে কথা!' ক্রিস্টাল পোর্টালের কাছে গিয়ে দাঁড়াল ভেরোনি। মোরে ঈলটা যায়নি এখনও। সেটাকে দেখল কয়েক মুহূর্ত। তারপর ঘুরে দাঁড়াল আচমকা। 'প্লেনটায় আর ক'জন লোক ছিল?'

ভেরোনির প্রশ্নের মাথায় প্রশ্ন করে বসল রানা, 'আমি জানতে পারি কি, মরগান, গ্র্যাহাম আর প্রাইসের কি হলো?'

'আমাকে খেলাতে চাইছেন?'

'না,' গম্ভীর হয়ে উঠেছে রানা। 'আমার দুটো প্রশ্নের জবাব দিন, আপনি যা জানতে চাইবেন, জানাব। কথা দিচ্ছি।'

হাতের রিভলভারের দিকে চিন্তিতভাবে তাকাল ভেরোনি, তারপর নামিয়ে রাখল ডেস্কের ওপর। 'ঠিক আছে, কথা রাখলেই ভাল করবেন।' আবার বসে পড়ল সে।

'শুরুতেই বলছি, মেজর, সত্যিই আমার নাম মরগান।'

'কিন্তু ফ্রেডরিক মরগানের বয়েস এখন আশির কম হওয়ার কথা না!'

'আমি তাঁর ছেলে,' ধীরে ধীরে বলে গেল ভেরোনি। 'হারিয়ে যাওয়া কানোলি দ্বীপ আবিষ্কারের জন্যে গ্র্যাহাম আর প্রাইসকে নিয়ে যখন বেরোন বাবা, আমার তখন অল্প বয়েস। আপনি নিশ্চয় জানেন, প্যাসিফিস্ট ছিলেন ডক্টর মরগান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থামল বটে, কিন্তু ততদিনে অ্যাটম বোমা ফাটানো হয়ে গেছে। বাবার ধারণা হলো, ওই শুরু। এরপর নিউক্লিয়ার হলোকস্টে পৃথিবীর বুক থেকে মানব জাতির বিলুপ্তি ঘটে যাবে যে-কোন দিন। কাজেই একটা জায়গা খুঁজতে শুরু করলেন তিনি, যেটা টার্গেট এরিয়া থেকে অনেক দূরে হবে, এবং যেখানে পৌঁছুবে না র‍্যাডিয়েশনের ধ্বংসক্ষমতা। শিগ্‌গিরই আবিষ্কার করলেন তিনি, এমন জায়গা

রয়েছে একমাত্র সাগরের তলায়। হিস্টরিক্যাল স্টাডিতে জানলেন, কয়েক শতাব্দী আগে সাগরের তলায় আচমকা বসে গেছে কানোলি, আগ্নেয়গিরির কোন হাত নেই এর বসে যাবার পেছনে। অনুমান করে নিলেন তিনি, দ্বীপের আদি অধিবাসীদের ব্যবহৃত গুহা আর সুড়ঙ্গগুলোর অনেকগুলোই অক্ষত থেকে যেতে পারে। ভবিষ্যতের শান্তিময় পৃথিবীর স্বপ্ন দেখতেন আরও দু'জন লোক, বাবারই বন্ধু তাঁরা, ডক্টর গ্র্যাহাম এবং প্রাইস। হারিয়ে যাওয়া দ্বীপটার খোঁজে বাবার সঙ্গী হলেন তাঁরাও। একটানা তিন মাস ধরে অনুসন্ধান চালানোর পর দ্বীপটার খোঁজ পেলেন তাঁরা। দেরি না করে প্ল্যান করে ফেললেন, কি করে পাম্পের সাহায্যে পানিমুক্ত করবেন গুহা আর সুড়ঙ্গগুলোকে। প্ল্যান সফল করতে আরও এক বছর সময় লেগেছিল তাঁদের। তারপর সাগরতলের কোয়ার্টারে বসবাস শুরু করেন তাঁরা।'

'ব্যাপারটা পুরোপুরি গোপন রেখে এমন একটা কাজ করলেন কি করে তাঁরা?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'রেকর্ডে আছে, বন্দর ছাড়ার কয়েক মাস পরেই নিখোঁজ হয়ে যায় তাঁদের জাহাজ।'

'গোপন রাখাটা কঠিন কাজ ছিল না,' বলে গেল ভেরোনি। 'জাহাজটার খোলসে কিছু পরিবর্তন করা হয়েছিল। এতে করে লোকচক্ষুর অগোচরেই সাগরের তলায় ডাইভার নামতে উঠতে পারত, যন্ত্রপাতিও নামানো ওঠানো যেত। নাম পরিবর্তন করে ফেলা হয়েছিল জাহাজটার, রঙ বদলে দেয়া হয়েছিল। ওয়েস্টার্ন ট্রেড রুটে চলাচলকারী আর দশটা সাধারণ জাহাজের মতই হয়ে গিয়েছিল ওটা, লোকের চোখে পড়েনি। আসলে, গোপন রাখাটা নয়, টাকা জোগাড় করাটাই কঠিন ছিল।'

'হ্যাঁ। বাকিটা জানি আমি,' বলল রানা। গলায় আত্মবিশ্বাস। গিলটি মিঞার দিকে তাকাল একবার। বেশির ভাগ রেকর্ডপত্রই জোগাড় করে এনেছে গিলটি মিঞা।

চোখ তুলে তাকাল রানার দিকে ভেরোনি। এক পা কাছে এগিয়ে এল ডায়না। চোখে সন্দেহ।

'আপনাকে বুদ্ধিমান ভাবতে বাধছে আমার, ভেরোনি,' বলল রানা। 'হানড্রেড অ্যান্ড ফার্স্টের লোকেরা, ইউ এস নেভির অনেকে, এমনকি আমিও আপনার সেট-আপ জেনে গেলাম, অথচ টেরই পেলেন না আপনি।'

'মিছে কথা বলে কি লাভ, রানা?' ঠিক প্রশ্নের মত শোনাল না ভেরোনির প্রশ্নটা।

'টের পাওয়া উচিত ছিল আপনার, ভেরোনি। মনে পড়ে, আমার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে যখন বেরিয়ে যাচ্ছিলেন আপনি, কানোলির কথা উল্লেখ করেছিলাম আমি? আমি কানোলির কথা জেনে গেছি বুঝেও মোটেই গুরুত্ব দেননি। কেন? কারণ জানতেন, আমি মারা যাচ্ছি। ডেড মেন টেল নো টেল, কাজেই ভয়ের কিছু ছিল না আপনার।'

'কি করে…কি করে জানলেন…?'

'বিশপ মিউজিয়মের কিউরেটরের কাছ থেকে। আপনার বাবার কথা মনে

করতে পেরেছিল হিরাম। তবে ওর কথা থেকে একটা পয়েন্ট পেয়েছি। পরে একে একে আরও পয়েন্ট পেয়েছি, নিখুঁত একটা ছবি সাজিয়ে নিয়েছি মনে মনে,' থামল রানা। এগিয়ে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল গিলটি মিঞার পাশে। তার কাঁধে হাত রেখে ভেরোনির দিকে তাকাল। 'লোভ, শুধু লোভের কারণেই খুন করেন আপনি, ভেরোনি। আপনার বাবা কিন্তু এমন ছিলেন না, সত্যিকারের বিজ্ঞানী ছিলেন তিনি। যা কিছু ভেবেছেন, যা কিছু করেছেন, সবই মানুষের উপকারের জন্যে। অথচ আপনি হলেন ঠিক তাঁর বিপরীত। জলদস্যুতার ইতিহাসে আপনার নিষ্ঠুরতার কোন তুলনা নেই।'

'থামলেন কেন?' বলে উঠল ভেরোনি। 'বলুন, সবটা শুনতে চাই আমি।'

'নিজের কাহিনী অন্যের মুখে থেকে শুনবেন?' বিরক্ত শোনাল রানার গলা। 'ফাইলে আপনার নামে কি কি লেখা রয়েছে সব শুনতে চান? ঠিক আছে, বলছি। কিন্তু তার আগে এই মানুষটাকে,' আঙুল তুলে গিলটি মিঞাকে দেখিয়ে বলল, 'যদি আরেকটু আরামে বসতে দেন তো ভাল হয়। ঠাণ্ডা মেঝেতে জানোয়ারের মত পড়ে থাকতে খুবই কষ্ট হচ্ছে ওর।'

আস্তে করে গার্ডদের দিকে চেয়ে মাথা ঝোঁকাল ভেরোনি। দু'দিক থেকে ধরে গিলটি মিঞাকে নিয়ে গিয়ে লাল কভারের কুশনওয়ালা কাউচটাতে বসিয়ে দিল দু'জন গার্ড। কি বলতে গিয়েও রানার চোখের দিকে তাকিয়ে থেমে গেল গিলটি মিঞা।

ভাবছে রানা, কোনরকমে, যদি কোন রকমে একটা সুযোগ পেতাম বেরিয়ে যাবার! সময় বেশি নেই। প্রথম ধাক্কায়ই ভেঙে যাবে ক্রিস্টালটা, হুড়মুড় করে ঘরে এসে ঢুকবে লক্ষ লক্ষ গ্যালন নোনা পানি। খোদা, একটা সুযোগ যদি পেতাম!

আবার শুরু করল রানা, 'সী ভেঞ্চার, আপনার বাবার জাহাজের নাম। ওটার প্রয়োজন ফুরিয়েছিল। প্রচুর টাকার দরকার ছিল ডক্টর মরগানের। ততদিনে বাসযোগ্য হয়েছিল বটে, কন্সট্রাকশনের কাজ চলছিল তখনও কানোলির তলায়। সেখানে মেলা খরচ। কাজেই একটা ফন্দি করলেন তিনি ইনশ্যুরেন্স কোম্পানীকে ঠকিয়ে টাকা রোজগারের। বিজ্ঞানের কাজে টাকাটা ব্যয় হচ্ছে বলে কোনরকম অনুশোচনা ছিল না তাঁর মাঝে। তাছাড়া সমাজ থেকে অনেক দূরে তিনি তখন, কিসের তোয়াক্কা? সী ভেঞ্চারকে আমেরিকার কোন বন্দরে নিয়ে ভিন্ন নামে রেজিস্ট্রি করালেন তিনি, বাতিল লোহালক্কড় আর অন্যান্য জিনিসপত্র ভরলেন তাতে। তারপর জাহাজ আর মিথ্যে মালপত্রের নামে অনেক টাকার বীমা করালেন। এবার সোজা কানোলিতে ফিরে এসে জাহাজের স্টপ কক খুলে দিলেন। ভোরটেক্সের একটা শিকার হিসেবে রেকর্ড হলো জাহাজটার নাম। বীমা ক্লেম করলেন আপনার বাবা এবং পেলেনও।

'এতই সহজে ঘটে গেল পুরো ব্যাপারটা যে এটাকেই ক্যারিয়ার হিসেবে নেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন আপনি। আপনার বাবা মারা যাবার পর লোক ঠকানোর ব্যবসা ফেঁদে বসলেন। ড. প্রাইস আপনার বাবার আগেই মারা গেছেন। বেঁচে আছেন শুধু ডক্টর গ্র্যাহাম। আপনার জন্যে সোনায় সোহাগা। সার্জন তিনি,

মানুষকে জলচর জীব হিসেবে চলাফেরা করানোর যন্ত্র তিনি আবিষ্কার করেছেন। তাঁর কাছে আপনার প্রস্তাব পেশ করলেন আপনি। কিন্তু আপনার কুপ্রস্তাবে রাজি হলেন না গ্র্যাহাম। কি করলেন আপনি? তাঁর স্ত্রীকে কিডন্যাপ করে নিয়ে এলেন। স্ত্রীর ওপর অত্যাচারের ভয় দেখিয়ে ইচ্ছের বিরুদ্ধে কাজ করিয়ে নিতে লাগলেন ডক্টর গ্র্যাহামকে দিয়ে,' ডায়নার দিকে তাকাল সে। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মেয়েটার চেহারা। আবার ভেরোনির দিকে ফিরল রানা। 'আপনার এই স্যাংচুয়ারিতেই জন্ম নিল ডায়না, ডায়না গ্র্যাহাম। মেয়ের জন্ম দিতে গিয়ে মারা গেলেন তার মা। আপনার কোন অসুবিধে হলো না। এবারে মেয়ের ক্ষতির ভয় দেখিয়ে বাপকে দিয়ে কাজ আদায় করে নিতে লাগলেন। ডায়না যখন বড় হলো, তাকেও কাজে লাগালেন আপনি, বাপকে মেরে ফেলার ভয় দেখিয়ে। চমৎকার ব্যাপার, না?' ডায়নার দিকে তাকাল আবার রানা। 'কি, ঠিক বলছি তো?'

হ্যাঁ-না কিছুই বলল না ডায়না। ফ্যাকাসে মুখে দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ।

'এসব খবর জোগাড় করেছে গিলটি মিঞা,' ভেরোনির দিকে ফিরে বলতে লাগল রানা। 'দারুণ লাভের ব্যবসা আপনার, ভেরোনি। অথচ সহজ। মেনল্যান্ড থেকে ইন্ডিজ এবং ওরিয়েন্টগামী জাহাজে আপনার কিছু লোককে নাবিকের খাতায় নাম লিখিয়ে তুলে দিতেন। খটকা লেগেছে আমার কাছে, সব সময় পশ্চিম মুখো জাহাজগুলো হারায় কেন! পরে বুঝলাম, ওয়েস্টার্ন স্টীমার লাইন আপনার বাড়ির আঙিনা দিয়ে গিয়েছে। আপনার লোকেরা খুব সহজ একটা কাজ করে, নির্দিষ্ট গতিপথ থেকে সামান্য একটু সরিয়ে দেয় জাহাজটাকে, এঞ্জিনরুমে "অল স্টপ" সাইন পাঠায়, তারপর স্ট্যান্ড বাই হয়ে পড়ে। পানির তলা দিয়ে লোক পাঠান আপনি, জাহাজে তো রয়েছেই—সবাই মিলে খুন করে জাহাজের নিরপরাধ লোকদেরকে। এরপর গায়েব হয়ে যায় জাহাজটা। কি করে? মৃত লোকগুলোই বা কোথায় যায়? ভার বেঁধে সাগরের তলায় ডুবিয়ে দেয়া হয় লাশগুলোকে। হাঙরের ভোজে লাগে এদের বেশির ভাগই। জাহাজটার রঙ বদলে ফেলা হয়, আরও কিছু ছোটখাট পরিবর্তন করে নতুন নামে নতুন ভাবে রেজিস্ট্রি করা হয়। ব্যস, আপনার জাহাজ হয়ে গেল ওটা। জাহাজের মালপত্রগুলো ব্ল্যাকমার্কেটে বেচে দেন আপনি। গম, চাল ইত্যাদি খাবার জিনিস নিয়ে এসে ভরেন নিজের ভাঁড়ারে। যদি কোনমতে বেঁচে উঠে এসে আপনার কাজকর্ম দেখত, ভিরমি খেয়ে আবার হার্টফেল করত এমনকি স্প্যানিশ জলদস্যুরাও। ভয়ঙ্কর এক জলদস্যুদলের নেতা আপনি, ডাকাত, এছাড়া আর কিচ্ছু না। খোদা, কি সহজভাবে সবাইকে বোকা বানিয়ে রেখেছেন আপনি এতকাল! সবাই ভেবেছে, জাহাজগুলো হারিয়ে গিয়ে পানির তলায়ই কোথাও রয়েছে, অথচ কি ভুল! অর্ধেকেরও বেশি জাহাজ রয়েছে সাগরের ওপরে, লোকের চোখের সামনে, অথচ বুঝতে পারছিল না কেউ। এক একটা জাহাজকে কমপক্ষে দু'বার করে গায়েব করেছেন আপনি। একবার তাদের প্রথম নামে, তারপর দ্বিতীয় নামে। দ্বিতীয়বার ইনশ্যুরেন্সের ক্ষতিপূরণটা আসছে বোনাস হিসেবে।'

'অনেক কিছুই জানেন দেখছি।' ঘৃণা ঝরল ভেরোনির গলায়, ঘৃণা ঝরছে হলুদ

চোখ থেকে। বুঝতে পেরেছে বাজে বকছে না রানা, সত্যিই ধরা পড়েছে ওর চালাকি।

'আর আটলান্টার ব্যাপারটা,' ভেরোনির কথায় কান না দিয়ে বলে গেল রানা, 'আরও চমৎকার! ইতিমধ্যে ভোরটেক্স নিয়ে যথেষ্ট জল্পনা কল্পনা শুরু হয়ে গেছে। বেশ কিছু প্রাইভেট জাহাজ ঘোরাফেরা শুরু করেছে এদিকে, হারিয়ে যাওয়া জাহাজের অনুসন্ধান চালাচ্ছে। যে-কোন সময় ডুবে থাকা একআধটা জাহাজের অস্তিত্ব আবিষ্কার করে ফেলতে পারে তাদের সোনার। শঙ্কিত হয়ে উঠলেন আপনি। ওদের তাড়ানোর ব্যবস্থা করতে গিয়ে আটলান্টার ঘটনাটা ঘটালেন। খুব চমৎকার সাজিয়েছিলেন ঘটনা। কোস্টগার্ড মার্চেন্ট মেরিন, এমন কি নেভির পর্যন্ত চমকে গিয়েছে পিলে। লাশের চামড়া সবুজ হয়ে যাওয়ার বর্ণনা দিয়েই চমকে দিয়েছেন লোককে, নাবিকেরা আঁতকে উঠল খবর শুনে। জায়গাটাকে প্লেগের মত এড়িয়ে চলতে লাগল তারা। এমনকি জায়গাটার নামও দিয়ে ফেলল তারা: দি হাওয়াইয়ান ভোরটেক্স। কি বোকাই না বানিয়েছেন লোকগুলোকে। আসলে আটলান্টা থেকে ভুয়া রেডিও মেসেজ পাঠিয়েছিল আপনার লোকই, জাহাজের আসল রেডিও ম্যানকে তো আগেই খুন করে ফেলা হয়েছে। আর স্প্যানিশ ফ্রেইটার কলম্বাসও আপনারই জাহাজ। ওটার নাবিকরাই আটলান্টার লোকদেরকে খুন করেছিল।'

থামল রানা। ভেরোনিকে কথাগুলো হজম করার সময় দিয়ে আবার শুরু করল, 'নিখুঁত কাজকারবার। পৃথিবীকে জানিয়ে দেয়া হলো, বিস্ফোরণে ধ্বংস হয়ে গেছে আটলান্টা। সত্যিই কি তাই? রেকর্ডে পড়েছি, খুবই সুন্দর জাহাজ আটলান্টা। আপনার মত লোক এমন একটা জাহাজকে ধ্বংস করে দেবেন? মোটেই না। ওটার খোল-নলচে বদলে ভিন্ন নামে রেজিস্ট্রি করা হয়েছে। হয়তো ওটা এখন হনলুলুর কেনো জেটিতে দিব্যি বাঁধা রয়েছে, আপনার কোম্পানীর সম্পত্তি হিসেবে। কোম্পানীর নামটা কি যেন…ফ্র্যাঙ্কলিন করপোরেশন না?'

হঠাৎ স্থির হয়ে গেল ভেরোনি। 'ফ্র্যাঙ্কলিন করপোরেশনের নামও জানেন আপনি?'

'শুধু আমি নই, আরও অনেকেই জানে,' শীতল হাসি হাসল রানা। 'আরও জানি, এই ডুবো পাহাড়ের বাইরে ওই করপোরেশনের নামে যা কিছু আছে, সব এতক্ষণে দখল করে নিয়েছে আমেরিকান নেভি। আপনার উভচর উড়োজাহাজ, করপোরেশনের অফিস মাউইয়ের রেডিও ট্রান্সমিটার সব।' ভেরোনির চেহারা দেখে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেতে শুরু করেছে রানা। 'দারুণ জমিয়ে ছিলেন আপনি, ভেরোনি। প্রতিটা খুঁটিনাটির দিকে নজর ছিল আপনার। কোন ভিকটিম যদি কোনমতে মে ডে সিগন্যাল পাঠাত, সঙ্গে সঙ্গে সেটা ধরে ফেলত আপনার ট্রান্সমিটার। সেই মেসেজ এরপর আপনার লোকেরা পাঠাত, ভুল তথ্যপূর্ণ মেসেজ। জাহাজের পজিশন দিত আসল জায়গা থেকে শত শত মাইল দূরের কোন একটা জায়গায়।'

কঠিন হয়ে উঠেছে ভেরোনির চেহারা। 'অনেক আগেই মেরে ফেলা উচিত

ছিল আপনাকে, রানা।'

'ঠিক,' শ্রাগ করল রানা। 'চেষ্টা অবশ্য কম করেননি; কপাল মন্দ, সফল হননি। ধূসর ট্রাকের কথা ধরুন। ব্যাপারটা একটু বেশি নিষ্ঠুরতাই হয়ে যাচ্ছিল, এভাবে খুন করানোটা আপনার নিয়মের বাইরে। আসলে সময় ছিল না আপনার হাতে। ম্যাকেঞ্জী নিশ্চয়ই ইনফর্ম করেছিল আপনাকে, অ্যাডমিরাল ম্যাকডেভিডের সঙ্গে বৈঠকে বসতে যাচ্ছি আমি। আপনার ভয় ছিল, আমি তদন্ত শুরু করলে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে আসতে পারে। ভয় ছিল, মুখ ফসকে ম্যাকেঞ্জী সম্পর্কে দু'য়েকটা কথা আমার কাছে বলে বসতে পারে কোরিন। তাছাড়া ইতিমধ্যে আমার আসল পরিচয় ও উদ্দেশ্য জেনে গেছেন। কাজেই সহজ সিদ্ধান্ত নিলেন আপনি, যে-কোন উপায়েই হোক মাসুদ রানাকে সীন থেকে সরিয়ে দেয়া দরকার, এবং দ্রুত।'

'ধূর্ত লোক আপনি, সন্দেহ নেই,' ধীরে ধীরে বলল ভেরোনি, 'যা ভেবেছিলাম, তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি ধূর্ত। তবে এখন আর তাতে কিছু যায় আসে না। আপনার অনুমানে ভুল নেই।' চোখ বন্ধ করে ভাবছে ভেরোনি, ভুরুর ওপর হাত বোলাচ্ছে। অতীত ভুলকে মুছে ফেলতে চাইছে যেন। চোখ খুলে বলল, 'আপনাকে বেছে নেয়াটা চূড়ান্ত বোকামি হয়েছে, নিজেকেই শাস্তি দেয়া উচিত আমার এজন্যে। তিরিশ বছর ধরে চালিয়ে যাচ্ছি অর্গানাইজেশনটা, কোনদিন কোন গোলমাল হয়নি। অথচ মাত্র কয়েকদিনে, আরেকটু হলে শেষই করে দিচ্ছিলেন আপনি।'

'এতবড় অপরাধ যে তিরিশটা বছর ধরে চালাতে পেরেছেন এইই বেশি,' বলল রানা। 'সব অপরাধেরই শেষ হয় এমনি, অপ্রত্যাশিতভাবে। নিজেকে ধ্বংস করে ফেলেছেন আপনি। যা গিলতে পারবেন, তার চেয়ে অনেক বেশি মুখে নিয়ে বসে আছেন। স্করপিয়নকে কব্জা করতে যাওয়াটা মারাত্মক বোকামি হয়ে গেছে আপনার। সদাগরী জাহাজ হাইজ্যাক করাটা এক কথা, কোস্টগার্ড ওপরে ওপরে একটু খোঁজখবর করেই হাল ছেড়ে দেয়। কিন্তু নেভির জাহাজ ছিনতাই করাটা ভীমরুলের চাকে হাত ঢোকানোর সামিল। হারিয়ে যাওয়া জাহাজটার খোঁজে সাগরের ওপরে-নিচে তোলপাড় করে ফেলে নেভি। জাহাজটা সত্যিই হারিয়ে গেছে, কিংবা ধ্বংস হয়ে গেছে, এর স্বপক্ষে সত্যিকারের নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়ার আগে কিছুতেই খোঁজা বন্ধ করে না। তার ওপর আরেকটা মারাত্মক ভুল করলেন আপনি আমাদের এজেন্ট রফিককে খুন করে। তার আগেই তুরাগের একটা ক্রোনোমিটার পাঠিয়ে দিয়েছিল ও ঢাকায়। আপনি কি ভেবেছিলেন আমরা ছেড়ে দেব আপনাকে, কিংবা পারব না আপনার রহস্য ভেদ করতে?'

ক্রিস্টালের ওপাশে সাগরের দিকে দীর্ঘ কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল ভেরোনি। তারপর বলল, 'রফিককে না মেরে উপায় ছিল না, বড় বেশি খোঁজখবর নিতে শুরু করেছিল। কিন্তু স্করপিয়নের ব্যাপারে আমার কোন হাত ছিল না। কমান্ডার ম্যাসন তার কোর্স বদল না করলে, আমার স্যাংচুয়ারি আবিষ্কার করে না বসলে, এখনও তার ক্রুসহ বেঁচে থাকত। ও মরেছে ওর দোষে।'

বরফের মত শীতল রানার দৃষ্টি। 'কি করে করলেন কাজটা? পানির তলায় চলন্ত একটা নিউক্লিয়ার সাবমেরিনকে ধরলেন কি করে?'

গর্বিত শোনাল ভেরোনির গলা। 'খুব সহজে। সাবমেরিনের চলার পথে একটা ইস্পাতের মোটা তার পেতে রাখল আমার লোকেরা। তারে আটকে গেল সাবমেরিনের প্রপেলার। থেমে যেতে বাধ্য হলো। বাইরে থেকে কয়েকটা ব্যালাস্ট ভেন্ট খুলে দেয়া হলো। এয়ার ট্যাংকে পানি ঢুকে গেল। পানি ঢুকে গেল দুটো ইন্টেরিয়র কম্পার্টমেন্টে। সাগরের তলায় বসে গেল সাবমেরিন। ওটার লো ফ্রিকোয়েন্সী রেডিও সিগন্যাল জ্যাম করে দেয়া হলো সমস্ত এসকেপ হ্যাচ সিল করে দেয়া হলো বাইরে থেকে। কয়েক মাস পরে, খাবার ফুরিয়ে গেল ওদের, কাহিল হয়ে পড়ল ওরা। হ্যাচ খুলে ভেতরে ঢুকল আমার লোকেরা। দুর্দশা থেকে মুক্তি দেয়া হলো ক্যাপ্টেন ম্যাসন আর তার ক্রুদের।'

'সত্যিই খুব সহজ,' ভেরোনির কথার প্রতিধ্বনি করল যেন রানা। 'শতাব্দীর সবচেয়ে বড় হাইজ্যাক এটা, ভেরোনি। অথচ টেরও পেল না কেউ, কোথায় রয়েছে স্করপিয়ন। এখান থেকে শত শত মাইল দূরে গরু খোঁজা খুঁজেছে এটাকে ইউ এস নেভি। সবই বৃথা। পানিভরা কম্পার্টমেন্ট থেকে পানি সরিয়ে দিতে মাত্র কয়েকদিন লেগেছে আপনাদের। তারপরই আবার আগের মত হয়ে গেছে স্করপিয়ন, মাত্র একশো আশি ফুট পানির তলায় কেমন সুন্দর বসিয়ে রেখেছেন। কিন্তু একটু সমস্যা ছিল আপনার, বুঝতে পারেননি প্রথমে। পৃথিবীর আধুনিকতম নিউক্লিয়ার সাবমেরিন, ওয়ারহেড সহ মিসাইল বসানো আছে। ধরতে গেলে আপনার ঘরের দরজায়ই পড়ে আছে সাবমেরিনটা, কিন্তু কি করে চালাতে হয় এটাকে, জানা নেই আপনার। জটিল সব যন্ত্রপাতি রয়েছে স্করপিয়নে। আপনার লোকেরা সব অশিক্ষিত গুণ্ডাপাণ্ডা। আপনার প্রতি একটা অন্ধ আস্থা রয়েছে ওদের, যার ফলে বিনা প্রতিবাদে করে যাচ্ছে যা বলছেন। কিন্তু স্করপিয়নকে চালানো ওদের কর্ম নয়। আর এজন্যেই সীম্যান ডিক্সনকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন আপনি। ভেবেছিলেন ভয় দেখালেই চালানো শিখিয়ে দেবে আপনার লোকেদের। সাবমেরিনটাকে নিয়ে কোনমতে রাশান কিংবা চীনাদের কোন বন্দরে পৌঁছে দিতে পারলেই কেল্লা ফতে, মোটা টাকায় বিক্রি করে দিতেন। কিন্তু বাদ সাধল ডিক্সন। সঙ্গীদের নিজের চোখের সামনে নিষ্ঠুরভাবে খুন হতে দেখে মাথা বিগড়ে গেল তার। পাগল হয়ে গেল।'

'হ্যাঁ, ছকে সামান্য একটু ভুল করে ফেলেছিলাম,' ক্লান্ত ভেরোনির গলা।

'তেলেনিকভের কি ঘটেছে, ভেরোনি? হাইজ্যাকারকে বিশ্বাস করতে বাধছিল ওদের? নিজেরাই চোরের ওপর বাটপাড়ি করতে গিয়েছিল? তুলে নিয়ে যেতে চেয়েছিল স্করপিয়নকে?'

'এবারে অনুমানে ভুল হলো আপনার, মেজর।' তলপেটে আহত জায়গায় হাত বোলাচ্ছে ভেরোনি। 'পিকারিংকে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় ঘোরাফেরা করতে দেখে সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে তেলেনিকভ। দেখতে আসে, কি ব্যাপার। ওকে ডুবিয়ে দেয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না আমার।'

‘পিকারিংকে হারাতে নিশ্চয় খুব কষ্ট হয়েছে আপনার,’ মিহি গলায় বলল রানা। ‘আপনার দস্যুতার ইতিহাসে রেকর্ড ভেঙেছে ওটা। পিকারিংই একমাত্র শিকার, যেটা আপনার হাত ফসকে পালিয়ে যেতে পারল।’

‘হ্যাঁ,’ স্বীকার করল ভেরোনি। ‘পিকারিংকে কিছুতেই বাগে আনতে পারেনি আমার লোকেরা। তার আগেই পার্ল হারবারের দিকে চলতে শুরু করেছিল জাহাজটা।’

‘ওটাকে বোম মেরে উড়িয়ে দিতে পারতেন।’

‘দেরি হয়ে গিয়েছিল। ক্যাপ্টেন ম্যাকেঞ্জী সাবধান করে দিয়েছিল, জাহাজটার কমান্ড নেবার জন্যে নতুন একদল নাবিক উড়ে আসছে হেলিকপ্টারে করে। নিজেদের দলের লাশ আর আহতদের সরানোর সুযোগ পেয়েছিল শুধু আমার লোকেরা।’

‘এবারে কোন কিছুই আপনার সপক্ষে যায়নি, না?’ হালকা গলায় বলল রানা।

‘পিকারিঙে আপনি ছিলেন,’ শীতল গলা ভেরোনির। ‘গুলি করে মেরেছেন আমার লোকদের। হেলিকপ্টারে তুলে নাবিকদের নিয়ে পালিয়েছেন আপনি। আপনিই গোলমাল করে দিয়েছেন আমার সমস্ত পরিকল্পনায়, সবকিছুতেই।’

‘খামোকা আমার দোষ দিচ্ছেন,’ যেন অভিযোগ করছে রানা। ‘আমি নিজের ইচ্ছেয় আসিনি, আপনিই আমাকে টেনে এনে জড়িয়েছেন এসবের মধ্যে। নাকি ভুলে গেছেন? ভুয়া ওই মেসেজ ক্যাপসুলটা আমার হাতে তুলে দেয়ার জন্যে আমি সাধাসাধি করতে গিয়েছিলাম আপনাকে?’

দাঁত বের করে হাসল ভেরোনি, কুৎসিত দেখাল হাসিটা। ‘আপনি কেন এসেছেন এখানে?’ কথার মোড় ঘুরিয়ে দিল সে। ‘নিশ্চয়ই খামোকা প্লেন নামাননি আমার বাড়ির ওপর? আসলে মিশনটা কি?’

‘মিশনটা: কোরিন ম্যাকডেভিডকে উদ্ধার,’ ভারী গলায় বলল রানা।

‘মিথ্যে কথা।’ চাপা কর্কশ গলা ভেরোনির।

‘যা খুশি ভাবতে পারেন,’ হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গি করল রানা।

ভুরু কুঁচকে রানার দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল ভেরোনি। চটে উঠল হঠাৎ করেই। রানা সাবধান হবার আগেই চড় মারল, পর পর দুইবার। একবার হাতের তালু দিয়ে, একবার উল্টো পিঠ দিয়ে। পিছিয়ে যাবার চেষ্টা করল রানা, দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেল। জিভের ডগায় রক্তের স্বাদ অনুভব করল সে।

‘সাবমেরিন!’ চোখ বড় বড় হয়ে গেছে ভেরোনির। নিষ্প্রাণ কণ্ঠ। ‘সাবমেরিনটাকে খুঁজে পেয়েছ তুমি, আমার দু’জন লোককে খুন করেছ, ডিক্সনকে নিয়ে পালিয়ে গেছ। এখন আবার নতুন লোক নিয়ে উদ্ধার করতে এসেছ ওটাকে, তাই না?’

‘হতে পারে।’

হাঁ হয়ে গেল ভেরোনির মুখ। রানার আগমনের কারণটা বুঝতে পেরে স্তব্ধ হয়ে গেছে যেন সে।

চোখ বড় বড় হয়ে গেছে ডায়নারও। অবাক চোখে তাকিয়ে আছে রানার দিকে।

'আগেই তো বলেছি,' বলল রানা। 'সত্যি ছাড়া মিথ্যে বলব না। ঠিকই ধরেছ তুমি, ভেরোনি। নতুন লোকই নিয়ে এসেছি। নেভির দক্ষ কিছু সাবমেরিনার, স্করপিয়নকে তুলে নিয়ে যাবে ওরা। আমরা অনেকক্ষণ কথা বলেছি এখানে, এতক্ষণে স্করপিয়নকে তুলে ফেলেছে ওরা।' ঘড়ি দেখল রানা। ভোর পাঁচটা বাজতে এগারো মিনিট বাকি। 'দক্ষিণে কমপক্ষে বিশ মাইল দূরে চলে গেছে এখন ওটা।' হাসল রানা। একটু থেমে আবার বলল, 'যুদ্ধের ধারাই এই—জয় একবার এর পক্ষে, এক বার ওর পক্ষে। এতে অবাক হবার কিছু নেই। কিন্তু তুমি অবাক হয়েছ। ভেবেছিলে চিরকাল তোমার নারকীয়তা চালিয়ে যেতে পারবে? শেষ হয়ে গেছ, ভেরোনি, তোমার সব শেষ। যেদিন রফিককে খুন করেছ সেই দিন; না, ভুল বললাম, যেদিন তুরাগের গায়ে হাত দিয়েছ—সেইদিনই শেষ হয়ে গেছ তুমি। যাক, আর বেশি সময় আমাদের কারও হাতেই নেই, ঠিক সাড়ে দশ মিনিট পর ফ্রিগেট সাইক্লপস্ থেকে উড়ে আসবে একটা নিউক্লিয়ার মিসাইল। ধ্বংস হয়ে যাবে এই ডুবো পাহাড়। দশমিনিটের মধ্যে মারা যাচ্ছি আমরা সবাই।'

'কোন কিছু দিয়েই এই দেয়াল ভাঙা যাবে না,' শান্ত গলায় বলল ভেরোনি। নিজেকে সামলে নিয়েছে আবার। 'চারদিকে দেখছ না, মেজর? গ্র্যানাইটের দেয়াল, শক্ত কোয়ার্জটাইপ গ্র্যানাইট। ঢালাই কংক্রিটের চেয়েও অনেক বেশি শক্ত।'

মাথা নাড়াল রানা। 'তাতে কোন লাভ হবে না। শুধু একটা ফাটল, ছোট্ট একটা ফাটল ধরলেই যথেষ্ট। শক্ত ওই দেয়ালকে ডিমের খোসার মত ফাটিয়ে, ভেঙে গুঁড়ো করে ফেলবে লক্ষ লক্ষ টন পানির প্রচণ্ড চাপ। শ্বাস বন্ধ হয়ে মরার আগেই চিঁড়ে চ্যাপ্টা হয়ে যাব আমরা।'

'সব দিকেই হিসেব ঠিক আছে দেখছি!' বলল ভেরোনি। 'ঠিকই বলেছ। কিন্তু আমি বলছি, মিসাইল ছোঁড়াই হবে না। যতক্ষণ তুমি, এই বাঁদর আর কোরিন রয়েছে এখানে, কোন মিসাইল ছোঁড়া হবে না।'

'ভুল। আদেশটা এসেছে ওয়াশিংটন থেকে, পেন্টাগনের জয়েন্ট চীফদের কাছ থেকে—কোরিনের বাপের কাছ থেকে নয়। তাছাড়া ছোট করে দেখছ তুমি অ্যাডমিরাল ম্যাকডেভিডকে। ডিসিপ্লিন তাঁর কাছে অনেক বড়, আমার কিংবা তাঁর মেয়ের প্রাণের চেয়েও। হাওয়াইয়ান ভোরটেক্স ধ্বংস হয়ে যাবার আগে কাউকে কোরিনের কথা বলবেন না তিনি। পেন্টাগনের আদেশ: হাইপারিয়ন মিসাইল মেরে গুঁড়িয়ে দিতে হবে স্করপিয়ন, সেইসাথে আশেপাশের আর যা কিছু ধ্বংস হয় হোক।'

'কেন? স্করপিয়ন কি দোষ করল যে তাকে ধ্বংস করে দিতে হবে?'

'ওদের ভয়, তুমি লঞ্চিং সিকোয়েন্স কম্পিউট করে স্করপিয়নের ত্রিশটা মিসাইল দেগে পৃথিবীর যে-কোন ত্রিশটা রাজধানী খতম করে দিতে পারো। কাজেই

তোমাকে শায়েস্তা করার আগে ওটাকে নষ্ট করা দরকার। কিন্তু আমি সেটা হতে দিতে পারি না। তাহলে বাংলাদেশের সাধের এস. এস. তুরাগও খতম হয়ে যাবে। কাজেই আমি প্ল্যান দিলাম: ভোর চারটের মধ্যে মাউই দ্বীপের ট্রান্সমিটার দখল করে নিক নেভি, সাড়ে চারটের দিকে ওয়্যারলেসে ফ্রিগেট সাইক্লপস্‌কে জানানো হোক—স্করপিয়নের পজিশনে ভুল ছিল, আসল পজিশন আগের জায়গা থেকে হাজার ফুট উত্তরে।'

'তাতে কি হবে? মাউই দ্বীপের…'

'ট্রান্সমিটার দখল করা হয়েছে যাতে তোমরা সাইক্লপস্‌কে পাঠানো মেসেজ চেপে দিতে না পারো।'

'ও!' মাথা ঝাঁকাল ভেরোনি। বুঝতে পারছে এতক্ষণে।

'আর টার্গেট এরিয়া হাজার ফুট উত্তরে সরিয়ে দেয়া হয়েছে যাতে বোমাটা পড়ে পাহাড়ের উত্তর ঢালে, যাতে ক্ষতি না হয় স্করপিয়ন বা এস. এস. তুরাগের। ক্লিয়ার? ঠিক পাঁচটায় যে বোম পড়বে তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

শান্তভাবটা মুছে গেছে দানবের চেহারা থেকে। ভীতি আর অনিশ্চয়তার ছাপ দেখল রানা সেখানে। পরিষ্কার বুঝতে পারছে, রানার কথায় যুক্তি আছে, তবু গায়ের জোরে বলল, 'এসব তোমার কথার কথা। কিছু প্রমাণ করতে পারবে না।'

শেষ কার্ডটা ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিল রানা। আর মাত্র নয় মিনিট। হয় এখন, নয়তো আর কখনোই না।

'অবশ্যই পারব,' বলল সে। 'তোমার রেডিও ফ্যাসিলিটি চেক করে দেখোগে। বুঝতে পারবে, মাউইয়ে বসানো তোমার রেডিও ট্রান্সমিটার ইউনাইটেড স্টেটস মেরিনের হাতে চলে গেছে। শুনবে, গত পঞ্চাশ মিনিট ধরে তোমার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছেন অ্যাডমিরাল ম্যাকডেভিড। তোমাকে সারেন্ডার করতে বলবেন তিনি।'

বলেই বুঝল রানা, চালে ভুল করেছে। যা আশা করেছিল, তেমন প্রতিক্রিয়া ঘটল না ভেরোনির মাঝে। রেডিও ট্রান্সমিটারের কাছে ছুটে গেল না সে, গার্ড দু'জনকে কায়দা করে ফেলার কোন সুযোগও দিল না রানাকে।

এক মুহূর্ত শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ভেরোনি। ধীরে ধীরে হাসি ফুটল মুখে। শব্দ করে হেসে উঠল।

'বোকা,' হাসির ফাঁকে শব্দটা উচ্চারণ করল ভেরোনি। হাসি থামিয়ে বলল, 'তোমার ধাপ্পা কাজে লাগল না, রানা। নিজেকে যতটা ভাব, তত চালাক আসলে নও তুমি। একটা কথা তোমার, কিংবা অ্যাডমিরাল ম্যাকডেভিড, কিংবা কমান্ডার টার্নার, কারও মাথায় আসেনি যে মাউইয়ের ট্রান্সমিটার এখন আর আমার সম্পত্তি নয়। বেচে দিয়েছি ওটা আমি, আশেপাশের জায়গা জমি সুদ্ধ পুরো এলাকাটাই বিক্রি করে দিয়েছি ছয় সপ্তাহ আগে। রাশানদের একজন এজেন্টের কাছে। তোমাদের ট্রান্সমিশনে আমি বাধা দিইনি, দিয়েছে ওরা। প্রশান্ত মহাসাগরের কোথাও ইউ. এস. নেভির একটা হেডকোয়ার্টারের কাছে-পিঠে একটা রেডিও

স্টেশনের স্বপ্ন অনেকদিন ধরেই দেখছিল ওরা। তাছাড়া, হান্ড্রেড অ্যান্ড ফার্স্টের মেসেজ ধরে, স্করপিয়নের পজিশন জানতে চাওয়াটা তো স্বাভাবিক। রাশ্যানদের ধারণাই নেই, রেডিও স্টেশন যাদের কাছ থেকে কিনেছে, সাবমেরিনটাও তাদেরই দখলে।' হাসি হাসি মুখে রানার দিকে তাকাল ভেরোনি। যেন এতক্ষণ খেলাচ্ছিল তাকে রানা, এখন উল্টে গেছে দাবার ছক। 'আমাকে এসব শুনিয়ে শেষ মুহূর্তে বেঁচে যাবে ভেবে থাকলে, হতাশ হতে হচ্ছে তোমাকে। অ্যাডমিরাল ম্যাকডেভিডের কাছ থেকে কোন মেসেজ আসবে না। এমনিতেই আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি। আগামী কালই আমার দলের সবাই চলে যাবে এখান থেকে, নতুন ঘাঁটিতে। আমার এখানকার সমস্ত কম্যুনিকেশন ইকুইপমেন্ট খুলে ফেলা হয়েছে, যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন। পার্ল হারবার থেকে রেডিওতে যোগাযোগের কোন প্রশ্নই ওঠে না।'

জবাব দিল না রানা। স্থির দাঁড়িয়ে রইল। অসুস্থ দেখাচ্ছে তাকে। পরাজিত।

'মাত্র অর্ধেকটা বলেছি,' দাঁত বের করে হাসল ভেরোনি। 'স্করপিয়ন এখান থেকে বিশ মাইল দূরে চলে গেছে, না? সত্যি বলছি, তোমার মত মিথ্যেবাদী লোক জীবনে দেখিনি আমি।' রানার অস্বস্তি দেখে দারুণ মজা পাচ্ছে সে। 'একটা কথা ঠিকই বলেছ তুমি, সাবমেরিনটাকে অপারেট করার লোক নেই আমার। তবে, ওটার ব্যালাস্ট সিসটেম কেমন হবে, ধারণা করতে অসুবিধে হয়নি। এতক্ষণে তোমার লোকেরা ওটার সমস্ত ব্যালাস্ট ট্যাংক খালি করে ফেলেছে হয়তো, কিন্তু উঠবে না স্করপিয়ন। মেজর স্যালভেজ অপারেশন ছাড়া ওটাকে বালি থেকে তুলে আনা এখন অসম্ভব। মাসের পর মাস বালিতে থেকেছে ওটা; খোলসের চারপাশে প্রচণ্ড সাকশন তৈরি হয়েছে। ওই সাকশন নিজের এঞ্জিনের জোরে কিছুতেই ছাড়াতে পারবে না স্করপিয়ন। এসব ব্যাপারে বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে আমার, জানি আমি। তাছাড়া আসল কথা, তোমার লোকেরা এতক্ষণে খতম হয়ে গেছে। আমার সেরা সাতজন লোক রয়েছে সাবমেরিনের ভেতরে। আমি জানি, ইউ. এস. নেভি সহজে হাল ছেড়ে দেয়ার পাত্র নয়। সাবমেরিনটাকে তুলে নেয়ার জন্যে আবার লোক পাঠাবে ওরা। তাই পিকারিং ফিরে যাবার পরপরই সাতজনকে স্করপিয়নে পাঠিয়ে দিয়েছি আমি। ওরা খুনী, মানুষ খুন করতে ভালবাসে। তোমার এঞ্জিনিয়াররা ওদের সামনে পাঁচ মিনিটও টিকতে পারবে না।'

লাফ দিল রানা। বদমাশ লোকটার দাঁতগুলো ভেঙে দেয়ার ইচ্ছে। প্রচণ্ড জোরে ঘুসি মারার জন্যে হাত বাড়াল। কিন্তু তার আগেই তপ্ত সীসা বর্ষণ করল একজন গার্ডের হাতের নিঃশব্দ প্রোজেক্টাইল গান। প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেলো রানা পিঠে, ধাক্কা মেরে যেন ফেলে দিল তাকে কেউ পাশের দেয়ালে। আস্তে করে ভাঁজ হয়ে গেল পা। পাথুরে মেঝেতে পড়ে গেল সে।

ঠিক এইসময় উল্টো দিকের দরজার কাছ থেকে গর্জন শোনা গেল, 'খবরদার!'

স্লো মোশন ছায়াছবি দেখছে যেন রানা। দরজার দিকে ঘুরে গেল তার চোখ, ঘরের সবকজনের দৃষ্টিই দরজার দিকে। হাতে পিস্তল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন এক বৃদ্ধ। মাথাভর্তি উস্কখুসক্ক পাকা চুল। চোখে ভারী পাওয়ারের চশমা। বেঁটেখাটো

লোকটার মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। পরনের কাপড়ে অসংখ্য ভাঁজ, দীর্ঘদিন ইস্তিরি হয়নি।

'বাবা!' একটা শব্দই শুধু বেরোল ডায়নার মুখ থেকে।

ইনিই তাহলে ডক্টর গ্র্যাহাম, বিখ্যাত সেই সার্জন, ভাবল রানা।

'আপনি এখানে কেন, ডক্টর?' শান্ত গলায় বলল ভেরোনি। 'যান, আপনার কাজে যান।'

'এতদিন এমনি একটা সুযোগের অপেক্ষা করছিলাম আমি, ভেরোনি,' দাঁতে দাঁত চাপালেন বৃদ্ধ। 'বেকায়দায় ফেলে এত বছর ধরে অনেক কষ্ট দিয়েছ তুমি আমাদের। আর নয়, আজ এর শেষ দেখব আমি...' ভেরোনির দিকে পিস্তলের নল ঘুরে গেল।

গার্ডের দিকে তাকাল ভেরোনি। চোখের পাতা একটু উঠল-নামল।

'ড-ক্ট-র!' চেঁচিয়ে উঠে গ্র্যাহামকে হুঁশিয়ার করার চেষ্টা করল রানা। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। নিঃশব্দ অস্ত্র এবার মৃত্যু উদগীরণ করেছে। ডক্টরের ঠিক কপালে ফুটো দেখা দিল। ছিটকে পেছনে পড়ে গেলেন তিনি। হাত থেকে উড়ে গেল পিস্তল।

তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার বেরিয়ে এল ডায়নার মুখ থেকে। চোখে একরাশ অবিশ্বাস নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে এক মুহূর্ত। পরক্ষণেই ছুটে গেল হাত-পা ছাড়িয়ে পড়ে যাওয়া দেহটার দিকে।

রানার দিকে তাকাল গিলটি মিঞা। চোখের পাতা একচুল উঠল-নামল। একই কায়দায় সায় দিল রানাও।

বাপের লাশের ওপর নিঃশব্দ কান্নায় ভেঙে পড়েছে ডায়না। সেদিকে একবার তাকাল রানা, চোখ ফিরিয়ে তাকাল ভেরোনির দিকে। 'একটা লড়াই তুমি জিতলে, ভেরোনি,' দাঁতে দাঁত চাপল রানা। 'কিন্তু যুদ্ধজয় করতে পারোনি এখনও।'

'আবার ভুল কথা বললে, মেজর। আমি যুদ্ধেই জিতেছি। আগাগোড়া পুরোটাই জিতেছি। ভাগ্যই যেন আমার কাছে ঠেলে দিয়েছে স্করপিয়নকে। ওটা বিক্রিও সারা। ক্রেতার হাতে তুলে দিতে পারলেই আমার এদিকের কাজ শেষ। সব ক'টা জাহাজ বেচে দেব। অন্য কোন ব্যবসা ফেঁদে বসব।...হাইপারিয়ন মিসাইলগুলো নিয়ে কিছুদিন খুব আনন্দেই কাটবে ওগুলোর নতুন মালিকের, কি বল?'

'নিউক্লিয়ার ব্ল্যাকমেইল!' মুখে জমে থাকা থুথু ফেলল রানা। 'তুমি পাগল!'

'নিউক্লিয়ার ব্ল্যাকমেইল? আরে মেজর, এমন কথা তোমার মাথায় এল? ওসব তো গল্পকাহিনীর ব্যাপার। নিউক্লিয়ার ব্ল্যাকমেইল করে, বৃহৎ শক্তিগুলোর মাঝে আতঙ্ক জাগিয়ে নিউক্লিয়ার হলোকস্ট ঘটাব নাকি? না বাবা, ওসব নিয়ে মাথা ঘামাই না আমি। আমার দরকার টাকা।'

দেয়ালে হেলান দিয়ে নিজেকে সোজা করে বসাল রানা। ডানহাতে চেপে ধরে রেখেছে আহত জায়গা। 'টাকা দিয়ে স্করপিয়নের মত এত বড় বিপদ কে

কিনবে? রাশিয়া? চীন?'

'ভেবেছিলাম অস্ত্রসহ কোন আরব রাষ্ট্রের কাছে সাবমেরিনটা বেচে দেব। যত টাকাই চাই না কেন, দিতে রাজি হবে ওরা; কারণ তাহলে ইসরায়েলকে ঠাণ্ডা করতে বিশেষ বেগ পেতে হবে না ওদের। কিন্তু মজার ব্যাপার কি জানো? কে সবচেয়ে বেশি টাকা অফার করল শুনলে অবাক হয়ে যাবে। ইসরায়েল!-অর্ধেক পেমেন্টও দিয়ে দিয়েছে!'

'তুমি পাগল!' একই কথা আবার বলল রানা। 'বদ্ধ পাগল!'

'আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না, না?' ডেস্কের ওপাশে গিয়ে ইন্টারকম রিসিভার তুলল ভেরোনি। 'মিনি সাবটাকে রেডি করো। পাঁচ মিনিটের ভেতর আসছি আমি।' রানার দিকে ফিরল সে। 'স্করপিয়নে যাচ্ছি আমি। সাবমেরিনারদের কেউ বেঁচে থাকলে তোমার মৃত্যুসংবাদ জানাব।'

'খামোকা সময় নষ্ট করবে,' তিক্ত কণ্ঠে বলল রানা।

'মোটেই না,' দৃঢ় গলায় বলল ভেরোনি। 'যেখানে ফেলে রেখেছি আমি জানি সেখানেই আছে স্করপিয়ন। একশো আশি ফুট পানির তলায়।'

'স্করপিয়নকে দখল করতে পারবে না তুমি। তুলতে না পারলে ওটাকে ধ্বংস করে রেখে যাবে আমেরিকান নেভি।'

'আগামীকাল এই সময়ে আর কিছুই বলার কিংবা করার থাকবে না আমেরিকান নেভির। সাবমেরিনটাকে তোলার জন্যে পৌঁছে যাবে একটা ইসরায়েলী স্যালভেজ ফ্লীট। এই এলাকাটা ইন্টারন্যাশনাল ওয়াটার। কারও বাপের সাধ্য নেই কিছু বলে। নেভি যদি কিছু করতে চায়ও, জোর বাধা আসবে স্টেট ডিপার্টমেন্ট থেকে। একটাই উপায় থাকবে আমেরিকানদের জন্যে, সাবমেরিনটা ফেরত দেবার অনুরোধ জানাবে ওরা। কিন্তু আমার বিশ্বাস ফেরত দেবার জন্যে এত টাকা দিয়ে কিনছে না ওটা ইসরায়েল। আশি লক্ষ ব্রিটিশ পাউন্ড। অর্ধেক পেয়ে গেছি, বাকিটুকু সুইস ব্যাংকে জমা হয়ে গেলেই ওদেরকে জায়গা চিনিয়ে দিয়ে আমার পথে আমি চলে যাব।'

'এই ডুবো পাহাড় ছেড়ে তুমি কোথাও যাবার সুযোগ পাবে না,' তীব্র ঘৃণা ঝরল রানার কণ্ঠে। 'বিশ্বাস করো, আগামী পাঁচ মিনিটের ভেতরেই মারা যাচ্ছ তুমি।'

রানার চোখের দিকে তাকাল ভেরোনি। ভয়ঙ্কর শীতল কঠিন এক জোড়া চোখ আগুন ঝরাচ্ছে যেন তার দিকে। তোয়াক্কা করল না ভেরোনি। 'তাই, না? তাহলে মারাই যাচ্ছি?' যেন একটা তুচ্ছ কীট রানা, এমন ভাব দেখিয়ে ঘুরে দরজার দিকে রওনা দিল সে। দরজার কাছে গিয়ে আবার ফিরে চাইল। 'চলি। মিনিট পাঁচেক পর দেখা হবে পরলোকে। টাটা, বাই বাই।' গার্ডদের দিকে তাকাল সে। 'ডেথ চেম্বারে নিয়ে গিয়ে শেষ করে দাও।'

'এই তোমার শেষ কথা?' জানতে চাইল রানা।

'হ্যাঁ,' শয়তানী হাসি ফুটল ভেরোনির ঠোঁটে। 'গুডবাই, মেজর রানা। অনেক মজা করা গেল তোমাদের নিয়ে! ধন্যবাদ।' বেরিয়ে গেল সে।

ভেরোনির পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল। নীরবতা।
ভোর পাঁচটা বাজতে আর মাত্র চার মিনিট বাকি।

নয়

গুঙিয়ে উঠল গিলটি মিঞা। ঘড় ঘড় শব্দ বেরোচ্ছে গলা থেকে। মণি কপালের দিকে উঠে গেছে, দেখা যাচ্ছে শুধু চোখের সাদা অংশ। গলা আঁকড়ে ধরল দু'হাতে, বাতাসের জন্যে হাঁসফাঁস করছে যেন। কাউচ থেকে ঢলে মেঝেতে পড়ে গেল সে।

ইচ্ছে করেই যতক্ষণ পারল দম বন্ধ করে রাখল গিলটি মিঞা। এই মুহূর্তের জন্যেই থুতু জমিয়ে রেখেছিল মুখের ভেতর, শ্বাসকষ্টের অভিনয়ের সময় ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে ছিটকে বেরোতে লাগল থুতু। চমৎকার অভিনয়। রানাও অবাক হয়ে গেল। গিলটি মিঞার কাছ থেকে এতটা আশা করেনি।

অবাক হয়ে গেল গার্ড দু'জনও। এগিয়ে গেল ওরা, পিস্তলের নিশানা রানার দিকেই রইল। বগলের তলায় হাত দিয়ে গিলটি মিঞাকে তুলল। ওদের হাতে ঝুলে রইল ছোট্ট দেহটা। রানাকে এগিয়ে যাবার ইশারা করে গিলটি মিঞাকে ঝুলিয়ে নিয়ে রওনা হলো পেছন পেছন।

ডায়নার কাছে এসে দাঁড়াল রানা। বোবার মত বাপের মরা মুখের দিকে তাকিয়ে বসে আছে মেয়েটা। চটচটে রক্ত রানার হাতের তালুতে, কাঁধের ক্ষত চেপে ধরায় লেগেছে। হাতটা আলতো করে ডায়নার কাঁধে রাখল সে। নরম গলায় ডাকল, 'ডায়না।'

ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকাল ডায়না। রক্তশূন্য ফ্যাকাসে মুখ, কিন্তু ধূসর দুই চোখের তারায় আগুন। চোখের কোণে পানি।

'চোখের পানি মুছে ফেলো, ডিনা। যা ঘটে গেছে তা আর ফেরানো যাবে না। এখানে থেকে আর লাভ নেই। এসো আমার সঙ্গে।'

রানার মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবল ডায়না এক মুহূর্ত। ক্ষণিকের জন্যে একটা ঝিলিক খেলে গেল চোখের তারায়। গার্ড দু'জনের দিকে তাকাল একবার। তারপর আবার ফিরল বাপের দিকে। হাত বাড়িয়ে আস্তে করে বুজিয়ে দিল ডক্টরের আধখোলা চোখের পাতা। তারপর হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখের পানি মুছে উঠে দাঁড়াল। 'চলো।'

পাথর খুঁড়ে তৈরি একটা লম্বা করিডরে এসে পড়ল ওরা। আলোকিত করিডরের দু'পাশে অনেকগুলো দরজা। এগিয়ে চলল ওরা। করিডর পেরিয়ে শিগ্গিরই আরেক লেভেলে চলে এল। সিঁড়ি নেই। করিডরটাই ঢালু হয়ে উঠে এসে ঠেকেছে এই সমতলে।

পাশ দিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ ডায়নার গা ঘেঁষে এল রানা। একটু অবাক হলো মেয়েটা। চোখ তুলে তাকাল রানার দিকে। পেছনে তাকাল রানা, একটু দূরেই আছে গার্ডেরা। গিলটি মিঞাকে বয়ে আনতে হচ্ছে। ফিসফিস করে বলল রানা, 'ডিনা, মুখটা ফেরাও তো। চুমু খাব।'

বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে গেল ডায়নার চোখ। কিছু একটা বলতে গিয়েও রানার চোখের দিকে তাকিয়ে থেমে গেল। বুঝল। মুখ তুলল আস্তে করে।

আবার পেছনে তাকাল রানা। কাছে এসে গেছে গার্ডেরা। ঠোঁট নামিয়ে আলতো করে চুমু খেলো ডায়নার ঠোঁটে।

কাণ্ড দেখে ক্ষণিকের জন্যে তাজ্জব হয়ে গেল দুই গার্ড। সতর্কতায় ঢিল পড়ল। স্প্রিংয়ের মত লাফিয়ে উঠল গিলটি মিঞার ছোট্ট দেহটা। দুই হাত ছড়িয়ে থাবা মারল দু'জনের পিস্তল ধরা হাতে। ধাক্কা খেয়ে দু'দিকে সরে গেল পিস্তল ধরা হাত দুটো। একজনের হাত থেকে পিস্তলটা পড়েই গেল। অন্য জনের হাত থেকেও পড়ে যাচ্ছিল, কিন্তু সময়মত হাতের মুঠো শক্ত করে ফেলল সে।

বিদ্যুৎ খেলে গেল রানার শরীরে। এক লাফে পিস্তল ধরা লোকটার কাছে চলে এল সে। ভাল ডান হাত দিয়ে কারাতের কোপ মারল লোকটার কনুই থেকে একটু নিচের নার্ভ সেন্টারে। অস্ফুট একটা শব্দ বেরোল লোকটার মুখ দিয়ে। হাত থেকে ছিটকে পড়ে গেল পিস্তল। পরমুহূর্তে দড়াম করে লাথি খেলো সে দু'পায়ের ফাঁকে। চেঁচানোর ভঙ্গিতে হাঁ হয়ে গেল মুখ। কিন্তু স্বর বেরোল না গলা দিয়ে। পা-দুটো ভাঁজ হয়ে যাচ্ছে। দড়াম করে মাটিতে আছড়ে পড়ল লোকটা।

ফিরে চাইল রানা। পড়ে যাওয়া অস্ত্র আবার কুড়িয়ে নিয়েছে দ্বিতীয় লোকটা। কিন্তু নিশানা করতে পারছে না কোনদিকেই, তার হাত ধরে প্রায় ঝুলে পড়েছে গিলটি মিঞা। অন্য হাতে গিলটি মিঞার ঘাড়ে-মুখে দমাদম কিল মারছে লোকটা, তবু কিছুতেই ছাড়াতে পারছে না তাকে।

দুই লাফে কাছে চলে এল রানা। পেছন থেকে প্রচণ্ড এক রদ্দা লাগাল লোকটার ঘাড়ে। আচমকা স্থির হয়ে গেল লোকটার দেহ, এক মুহূর্তের জন্যে। পরক্ষণেই টলে উঠে পড়ে যেতে লাগল। তার হাত ছেড়ে দিয়ে লাফিয়ে সরে দাঁড়াল গিলটি মিঞা। পড়ে গেল লোকটা। অজ্ঞান।

লোকটার পাছায় কষে এক লাথি লাগাল গিলটি মিঞা। মেরেই জখমে ব্যথা পেয়ে 'উফ্' করে উঠল।

'খুব সময় মত কাজ সেরেছ, গিলটি মিঞা,' বলল রানা।

দাঁত বেরিয়ে পড়ল গিলটি মিঞার। কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই ডায়নার দিকে ফিরল রানা। বাম হাতটা অবশ, ঝুলে আছে কাঁধের কাছ থেকে। ডায়নাকে বলল, 'চলো, পথ দেখাও।'

ধীরে ধীরে মুখ তুলল ডায়না। কপালের ওপর থেকে সরিয়ে দিল এক গোছা লাল চুল, অদ্ভুত এক চোখে তাকাল রানার দিকে। হঠাৎই ঝাঁপিয়ে পড়ল রানার বুকে। ভেঙে পড়ল অঝোর কান্নায়।

কয়েক সেকেন্ডের বেশি সময় দিতে পারল না রানা। জোর করে ডায়নার মুখ

তুলল। 'ডিনা, শান্ত হও।…চলো, জলদি চলো, এখান থেকে বেরিয়ে পড়তে হবে। সময় সত্যিই নেই। সত্যিই বোম পড়বে এখানে…চলো।'

আস্তে করে ঠেলে ডায়নাকে পেছনে সরিয়ে দিল সে। আলতো হাতে চোখ মুছিয়ে দিল মেয়েটার। জিজ্ঞেস করল, 'কোরিন কোথায়? ওকেও নিয়ে যেতে হবে।'

'আমার পাশের ঘরটায়…'

'চলো।'

রানার আহত কাঁধে হাত রাখল ডায়না। 'কিন্তু যাবে কি করে? তুমি আহত, তোমার বন্ধুর অবস্থাও তেমন সুবিধের নয়।'

ডায়নার কথা ঠিক বুঝতে পারল না গিলটি মিঞা। তার দিকে মেয়েটার তাকানোর ধরন দেখে কিছুটা অনুমান করে নিল। এখন রানাকে তার পায়ের দিকে তাকাতে দেখে হাসল। হাত নেড়ে বলল, 'না না, আমার কিচু হয়নি। আমি ঠিক আচি। এতোক্কন ভেঙচি মেরে ছিলুম…এই দেকুন না দিব্বি হাঁটতে পারি আমি…' হেঁটে প্রমাণ করল, সত্যিই 'তেমন কিচু' হয়নি তার। খোঁড়াচ্ছে, কিন্তু হাঁটতে পারছে।

'এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে মরতে হবে,' ডায়নাকে তাড়া দিল রানা। 'চলো চলো…'

'চলো…।'

আগে আগে হাঁটছে ডায়না। তাকে অনুসরণ করছে রানা এবং গিলটি মিঞা। ঠাণ্ডা আবহাওয়াতেও ঘামছে রানা। স্রোতের কবলে পড়ে বাম হাতে আঘাত লেগেছিল, গুলি খেয়েছে বাম পিঠেই। কোন্ ক্ষতটা বেশি যন্ত্রণা দেবে, তারই প্রতিযোগিতা চলছে যেন এখন।

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল ডায়না। সামনে, ওদের প্যাসেজকে আড়াআড়ি পেরিয়ে চলে গেছে আরেকটা প্যাসেজ। সেই প্যাসেজে পায়ের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি গিলটি মিঞাকে টেনে পাশের একটা দরজার গা ঘেঁষে দাঁড়াল রানা। ডায়নাকে চেনে এখানকার সবাই, ওকে দেখলে অবাক হবে না। সতর্কও হবে না হয়তো।

পাঁচ কি ছয় সেকেন্ড লাগল, দুই প্যাসেজের সঙ্গমস্থলে এসে গেল পায়ের আওয়াজ। সামনে সামান্য বাঁক, লোকটাকে দেখতে পেল না রানা। কপাল বেয়ে ঘাম ঝরছে। লোকটা মোড় নিয়ে এদিকে আসবে? হাতে প্রোজেক্টাইল গান রয়েছে? কিন্তু না, এল না লোকটা। আড়াআড়ি প্যাসেজ ধরে এগিয়ে গেল সে। আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল পায়ের আওয়াজ।

'এসো,' হাত নেড়ে মৃদু গলায় ডাকল ডায়না। 'চলে গেছে।'

আবার চলতে লাগল ওরা। বার বার হাত ঘড়ি দেখছে রানা। দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে সময়। ঠিক পাঁচটায় মিসাইল ছুঁড়বে সাইক্লপস্। কয় সেকেন্ড পর পৌঁছবে এখানে?

গায়ে জোর পাচ্ছে না রানা। চলতে চলতে হাঁপাচ্ছে। গিলটি মিঞার অবস্থা

আরও কাহিল। খুঁড়িয়ে হাঁটছে, তাড়াতাড়ি করতে পারছে না। পিছিয়ে পড়ছে বার বার।

শেষ পর্যন্ত একটা দরজার সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। ঠেলা দিয়ে পাল্লা খুলল ডায়না। অন্য দু'জনকে ঢুকতে ইঙ্গিত করে ঢুকে গেল ভেতরে।

ওপাশের দেয়াল ঘেঁষে পাতা বিশাল এক খাটে শুয়ে ঘুমোচ্ছে কোরিন। গলা পর্যন্ত চাদর টানা।

এগিয়ে গিয়ে কোরিনকে ধাক্কা দিল ডায়না। 'কোরিন, জলদি! জলদি ওঠো!'

গুঙিয়ে উঠল কোরিন। নড়েচড়ে উঠল। কিন্তু ঘুম ভাঙার তেমন কোন লক্ষণ দেখা গেল না তার মাঝে।

আর ডাকাডাকি করল না ডায়না। সাঁৎ করে টান মেরে কোরিনের গায়ের ওপর থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিল চাদরটা। হাত ধরে টেনে কোরিনের উলঙ্গ শরীরটা নামিয়ে আনল বিছানা থেকে।

ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইল রানা। জিভে কামড় দিয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলল গিলটি মিঞা। ঘুরে গেল অন্য দিকে।

ঘুম ছুটে গেছে কোরিনের চোখ থেকে। হাঁ করে তাকিয়ে আছে রানার দিকে। নিজে যে ন্যাংটো, ভুলেই গেছে যেন। এক মুহূর্ত স্থির দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ছুটে এল রানার দিকে, নিজের নগ্নতা ঢাকার কোন চেষ্টা করল না।

'রানা! তোমার এই অবস্থা কেন!···সারা গায়ে রক্ত!···এখানে ঢুকলে কি করে?' কাছে দাঁড়িয়ে রানার সারাদেহে চোখ বুলাতে বুলাতে বলল কোরিন।

'নিতে এসেছি তোমাকে। চলো, এক্ষুণি বেরিয়ে পড়তে হবে।'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল কোরিন। চোখে মুখে অবিশ্বাস। আস্তে করে বলল, 'অসম্ভব! এখান থেকে বেরোনোর কোন উপায় নেই! নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখছি আমি! রানা···সত্যিই তুমি···'

কথা শেষ হলো না কোরিনের। মেঘ গর্জনের মত গুড়ুগুড়ু আওয়াজ শোনা গেল মাথার ওপর। থরথর করে কেঁপে উঠল ঘরটা। ভূমিকম্প হচ্ছে যেন। বুঝতে পারল রানা, আঘাত হেনেছে হাইপারিয়ান মিসাইল। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল চারজন যার যার জায়গায়। ঘরে পর্দাগুলো দুলছে জোরে জোরে। টেবিলের জিনিসপত্র বিচিত্র শব্দ তুলে নাচছে।

'জলদি!' আচমকা চেঁচিয়ে উঠল রানা। 'জলদি বেরোও ঘর থেকে!'

অনিশ্চিত একটা ভাব ফুটল ডায়নার চেহারায়। 'আমি···আমি কোথায় যাব···'

'বেরোও, জলদি বেরোও' চেঁচিয়ে উঠল রানা। ওপরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'যে-কোন সময় ধসে পড়বে পাহাড়টা···' ধাক্কা মেরে দরজার দিকে ডায়নাকে রওনা করিয়ে দিল রানা।

চাদরটা কুড়িয়ে নিয়ে ডায়নার পেছন পেছন গেল কোরিন, গিলটি মিঞা আর রানা থাকল পাশাপাশি।

ডায়নার ঘরে সবে পা দিয়েছে রানা, কান ফাটানো প্রচণ্ড গর্জন শোনা গেল। শক ওয়েভের ভয়ঙ্কর ধাক্কায় মেঝেতে ছিটকে পড়ে গেল চারজনেই।

হাঁচড়েপাঁচড়ে কোনমতে উঠে পড়ল রানা। ব্যথা, ক্লান্তি ভুলে গেছে সব। বাঁ হাতে টান মেরে তুলে ফেলল কোরিনকে। ঠেলে পর্দার ওপাশে সাগরে বেরোনোর সুড়ঙ্গের দিকে ঠেলে দিল। ফিরে চাইল। উঠে বসেছে ডায়না। তাকেও হাত ধরে টেনে তুলল রানা। কোরিনের পেছনে ধাক্কা মেরে ওপাশে রওনা করিয়ে দিল। ঠিক এই সময় ভেঙে পড়তে লাগল ছাত।

ঝনঝন শব্দে দেয়ালের কাচ ভাঙল, গুঁড়া হয়ে ছড়িয়ে পড়ল মেঝেতে। ওপর থেকে পাথর আর পানি একসঙ্গে হুড়মুড়িয়ে নামল ঘরের ভেতর।

'গিলটি মিঞা!' পানি আর পাথর পড়ার শব্দকে ছাপিয়ে জোরে চেঁচিয়ে উঠল রানা।

'এই যে, আমি এখেনে, স্যার,' চেঁচিয়ে জবাব দিল গিলটি মিঞা। পাথরের তৈরি একটা টেবিলের তলা থেকে একটা হাত বের করে দিয়েছে সে, নাড়াচ্ছে। 'মাতার ওপর ইঁট পড়চে···ঠিক যেন ছাত্র-মিছিলের ঢিল, স্যার···'

'জলদি বেরিয়ে এসো!' ডাকল রানা। 'দেরি করলে বেরোতে পারবে না আর।'

বেরিয়ে এল গিলটি মিঞা।

সুড়ঙ্গ মুখের কাছে যখন পৌঁছল দু'জনে, হাঁটু পর্যন্ত উঠে এসেছে পানি। ছাত ভেঙে পানি নামছে, সুড়ঙ্গ দিয়ে গড়িয়ে নেমে যাচ্ছে নিচের দিকে। কোরিন এবং ডায়নাকে আর বলতে হয়নি, সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়েছে ওরা।

অন্ধকার। পানির ঠেলা। এগোতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে রানা। সামনে মেয়েদের কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। সুড়ঙ্গ এখানে সরু। জোরে নামতে গিয়ে দু'দিকের দেয়ালে বাড়ি মারছে পানির ধারা, ছিটকে উঠছে। মাথা নিচু করে চলতে গিয়ে নাকেমুখে নোনাপানি ঢুকে যাচ্ছে। রানার ঠিক পেছনেই রয়েছে গিলটি মিঞা। তারও নাকেমুখে ঢুকছে পানি, কাশির শব্দ শুনেই বুঝতে পারছে রানা।

আস্তে আস্তে বাড়ছে সুড়ঙ্গের প্রশস্ততা। পরিচিত সুড়ঙ্গ, তাই নানারকম বাধা সত্ত্বেও অন্য মাথায় পৌঁছে যেতে পারল ওরা শেষ পর্যন্ত। দেখতে পাচ্ছে, শিলাবৃষ্টির মত ঝরে পড়ছে ছোটবড় হলুদ ফসফরেসেন্ট পাথর। অনবরত পানি ছিটকে উঠছে ওপর দিকে। কিন্তু মেয়ে দু'জনকে দেখা যাচ্ছে না। সিঁড়িতে নেমে গেছে হয়তো ওরা।

আর একটু, খোদা, আর একটু। মনে মনে প্রার্থনা করল রানা। বিস্ফোরণের প্রথম ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠেছে ওরা, সুড়ঙ্গের মুখের কাছেও চলে এসেছে। এখন ডুব দিয়ে যদি গ্যালারিতে বেরিয়ে যেতে পারে, তাহলেই হলো। গ্যালারি থেকে খোলা সাগরে বেরোলে হাঙরের ভয় আছে, ঠিক, কিন্তু সেটা পরে দেখা যাবে। আপাতত যেভাবেই হোক এই গুহা থেকে বেরোনো দরকার।

সুড়ঙ্গের শেষ মাথায় চলে এল রানা। ডায়নাকে দেখতে পাচ্ছে। সিঁড়ির নিচের

দিকে দাঁড়িয়ে আছে। হলুদ আলোয় কেমন অদ্ভুত দেখাচ্ছে মেয়েটাকে। মনে হচ্ছে, এই পৃথিবীর কেউ নয় ও।

কোরিনকেও দেখতে পেল রানা। একটা মূর্তির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অর্ধ উলঙ্গ—কোমরটা জড়িয়েছে শুধু চাদর দিয়ে, ওপরটা খোলা। স্তব্ধ হয়ে গেল রানা দৃশ্যটা দেখে। হলুদ আলো, পাথরের তৈরি মাছ-মানুষ, অর্ধ-উলঙ্গ সুন্দরী যুবতী···অপূর্ব এক দৃশ্য। কিন্তু সৌন্দর্য উপভোগ করার সময় নয় এটা···

মুখ তুলে রানার দিকে তাকাল কোরিন। চোখে আতঙ্ক। 'রানা···দেরি হয়ে গেছে···।' বিড়বিড় করে বলল সে। 'আর বেরিয়ে যেতে পারব না···'

'কথা বলার সময় নেই।' চেঁচিয়ে কোরিনের কথায় বাধা দিল রানা। 'জলদি নামো পানিতে। এখানকার ছাতও ভেঙে পড়বে যে কোন···'

রানার কথা শেষ হলো না। থমকে গেল সে। ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে। অন্য মূর্তিটার ওপাশ থেকে বেরিয়ে এসেছে লোকটা। ডান হাতে বিশাল কোল্ট, রানার দিকেই তাক করা। ভেরোনি।

'পার্টি শেষ হবার আগেই ভাগছ?' কঠিন গলায় বলল ভেরোনি। চোখেমুখে তীব্র ঘৃণা ফুটেছে।

'অত কথা বলতে পারব না এখন,' হতাশ ভঙ্গিতে শ্রাগ করল রানা। বাধা দেয়ার সব ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে যেন শরীর। 'যা করার, করে ফেলো ঝটপট। আমাকে খুন করে মেয়ে দু'জনকে নিয়ে বেরিয়ে যাও। বাঁচতে দাও ওদের। দেরি কোরো না, তাহলে আর সময় পাবে না।'

'আমি ছাড়া আর কারও বাঁচার দরকার নেই, মেজর। ডায়নাকে সঙ্গে নেব ভেবেছিলাম, কিন্তু বুঝে ফেলেছি, তোমার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে ও; ও-ই তোমার হাতের বাঁধন খুলে দিয়েছিল হোটেলে। দল পাল্টেছে বলে ওর চোখের সামনে খুন করিয়েছি ওর বাপকে···এখন আর ওকে বিয়ে করার প্রশ্নই ওঠে না। একা যাব আমি।'

পরের কয়েকটা মুহূর্ত কেউ কোন কথা বলল না। প্রলয়কাণ্ড চলছে চারপাশে। পানিতে খসে পড়ছে পাথর, ঠুকুউম্-ছলাৎ আওয়াজ উঠছে। মাথার ওপরে, পাহাড়ের চূড়ার দিক থেকে গম্ভীর আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে, পানি ঢোকার আওয়াজ। আর বেশি দেরি নেই, দ্বিতীয়বার ধ্বংস হবে কানোলি। এবারে আর মানুষ বাস করার মত কোন জায়গা অবশিষ্ট থাকবে না। পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যাবে।

আচমকা গভীর ভোঁতা একটা শব্দ হলো মাথার ওপরে। ধসে পড়ল কোন একটা গুহা। কেঁপে উঠল আবার আশপাশটা। চমকে উঠল রানা, এই বুঝি গুলি করে বসল ভেরোনি। হয়তো করত, কিন্তু সময় পেল না। পেছনে, সুড়ঙ্গের ছাত ভেঙে পড়েছে। হিমবাহের মত সিঁড়ির ধাপ বেয়ে হড়হড় করে গড়িয়ে নেমে আসছে পাথরের প্রবাহ।

ধড়াস করে বুকের খাঁচায় প্রচণ্ড এক বাড়ি মারল রানার হৃৎপিণ্ড। লাফ দিল সে। ডায়নার কাছে চলে এসে জোরে ধাক্কা মারল তাকে। উড়ে গিয়ে নিচের পানিতে পড়ল ডায়না। পরক্ষণেই আবার ঝাঁপ দিল রানা। মূর্তিটার কাছ থেকে

একটু সরে এসেছিল কোরিন, তার ওপর গিয়ে পড়ল। নিজের দেহ দিয়ে আড়াল করে ফেলল কোরিনের অর্ধ-নগ্ন দেহটা।

আঘাত হানল পাথরের প্রবাহ। সিঁড়ির ধাপগুলোকে ঢেকে দিয়ে এগিয়ে গেল টনকে টন হলুদ আলোর পাথর। একটা মূর্তি দাঁড়িয়ে রইল, কিন্তু আরেকটার ওপর জোর চাপ পড়ল পাথরের। পড়ে গেল সেটা।

দাঁতে দাঁত চাপল রানা। শরীরের ওপর এসে পড়ছে অগুনতি পাথর, আঘাত হানছে যেখানে সেখানে। পিঠের এক পাশে আঘাত করল একটা বড়সড় পাথর, রানার মনে হলো পাঁজরের হাড় ভেঙে গেল একটা কি দুটো। মাথার চামড়া কেটে গেল আরেকটা পাথরের কোনা লেগে। গাল বেয়ে রক্ত নামল।

রানার তলায় আর্তনাদ করে উঠল কোরিন। ব্যথা নয়, ভয়ে চেঁচাচ্ছে।

সমানে আসছে পাথর। রানার পা ঢেকে গেল, কোমর পর্যন্ত উঠে এল পাথরের স্তূপ। আটকে ফেলছে তাকে ক্রমেই। তার আটকে যাওয়ার মানে, কোরিনেরও আটকা পড়া। পাথরের তলায় চাপা পড়ে মৃত্যু! বাহ্ কি চমৎকার!—ভাবল রানা।

এক মিনিট পেরিয়ে গেল। পাথর পড়া থেমে গেছে। স্তব্ধ নীরবতা। মাঝে মধ্যে একআধটা পাথর খসে পড়ছে এখানে ওখানে, শব্দ হচ্ছে, নীরবতা ভাঙছে; এছাড়া আর কোন আওয়াজ নেই। দেহের ওপর রানা, তার ওপর পাথরের ভার, সইতে পারছে না আর কোরিন। নড়েচড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। ফোঁপাচ্ছে আতঙ্কে।

আস্তে করে মাথা তুলল রানা। যতটা সম্ভব ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নিতে চাইছে চারদিকের অবস্থা। বাতাসে ধুলো উড়ছে, আলোবিচ্ছুরক ধুলো ধীরে ধীরে নামছে নিচের দিকে। উজ্জ্বল হলুদ হালকা একটা পর্দা যেন। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। মাথা নামিয়ে নিল রানা।

আর কয়েক মিনিট পর, বাতাসে ধুলোর স্তর পাতলা হয়ে এলে আবার মাথা তুলল রানা। পরিষ্কার নয়, তবে আবছাভাবে নজর চলছে এখন। একটা মূর্তি তেমনি দাঁড়িয়ে রয়েছে এখনও, তবে তলার দিকটা আর দেখা যাচ্ছে না। দ্বিতীয় মূর্তিটা পড়ে ভেঙে কয়েক টুকরো হয়ে গেছে। অন্যান্য পাথরের ভিড়েও চেনা যাচ্ছে ভাঙা কিছু টুকরোর আকৃতি।

ভাঙা টুকরোর তলা থেকে নড়ল যেন কিছু! চোখ সরু করে তাকিয়ে রইল রানা। কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না, ভাল হাতটা বের করে এনে চোখের ওপর জমে থাকা রক্ত মুছল, আবার তাকাল। গোল কি একটা নড়ছে। হঠাৎই বুঝে গেল রানা। ধীরে ধীরে এদিকে ফিরছে ভেরোনির মুখটা, হলুদ চোখ দুটো তাকিয়ে আছে এখন সোজা তার দিকেই।

ভাঙা মূর্তির তলায় চাপা পড়ে গেছে ভেরোনির বিশাল দেহটা। পাথরের স্তূপের ওপর শুধু মাথা আর কাঁধটাই দেখা যাচ্ছে। মুখ দিয়ে ভলকে ভলকে রক্ত বেরোচ্ছে, কিন্তু খেয়ালই করছে না যেন ভেরোনি। রানার মনে হলো, তাকে চিনতে পেরে হলুদ চোখের পাতা একটু কাছাকাছি হলো, তীব্র ঘৃণায় বিকৃত হয়ে গেল চেহারা।

বাতাসে আরও পাতলা হয়ে এল ধুলো। দু'জনে একই সঙ্গে দেখতে পেল কোল্টটাকে। ভেরোনির মাথা থেকে ফুট চারেক দূরে পাথরের স্তূপ থেকে বেরিয়ে আছে নীলচে নল।

একটা হাত বের করে এনেছে ভেরোনি। ধীরে ধীরে কোল্টের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে হাতটা। নিজের অসহায়ত্বকে গাল দিল রানা। পাথরের স্তূপের ভেতর থেকে বেরোতে পারছে না সে। কয়েকবার জোরাজুরি করল, পাথরের তলা থেকে পা দুটো বের করে আনার চেষ্টা চালাল। পারল না। হাত বাড়িয়ে দেখল পিস্তলটা তার নাগালের বাইরে, পাঁচ ফুট দূরে রয়েছে। এইটুকু পরিশ্রমেই হাঁপিয়ে উঠেছে সে, শব্দ করে বাতাস বেরোচ্ছে দাঁতের ফাঁক দিয়ে।

পিস্তলটা হাতে পাবার জোর চেষ্টা চালাচ্ছে ভেরোনি। ঘামে চকচক করছে মুখ। হাতটা পুরো বাড়ানো হয়ে গেছে, কিন্তু পিস্তলটা এখনও ছয় ইঞ্চি তফাতে। জোরে কাঁধ ঝাড়া দিল সে। ঠেলে শরীরটাকে আর একটু বাড়ানোর চেষ্টা করল। ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগিয়ে আসছে হাতের আঙুল। পিস্তলের নল ছুঁলো,... আরেকটু...ব্যস, পিস্তলের নলটা ধরে ফেলল ভেরোনি।

দুই আঙুলে পিস্তলের নল চেপে ধরে নিজের দিকে টানল ভেরোনি। এক ইঞ্চির আট ভাগের এক ভাগ এগোল নলটা, তারপরই ফসকে গেল আঙুল। আবার, চেষ্টা করল সে। মুখ থেকে আরেক ঝলক রক্ত বেরিয়ে এল, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পিস্তলের দিকে আরও এক ইঞ্চি এগোল তার আঙুল। আবার ধরে ফেলল পিস্তলটা।

কেশে উঠল ভেরোনি। মুখের রক্ত ছিটকে পড়ল, লাল ছোপ লাগল সামনের হলুদ পাথরে। পিস্তলটা ছাড়ল না, তবে তুলে আনতেও পারল না। পিস্তলের ওপরই স্থির হয়ে গেল হাতটা, থুতনিটা পড়ল পাথরে, আস্তে করে মাথাটা কাত হয়ে গেল একপাশে।

'গিলটি মিঞা!' ডাকল রানা।

'ইয়েস, স্যার!' সাথে সাথেই জবাব এল একপাশ থেকে। দেখতে পেল না রানা।

'ঠিক আছ তো?'

'কী যে বলেন, স্যার! দারোগা-পুলিসের রাম প্যাঁদানিতে কিছু হলোনিকো, সামান্য কটা ইঁট-পাতরে আমার কি হবে? শুদু একটু এঁটকে গেচি এই যা।'

পাথরের কারাগার থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে আবার নতুন উদ্যমে চেষ্টা চালাল রানা। অনেক কষ্টে, হাঁটু আর পায়ের বেশ কয়েক জায়গার চামড়া ছিলে শেষ পর্যন্ত বের করে আনল একটা পা। এরপর আরেকটু চেষ্টা করতেই অন্য পা-টাও বেরিয়ে এল। এক হাতে কোরিনকে ধরে তুলল, ঠেস দিয়ে বসাল মূর্তির গায়ে। হাঁপাচ্ছে কোরিন চোখ বন্ধ করে।

'স্যার, আপনি উটেচেন মনে হচ্ছে?' ওপাশ থেকে ডাক শোনা গেল গিলটি মিঞার।

'একটু দাঁড়াও, আসছি,' বলেই এগিয়ে গেল রানা। মুখটা শুধু বেরিয়ে আছে গিলটি মিঞার, বাকি সবই পাথরের নিচে। একটা মাত্র হাত ব্যবহার করতে পারছে রানা। তাই দিয়েই যতটা দ্রুত সম্ভব পাথর সরাতে শুরু করল।

'হাড়টাড় ভেঙেছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'মনে তো হচ্চে, কোনটাই নেই। কিন্তুক আবার নড়তেও তো পারচি···তারমানে ভাঙেনি। আপনার, স্যার?'

'আমি ওসব নিয়ে ভাবছি না,' বলল রানা মৃদু হেসে।

শব্দ হলো পানিতে। ফিরে চাইল রানা। পানি থেকে নিজেকে টেনে তুলছে ডায়না। শূন্য দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকাল সে। কপালের একটা কাটা থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

ডায়নার দিকে তাকাতে গিয়ে পানিতে নজর পড়ল রানার। ইতিমধ্যেই অনেকখানি উঠে এসেছে পানি, আরও বাড়ছে। উঠে এসে রানাকে সাহায্য করল ডায়না। তিনমিনিটের মধ্যেই মুক্ত হলো গিলটি মিঞা। আরও বেড়েছে পানি। বেশ দ্রুত বাড়ছে। তাড়াতাড়ি এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া দরকার।

উঠে দাঁড়িয়েছে কোরিন। সারা গায়ে হলুদ ফসফরেসেন্ট। নগ্ন দেহটাকে অদ্ভুত দেখাচ্ছে। গ্রীক পুরাণের কোন লাস্যময়ী দেবী যেন কল্পনার জগৎ থেকে বাস্তবে এসে হাজির হয়েছে। দুই জোড়া চোখের দৃষ্টির সামনে লজ্জা পেল কোরিন। তৃতীয় জোড়া চোখ ততক্ষণে অ্যাবাউট টার্ন হয়ে গেছে, ছুটে গিয়ে পাথর সরিয়ে কোরিনের চাদরটা উদ্ধারের কাজে লেগে গেছে সে।

গিলটি মিঞার হাত থেকে চাদরটা নিয়ে ছিঁড়ে দুটো টুকরো করল রানা, যেন বুক ও কোমরে জড়িয়ে নিতে পারে কোরিন। এইবার বেশ ভালভাবেই শক্ত করে বেঁধেছেঁদে লজ্জা নিবারণ করল সে। রানা জিজ্ঞেস করল, 'সাঁতরাতে পারবে তো?'

'চেষ্টা করব।'

গিলটি মিঞার দিকে তাকাল রানা। এখনও অন্যদিকে ফিরে আছে সে।

মুচকে হাসল রানা। বলল, 'গিলটি মিঞা। তুমি আগে যাও, কোরিনকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাও সাথে করে। পারবে না?'

চোখের কোণ দিয়ে একবার কোরিনকে দেখে নিল গিলটি মিঞা। তারপর একগাল হেসে বলল, 'এইবার পারব, স্যার। চলুন, মেমসায়েব···পানির নিচে আবার জড়িয়ে টড়িয়ে ধরো না, বাওয়া!'

গিলটি মিঞার কথা না বুঝেই ঘাড় কাত করে সায় দিল কোরিন।

আলগা পাথরের ওপর দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে নেমে গেল গিলটি মিঞা। শেষ ধাপে গিয়ে আর টাল সামলাতে পারল না, হড়াশ করে পড়ে গেল পানিতে। পিছুপিছু পানিতে নেমে গেল কোরিন। লম্বা করে দম নিয়ে ডুব দিল গিলটি মিঞা। তাকে অনুসরণ করে ডুব দিল কোরিনও। ছোট্ট ঢেউ উঠল পানিতে, অসংখ্য রিং সৃষ্টি করে ছড়িয়ে পড়ল গোল হয়ে।

রানার দিকে ফিরল ডায়না। রানার ডানবাহুতে রাখল একটা হাত।

'বিদায়, রানা! শুধু একটা কথা মনে রেখো, ডায়না তোমাকে ভালবেসে ফেলেছিল।'

'মানে?' প্রশ্নটা করেই মানে বুঝতে পারল রানা। চমকে উঠল ভেতর ভেতর। 'কী বলছ তুমি!'

হঠাৎই ঝাঁপিয়ে পড়ল ও রানার বুকে। 'রানা! ওহ্, রানা। সত্যিই আমি তোমাকে ভালবাসি!'

'চলো, তাহলে বেরিয়ে পড়ি এই মৃত্যু-পাহাড় থেকে।' একহাতে জড়িয়ে ধরল রানা ওকে।

আস্তে করে রানার হাত ছাড়িয়ে দূরে সরে গেল ডায়না।

'বুঝতে চেষ্টা করো, রানা!' করুণ শোনাল ডায়নার কণ্ঠ। 'এই ডুবোপাহাড়ই আমার বাড়ি। এখানে জন্ম আমার, এখানেই মানুষ। আমার মাকে কবর দেয়া হয়েছে এখানে। বাবাও রয়ে গেল। আমি কোথায় যাব? দুনিয়ার কোথাও আমার যাওয়ার জায়গা নেই, কেউ নেই ত্রিভুবনে। আমি এখানেই...'

এপাশ ওপাশ মাথা নাড়ল রানা।

এগিয়ে এসে রানার বুকে গাল রাখল ডায়না। 'বাবাকে কথা দিয়েছিলাম, তার কাছ ছাড়া হব না কোনদিন। কথা রাখতে হবে আমাকে।...লক্ষ্মী, রানা...'

হঠাৎই ভয় পেয়ে গেল রানা। ডায়না যদি নিজের ইচ্ছেয় যেতে না চায়, কোন উপায়েই পানি ভরা সুড়ঙ্গ পেরিয়ে গ্যালারিতে নিয়ে যাওয়া যাবে না তাকে। ওদিকে দ্রুত পানি বাড়ছে। আস্তে আস্তে ডায়নার চুলে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল রানা। 'আমি একটা স্বার্থপর লোক, ডিনা। তোমার বাবা গেছেন। তুমি এখন আমার। আমি দেখব তোমাকে। তোমার বাবা যদি বেঁচে থাকতেন, তাহলেও তোমাকে এখন আমার সঙ্গে যেতে বলতেন। তাছাড়া, তুমি তো তোমার কথা রেখেছ। বেঁচে থাকতে কোন সময় বাবাকে ছেড়ে যাওনি। এখন উনি তোমার কাছ থেকে অনেক দূরে।' ডায়নার বাঁ কাঁধে হাত রাখল রানা। চাপ দিল। 'চলো, ডিনা। তোমার সাহায্য আমার দরকার। এই জখম নিয়ে একা এতটা পথ যেতে পারব কিনা সন্দেহ। পানি বাড়ছে। দেরি করলে কোনদিনই আর বেরোতে পারব না। সাহায্য করবে না আমাকে?'

রানার হাতে হাত রেখে হলুদ পানিতে এসে নামল ডায়না। নীরবে কাঁদছে সে, দু'গাল বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছে অঝোর ধারায়।

এক ডুবে ডায়নাকে নিয়ে গ্যালারিতে এসে পৌঁছল রানা। মাথা তুলে দেখল, আবছা অন্ধকার। বাইরে ভোর হয়েছে, আলো এসে ঢুকছে গুহায়, অন্ধকার কেটে যাচ্ছে। একটা তাকে বসে অন্য তাকে হেলান দিয়ে আছে কোরিন। তার পাশে ছোট্ট খোকাটির মত বসে আছে গিলটি মিঞা।

'এসে পড়েচেন, স্যার?' রানাকে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল গিলটি মিঞা। হাসি গিয়ে ঠেকল দুই কান পর্যন্ত। 'আমি তো ভয়েই সারা। একাবারে কাঁপ উটে গেচিল বুকের মদ্যে।...ভাবলুম, কি জানি, পথই বন্দো হয়ে গেল কিনা...'

'না বন্ধ হয়নি,' বলল রানা। উঠে এল পানি থেকে'। সাংঘাতিক হাঁপাচ্ছে। এক হাতে ধরে উঠতে সাহায্য করল ডায়নাকে···

চেঁচিয়ে উঠল হঠাৎ কোরিন। আতঙ্কে। চমকে ফিরে চেয়ে দেখল রানা, থর থর কাঁপছে সে। বড় বড় চোখে তাকিয়ে আছে নিচের দিকে। দুই পা ওপরে গুটিয়ে নিয়েছে। চেয়ে দেখল রানা, একটা কাঁকড়া দ্রুত চলে যাচ্ছে কোরিনের পায়ের নিচ দিয়ে। চেঁচানিতে বোধহয় ভয় পেয়ে গিয়েই দেয়ালের গা থেকে টুপটাপ খসে পড়ল আরও অনেক কটা, এদিক ওদিক ছুটোছুটি করে অন্ধকার গর্ত আর ফাঁকফোকরে গিয়ে লুকাল।

'ও তো কাঁকড়া, অত ভয় পাচ্ছ কেন?' হেসে বলল রানা। 'হোটেল রেস্তোরাঁয় ওগুলোই প্লেটে নিয়ে কেমন মজা করে খাও। খাও না?'

হ্যাঁ-না কিছুই বলল না কোরিন। শুধু শিউরে উঠল বার কয়েক।

'এবার গুহার বাইরে যাব আমরা,' সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলল রানা। 'বড় করে দম নিয়ে ডুব দেবে।' ডায়নার দিকে তাকাল সে।

পানিতে ভিজে ডায়নার শরীরের সঙ্গে আঁটসাঁটভাবে জড়িয়ে গেছে খাটো আলখেল্লা। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে শরীরের প্রতিটি বাঁক, রেখা, উঁচু, নিচু—সব। রানাকে তাকিয়ে থাকতে দেখে চোখ নামাল ডায়না, মৃদু লজ্জিত হাসি ফুটল ঠোঁটের কোণে। কোরিনের দিকে তাকাল রানা। বেশ সুন্দর লাগছে চাদর বাঁধা কোরিনকে। বলল, 'নামো, কোরিন।'

কোন কথা না বলে পানিতে নেমে পড়ল কোরিন।

গিলটি মিঞার দিকে ফিরে বলল রানা, 'তুমি পথ দেখাও।'

কোরিনকে নিয়ে ডুব দিল গিলটি মিঞা। এক হাতে ডায়নাকে কাছে টেনে নিল রানা। আলতো করে চুমু খেলো ওর ঠোঁটে। হাত ধরে টানল, 'এসো, যাই।'

অদ্ভুত এক নীরবতা গুহাটাতে। অন্ধকার পানিতে আলো ফুটছে এখন ধীরে ধীরে, বাইরের আলো। খুদে জলজ প্রাণীদের ঘুরে বেড়াতে দেখা যাচ্ছে। ডায়নার হাত ধরে ডুব দিল রানা।

গুহামুখ দিয়ে বেরিয়ে ধীরে ধীরে ওপরে উঠে যাচ্ছে রানা। পাশে থেকে উঠছে ডায়না। ছোট্ট ওই এয়ার-পকেট চেম্বারে ঢোকার আগে গিলটি মিঞা ডেপথ গজে কত যেন দেখেছিল, মনে করার চেষ্টা করল রানা···পঞ্চাশ ফুট। ওপরের দিকে তাকাল সে। সবুজ পানি, ওপরের দিকটা আলোকিত। গিলটি মিঞা আর কোরিনকে উঠতে দেখা যাচ্ছে। বেশ অনেকটা ওপরে। আশেপাশে ওপরে নিচে কোথাও হাঙরের চিহ্ন নেই। শক ওয়েভের ধাক্কায় পালিয়েছে?

অতি ধীরে শ্বাস ছেড়ে ফুসফুসের চাপ হালকা করতে করতে উঠছে দু'জনে। ওদের আগে আগে মাথার ওপরে দ্রুত উঠে যাচ্ছে বুদ্বুদগুলো। রানার মনে হলো, পানিতে নয়, মহাশূন্যে কোথাও ভেসে রয়েছে ওরা।

ভুশ করে পানির ওপরে একসাথে মাথা তুলল দু'জনেই। রোদ ঝলমল করছে চারদিকে। কেমন যেন অবাস্তব লাগছে। একটু দূরে দেখা যাচ্ছে দুটো মাথা, আর কিচ্ছু নেই কোথাও। জোরে শ্বাস টানল রানা, শব্দ করে। ফেলল, আবার টানল।

পাশে তাকাল। ডায়নাও শ্বাস টানছে ফেলছে ঘন ঘন। পানির দেশের মেয়ে। তাকে বলার দরকার নেই, পানিতে কিভাবে কি করতে হয়, ভালই জানা আছে তার। দু'জনেই চিৎ হয়ে গেল এরপর। নাক ওপরের দিকে করে বিশ্রাম নিচ্ছে।

হঠাৎই পানির তলা থেকে কানে এল প্রচণ্ড এক চাপা শব্দ। একটু পরেই টের পাওয়া গেল কম্পন। দু'জনের কাছ থেকে বেশ একটু দূরে বিশাল এক এলাকা জুড়ে বুদ্বুদ উঠতে লাগল, ছোট-বড় সব আকারের। তারপরেই ভেসে উঠল নানা রকমের আবর্জনা, ভাঙা কাঠের টুকরো, তেল, কাপড়ের টুকরো ইত্যাদি। এইবার চিরতরে ধ্বংস হয়ে গেল কানোলি, ভাবল রানা, শেষ হয়ে গেল হাওয়াইয়ান ভোরটেক্স।

নিচের দিকে মুখ করে কপাল পর্যন্ত ডুবিয়ে নিচে তাকাল রানা। জিনিসটা চোখে পড়ল তখনই। ধক করে উঠল হৃৎপিণ্ড। জলদানব! নাকি বিশাল কোন হাঙর! ধীরে ধীরে সবুজ অন্ধকার থেকে উঠে আসছে বিশাল কালো এক দানব। হঠাৎই প্রচণ্ড ক্লান্তি এসে ভর করল আবার শরীরে। মাথাটা কেমন ঘোলাটে হয়ে আসছে। মনে করতে পারছে না রানা, সে কে, কি করছে এখানে, আছেই বা কোথায়! বমি বমি লাগছে। বমি করার জন্যে হাঁ করল রানা। নোনা পানি ঢুকে গেল মুখের ভেতরে। নিজের অজান্তেই ঝটকা মেরে মাথা তুলে ফেলল পানি থেকে। বেদম কাশতে লাগল।

কতক্ষণ পর বলতে পারবে না, টের পেল রানা, তার হাত চেপে ধরেছে কেউ। ঘোলাটে চোখে তাকাল। আবছাভাবে দেখল, তাকে তুলে নিচ্ছে কে জানি। মানুষের মুখের মত কিছু মুখ দেখা যাচ্ছে। আপনাআপনি চোখ বন্ধ হয়ে গেল রানার।

আবার চোখ মেলতেই নরম বিছানায় আবিষ্কার করল রানা নিজেকে। গলা পর্যন্ত টেনে দেয়া হয়েছে গরম কম্বল। মাথার ওপর ঝুঁকে আছে একটা মুখ।

'এই যে, রানা!' তাকে চোখ খুলতে দেখে বলল হপকিন্স। 'হুঁশ ফিরল তাহলে···তা হয়েছিল কি আপনার? দেখে তো মনে হয়, শিল-পাটায় ফেলে পিষেছে কেউ!'

কথা বলতে চেষ্টা করল রানা। পারল না। কেশে উঠল। ছিটকে নোনা পানি বেরিয়ে এল নাকমুখ দিয়ে। গল গল করে বমি করে ফেলল সে সাদা কম্বলের ওপর।

একটু স্থির হয়ে নিয়ে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল সে, 'আপনি···স্করপিয়নকে···তুলতে পেরেছেন তাহলে?'

'স্করপিয়ন উঠেছে, তবে আমরা তুলতে পারিনি,' ধীরে ধীরে বলল হপকিন্স। 'শক ওয়েভ···প্রচণ্ড শক ওয়েভ ধাক্কা মেরে সাকশন মুক্ত করে দিয়েছে···। কিন্তু একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না কিছুতেই। পজিশন জানা আছে, তবু ভুল করল কেন সাইক্লপস্! মিসাইলটা পড়ার কথা ছিল স্করপিয়নের ওপর। না পড়ে পড়ল গিয়ে আরও উত্তরে পাহাড়ের উত্তর ঢালে! ঘটনাটা যে কি···'

'আমিই অনুরোধ করেছিলাম, অ্যাডমিরালকে,' আস্তে আস্তে বলল রানা। 'সাড়ে চারটার দিকে সাইক্লপসের সঙ্গে রেডিও যোগাযোগ করেছেন তিনি। সাইক্লপস্‌কে মিথ্যে কথা বলেছেন। স্করপিয়নের নতুন একটা পজিশন জানিয়ে বলেছেন, এর আগের পজিশন ভুল রেকর্ড করা হয়েছিল।...ব্যস, মিসাইল চলে গেছে ভুল জায়গায়...' আবার কাশতে লাগল রানা। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'আমার...আমার সঙ্গে আরও যারা ছিল...'

আঙুল তুলে দেখাল হপকিন্স।

ঘাড় কাত করে দেখল রানা। আরও তিনটে বেডে শুয়ে আছে তিনজন। কম্বলে ঢাকা।

'সব ক'জনই বেঁচে আছে,' মৃদু হাসল হপকিন্স। 'অ্যাডমিরালের একটা মিথ্যে কথায় সবাই বেঁচে গেলাম...'

হপকিন্সের কথা শেষ হবার আগেই চোখ বুজল রানা। নিশ্চিন্ত।

দশ

সকাল ১০·৩৫ মিনিটে খুলে গেল পাঁচ নম্বর গেট। লম্বা সারি বেঁধে এগিয়ে গেল যাত্রীরা। টপাটপ তাদেরকে পেটের ভেতর পুরে নিতে লাগল প্যান আমেরিকান ফ্লাইট-৩৬, গন্তব্য: স্যানফ্র্যান্সিসকো। হাসছে অনেকেই, কারও চোখে পানি। হাত নেড়ে টাওয়ারে অপেক্ষমাণ আত্মীয়-বন্ধুদের বিদায় জানাচ্ছে তারা।

গর্জে উঠল প্লেনের এঞ্জিন। রানওয়ে ধরে এগিয়ে গেল বোয়িং ৭৪৭। ট্রিপলার মিলিটারি হসপিটালের একটা কেবিনের জানালায় দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখছে রানা। প্লেনটা মাটি ছাড়বে ছাড়বে করছে এই সময় টোকা পড়ল দরজায়। ঘুরে দাঁড়াল রানা। কিছু বলার আগেই খুলে গেল কেবিনের দরজা। ভেতরে এসে ঢুকলেন অ্যাডমিরাল ম্যাকডেভিড।

'আপনার কথাই রইল, মেজর,' বলে উঠলেন অ্যাডমিরাল। 'ব্যবস্থা করে এলাম। তবে ডাক্তাররা ডাকলেই এসে হাজির হবেন কিন্তু।'

'তা-তো হবই। আমার শরীরে বিষ ঢুকেছে, গরজটা আমারই বেশি। মগজটা হঠাৎ যখন বেয়াড়াপনা শুরু করে, আমি তখন অসহায় শিশুর মত। শুনেছেন নিশ্চয়ই, লম্বা ছুটি দেয়া হয়েছে আমাকে—সেটা হাসপাতালে না কাটিয়ে সাগরপারের একটা কটেজে কাটাতে চাই—ব্যস। না সেরে নড়ছি না এখান থেকে।'

'ভাববেন না। উঠে পড়ে লেগেছে কেমিস্টরা। রীতিমত গবেষণা চলছে। আধুনিক বিজ্ঞান ও টেকনোলজির যতদূর সাধ্য ততটাই করা হবে আপনার জন্যে, সমস্ত ব্যয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। চেষ্টার ত্রুটি হবে না। এইমাত্র জেনে এলাম, ছোট্ট একটা অপারেশন দরকার হতে পারে আপনার। কি একটা স্নায়ু না কি যেন, মাঝে

মাঝে অকেজো হয়ে যায়। থাইরয়েড গ্ল্যান্ড থেকে নাকি সে-সময়ে কি একটা হর্মোন সিক্রিশন হয়। সেটাই সাময়িক অকেজো করে দেয় ব্রেনের একটা অংশ। তখন আর কিছু মনে করতে পারবেন না আপনি।...সে যাকগে...হ্যাঁ, হাওয়াই ছেড়ে নড়বেন না আপনি কিছুদিন। হাসপাতালের ডাক্তারদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন।' সোনালী সুতোর ঘের দেয়া ক্যাপটা মাথা থেকে খুললেন অ্যাডমিরাল। রানার দিকে তাকালেন, 'কয়েক মিনিটের ভেতরই ছাড়পত্র পেয়ে যাবেন আপনি...' এগিয়ে এসে একটা চেয়ারে বসে পড়লেন ম্যাকডেভিড।

বিছানার প্রান্তে বসল রানা। কাঁধের ব্যান্ডেজ খুলে ফেলা হয়েছে, হাতেও স্লিং নেই। তবে বাম হাতটা জোরে নাড়াতে গেলে এখনও ব্যথা পায় কাঁধের কাছে। অ্যাডমিরালের দিকে তাকাল। চোখের পাতা একটু কাছাকাছি হলো। হাসল। 'এই প্রথম সিগারেট নেই আপনার ঠোঁটে, অ্যাডমিরাল।'

ঘোঁৎ করে উঠলেন ম্যাকডেভিড। 'হতচ্ছাড়া নার্সগুলোর কথা আর বলবেন না! সিগারেটটা ডাস্টবিনে না ফেলা পর্যন্ত ঢুকতেই দিল না!'

উঠল রানা। এগিয়ে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল ভেতর থেকে। ফিরে এসে বলল, 'জ্বালান। মুখের চারপাশে ধোঁয়া না থাকলে আপনাকে কেমন অচেনা লাগে।'

হাসলেন অ্যাডমিরাল। ধন্যবাদ জানানোর ভঙ্গিতে মাথা ঝোঁকালেন। হাতে বেরিয়ে এসেছে লম্বা সরু একটা সিগারেট। দাঁতে চেপে ধরে তাতে আগুন ধরালেন। আরাম করে হেলান দিলেন চেয়ারে। বার কয়েক লম্বা টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়লেন। ধীরে ধীরে স্বস্তি ফিরল তাঁর চেহারায়। সিগারেটটা দাঁতের ফাঁকেই চেপে ধরে রেখে পকেটে হাত ঢোকালেন তিনি। একটা জিনিস বের করে ছুঁড়ে দিলেন বিছানায়। 'এটা আপনার। সুভেনির হিসেবে রেখে দিন।'

জিনিসটা তুলে নিল রানা। ভেরোনির লোকদের ব্যবহৃত একটা প্রোজেক্টাইল গান। 'এর ফায়ারিং মেকানিজম বুঝতে পেরেছে আপনার লোকেরা?'

মাথা ঝাঁকালেন অ্যাডমিরাল। 'ট্রিগার বাটন টিপলেই ধাক্কা মারে একটা স্প্রিং, বাটের মাঝামাঝি একটা চার্জকে ইগনাইট করে। বেরিয়ে যায় চার্জটা, চলতে থাকে নিজের ক্ষমতায়।'

'তারমানে খুদে একটা রকেট?'

'অনেকটা। ক্লোজ রেঞ্জে মারাত্মক জিনিস।'

প্রোজেক্টাইল গানটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখল রানা। ওর সংগ্রহে আরেকটা চমৎকার অস্ত্র যোগ হলো।

একটা পানির গেলাসে ছাই ঝাড়লেন অ্যাডমিরাল। 'হ্যাঁ, কানোলির আশেপাশে গত কয়েকদিন ধরেই ডোবাডুবি করছে আমার ডাইভাররা। মূল্যবান তেমন কিছুই উদ্ধার করতে পারেনি। আসলে ভেরোনির গুহাগুলোর ভেতরে ঢোকার পথ বন্ধ হয়ে গেছে চিরতরে।'

'হলুদ গুহাটা?' জিজ্ঞেস করল রানা, যদিও জবাবটা কি হবে জানাই আছে তার।

'বাইরের এয়ার-পকেট গ্যালারিটা তেমনি আছে এখনও। তবে ওটা থেকে হলুদ চেম্বারে যাবার পথটা পাথর পড়ে একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে।'

খোলা জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল রানা। চোখে শূন্যদৃষ্টি। সূর্যের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াতে চাইছে মেঘের ভেলা, আকাশ আর সাগরের রঙ বদলে দিচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে।

'হাওয়াইয়ান ভোরটেক্স রহস্যের সমাধান হয়ে গেল,' ধীরে ধীরে বলল রানা। 'ওই এলাকায় ঢুকতে আর কোন ভয় নেই। নাবিকদের আতঙ্কের দিন শেষ।'

'হ্যাঁ।'

কিছুক্ষণ নীরবতা। ভাবছে দু'জনেই, আপন আপন ভাবনা। তারপর আবার কথা শুরু করলেন অ্যাডমিরাল। 'আগামী মাসেই আবার বন্দর ছাড়বে স্করপিয়ন। ছয় মাস আগে যে ট্রায়ালে বেরিয়েছিল, এবার শেষ করবে সেটা। নতুন কমান্ডার কে হবে নিশ্চয়ই জানতে ইচ্ছে করছে?···কমান্ডার পিটার হপকিন্স।'

'ভাল লোক,' হাসল রানা। 'জান বাজি রেখে সাবমেরিনটাকে উদ্ধার করেছে মানুষটা। স্করপিয়নের কমান্ডার পদটা তারই প্রাপ্য।'

'ঠিকই বলেছেন।···হ্যাঁ, এবার আমাকে, উঠতে হচ্ছে,' উঠে পড়লেন অ্যাডমিরাল। ড্রেসার থেকে ক্যাপটা তুলে নিলেন। 'কাজ আছে। আরেকটা স্যালভেজ অপারেশন বাকি রয়ে গেছে। দ্রুত সেরে ফেলতে হবে।'

'তেলেনিকভ?'

ভুরু কুঁচকে রানার দিকে তাকালেন অ্যাডমিরাল। 'আমি ভেবেছিলাম এস.এস. তুরাগের কথা বলবেন!'

'খামোকা ওটার কথা বলতে যাব কেন? আমি জানি, ওটা এখন হনলুলুর বন্দরে অপেক্ষা করছে।'

'কি করে জানলেন?'

'অনুমানই যথেষ্ট। প্রথমেই তুরাগকে তুলে আনবে হান্ড্রেড অ্যান্ড ফার্স্ট, এটা তো জানা কথাই।···তা, স্যার, মালপত্রগুলোর কি হলো?'

'বেশির ভাগই উদ্ধার করা হয়েছে হাওয়াইয়ের বিভিন্ন চোরাই মার্কেট থেকে। আমার সিকিউরিটি পুলিসের সঙ্গে ছায়ার মত ঘুরেছে আপনাদের ওই গিলটি মিঞা। লোকটার প্রশংসা না করে পারছি না। সিকিউরিটি পর্যন্ত তাজ্জব হয়ে গেছে চোরাই বাজার সম্পর্কে তার ধারণা দেখে। রীতিমত বিশেষজ্ঞ!'

হাসল রানা। 'ডেকে জিজ্ঞেস করুন। বুক ঠুকে জবাব দেবে, বত্রিশ বছর এলাইনে হাত পাকিয়েছে···'

'সত্যিই আশ্চর্য এক লোক!' এগিয়ে এসে রানার সঙ্গে হাত মেলালেন অ্যাডমিরাল। টুপিটা মাথায় পরলেন। বেরিয়ে যাই যাই করেও যাচ্ছেন না। কি যেন বলতে চাইছেন। তারপর বলেই ফেললেন, 'আরেকটা কথা, মেজর।' গলার স্বর খাদে নেমে গেছে ম্যাকডেভিডের। 'কোরিনকে আমার বুকে ফিরিয়ে দেবার জন্যে···আপনাকে ধন্যবাদ। সন্তানের প্রতি উদাসীন এক বাপকে দারুণ শিক্ষা

দিয়েছেন আপনি। অতীত ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করার চেষ্টা করব এখন থেকে। দু'জনের মাঝে বাপ মেয়ের সত্যিকার সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করব আবার নতুন করে। আপনি···আপনাকে আমি···আপনার কথা কোনদিন ভুলব না!' আবেগে বুজে এল অ্যাডমিরালের গলা। 'ওর আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম···'

অবাক হয়ে দেখল রানা, রসকসহীন কট্টর অ্যাডমিরালের গাল বেয়ে সড়সড় করে নেমে আসছে দু'ফোঁটা পানি।

আর একটাও কথা বললেন না ম্যাকডেভিড। ঘুরে রওনা হয়ে গেলেন দরজার দিকে। বেরিয়ে গেলেন কেবিন থেকে।

ওয়েটিং রুমে রানাকে রিসিভ করল পল রিচার্ড আর জন টার্নার। দু'দিক থেকে এসকর্ট করে হাসপাতালের মেন গেটের কাছে তাকে নিয়ে এল ওরা। গেটের পাশেই অপেক্ষা করছে লাল এসি কোবরা। ড্রাইভিং সীটে বসে আছে ডায়না।

কোবরার পেছনের দরজা খুলে গেল। বানরের মত লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল গিলটি মিঞা। খোঁচা খোঁচা দাড়ি চুলকে নিয়ে ঝটাং করে এক স্যালুট লাগিয়ে একটুকরো কাগজ দিল।

কাগজটা নিয়ে পড়ল রানা। ছোট্ট দুটো লাইন। ঢাকা থেকে এসেছে। আরও একমাসের ছুটি মঞ্জুর করেছেন মেজর জেনারেল। আর গিলটি মিঞাকে ছেড়ে দিতে বলেছেন। মৃদু একটা হাসির রেখা ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল রানার ঠোঁটে।

'আমি এনাদের সঙ্গে ডকে ফিরে যাব, স্যার,' টার্নার আর রিচার্ডকে দেখিয়ে বলল গিলটি মিঞা। সরল দুই চোখ মেলে রানার দিকে তাকাল সে। 'দেশে ফিরে যেতে হবে। কত কাজ পড়ে আচে এজেন্সীতে। নেহায়েত না এলেই নয়, তাই এয়েচিলুম। বড় স্যারের কতা তো আর ফেলতে পারি না।···তাইলে ওই কতাই রইল। তুরাগকে রওনা করে দিয়েই পেলেনে করে দেশে ফিরে যাব।'

ঘাড় নেড়ে সায় দিল রানা। টার্নার আর রিচার্ডের সঙ্গে হাত মেলাল।

'তেলেনিকভকে তুলে ফিরে এসে রয়্যাল হোটেলে মদের পার্টি জমাব আমরা। জুয়া খেলব। তৈরি থাকবেন, রানা। কয়েকদিনের ভেতরেই ফিরে আসছি আমরা সাগর থেকে,' বলল রিচার্ড।

'থাকব। আসি তাহলে। গুড বাই।'

'গুড বাই।' সমস্বরে বলল টার্নার আর রিচার্ড।

ঘুরে গিয়ে ড্রাইভিং সীটের পাশের দরজা খুলে উঠে পড়ল রানা। গাড়ি স্টার্ট দিল ডায়না। সরু রাস্তা পেরিয়ে হাইওয়েতে উঠে এল কোবরা। নিউ পালি রোড ধরে এগিয়ে চলল।

নীরবতা। কেউ কোন কথা বলছে না। সবুজে ঢাকা কুলাউ মাউনটেইন পেরিয়ে এল ওরা। সামনে পর পর অনেকগুলো গ্রাম। নামগুলোতে চমৎকার একটা ছন্দ রয়েছে। হিইয়া, কালাইয়া, ওয়েইকেন, কাউয়া, কোহানা।

হাইওয়ে থেকে গাড়ি নামিয়ে আনল ডায়না। কোহানা নামের গ্রামটাতে এসে ঢুকল। বেশি দূরে নয় সাগর সৈকত। একটা নারকেল বীথির সামনে এসে দাঁড়িয়ে

পড়ল কোবরা।

ছোট্ট ছবির মত একটা কটেজ। আশে পাশে অনেক দূরে দূরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে জেলে-বস্তি। কটেজের ঠিক সামনেই একটা গাছ, প্লুমেরিয়া। নীল আকাশের দিকে বিশ ফুট উঠে গেছে তীক্ষ্ণ পাতাগুলো। ফুল ফুটেছে গাছে, হলুদে-সাদায় মেশানো রঙ। অদ্ভুত মিষ্টি একটা গন্ধ মৌ মৌ করছে বাতাসে।

গাড়ি থেকে নামল দু'জন।

তাকাল পরস্পরের চোখের দিকে। নিজেরই অজান্তে কখন যে একেবারে কাছাকাছি চলে এসেছে, জড়িয়ে ধরেছে পরস্পরকে, বলতে পারবে না দু'জনের কেউই। ধীরে ধীরে নেমে এল একজোড়া ঠোঁট অপেক্ষমাণ একজোড়া অধরে।

মাথার ওপর দিয়ে নিঃশব্দে উড়ে গেল একটা অ্যালবেট্রস।

* * * *